মহাভারতের কথা

বুদ্ধদেব বসু

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলকাতা ৭৩

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ :
১ বৈশাখ ১৩৮১
এপ্রিল, ১৯৭৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক : শ্রীপার্বতীচরণ রায়
দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ : ২০১-এ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

মুখবন্ধ

আজ থেকে প্রায় এগারো বছর আগে আমি একবার মার্কিনদেশের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার অধ্যাপনার একটি প্রসঙ্গ ছিলো তুলনামূলক ইন্দো-য়োরোপীয় এপিক — একদিকে ইলিয়াড, অদিসি, ঈনীড, অন্যদিকে মহাভারত ও রামায়ণ। সেই সূত্রে কিছু পুঁথিপত্র ঘাঁটতে হয় আমাকে, আমার গোচরে আসে অনেক তথ্য, সংকেত, প্রতিসাম্য, অনেক সম্বন্ধস্থাপনের সম্ভাবনা আমাকে চঞ্চল করে; আমি টের পাই আমার মনের দু-একটা পূর্বার্জিত ভ্রূণাকার ভাবনা ধীরে-ধীরে পরিণত হ'য়ে উঠছে। আমার ছাত্র-ছাত্রীরা আন্তর্জাতিক ও অসমবয়সী — কেউ নবাগত জর্মান অথবা গ্রীক, কেউ বা য়িহুদি, কেউ-কেউ তিন চার পুরুষের মার্কিন; বুদ্ধিমান তরুণের পাশে কৃতবিদ্য প্রৌঢ়জনও উপবিষ্ট। তাঁরা তাঁদের ভিন্ন-ভিন্ন অভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যে-সব তর্ক তোলেন, তাতেও আমি নতুন চিন্তার উপলক্ষ পাই। মহাভারত বিষয়ে একটি বই লেখার ইচ্ছে সেই সময়েই আমার মনে অঙ্কুরিত হয়েছিলো — আমেরিকার আরো কয়েকটা বিদ্যালয়ে ঘুরে অনুশীলনের আরো সুযোগও পেয়েছিলাম।

দু-বছর পরে, মনের মধ্যে সেই ইচ্ছার তাড়না ও ব্রিফকেসে দু-খাতা-ভর্তি নোট নিয়ে, আমি ফিরে এলাম আমার অভ্যস্ত জীবনে কলকাতায়। ভেবেছিলাম গুছিয়ে ব'সেই লিখতে শুরু ক'রে দেবো, কিন্তু যথোপযুক্ত অবকাশ আর জোটে না — মাস, বছর অন্য নানা ব্যাপারে কেটে যায়। এমন নয় যে অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে মহাভারতের সঙ্গে আমার কখনো বিচ্ছেদ ঘটেছিলো — বরং আমি যে ক্রমশ আরো জড়িয়ে পড়ছিলাম, আমার সাম্প্রতিক অনেক নাটকে ও কবিতায় তার নিদর্শন আছে। তবু: গদ্য বইটির কথা ভাবলেই আমি যেন ভয় পেয়ে পেছিয়ে যাই; আমার কেবলই মনে হয় আমি এখনো যথেষ্ট প্রস্তুত হ'তে পারিনি; পরিকল্পনা ও রচনার মধ্যে বিপুল ব্যবধান

পেরোবার মতো সম্বল আমার হাতে নেই। তারপর একদিন ভেবে দেখলাম আমরা যাকে প্রস্তুতি বলি সেটা সর্বদাই এক আপেক্ষিক ব্যাপার যে বিন্দুটিকে এখন ভাবছি অভীষ্ট সেখানে পৌঁছনোমাত্র অভীষ্ট-তরব সম্ভাবনা দেখা দেবে আর আমার বয়সে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করাও চলে না। তাছাড়া, যে মানুষকে প্রতিদিনের শ্রমে প্রতিদিনের জীবিকা অর্জন করতে হয় তার পক্ষে অব্যাহত দীর্ঘ অবকাশ সুদূরপরাহত। যদি কল্পনাটিকে বাস্তবে উত্তীর্ণ করে দিতেই হয়, তা করতে হবে প্রস্তুতির অনটন নিয়ে, সাংসারিক বিরুদ্ধতারই মধ্যে। অগত্যা, আমার বর্তমান অবস্থায় যতটা সম্ভব সুসম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্তভাবে, আগেকার প্রাথমিক কয়েকটি ভাবনা-ধারণাকে এখানে উপস্থিত করছি।

বলা বাহুল্য, আমি দশ বছর আগে ইণ্ডিয়ানায় যা ভেবেছিলাম, এটি ঠিক সে-বই নয়। তখন আমার কল্পনায় ছিলো একটি সরল চেহারার অনতিদীর্ঘ নির্ভার পুস্তক, কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মনের মধ্যে বিষয়টির ব্যাপ্তি এত বেড়ে গেলো যে গঠনপদ্ধতি কিছুটা বদলাতে বাধ্য হলাম। আমার মনে হ'লো, এ বইয়ের পক্ষে তথ্য সংক্রান্ত স্পষ্টতার প্রয়োজন আছে, পাঠকবর্গ ও স্বয়ং লেখকের স্মরণের সহায়কল্পে পথে-পথে নিশেন পুঁতে রাখাও ভালো, আর রচনাকালে এমন অনেক পার্শ্বিক প্রশ্ন উত্থিত হ'তে লাগলো, যা আলোচনার অযোগ্য নয় অথচ যা মূল পুঁথিতে প্রবিষ্ট করলে রচনায় শৃঙ্খলা থাকে না। তাছাড়া, আমি যেহেতু বইখানা লিখেছি বাংলাভাষায়, এবং মনে-মনে এই উচ্চাশা পোষণ করছি যে 'সাধারণ' পাঠকপাঠিকারাও এটি পড়বেন, তাই য়োরোপীয় পুরাণ ও ইতিহাস-সংক্রান্ত এমন কোনো-কোনো তথ্যের উল্লেখ করলাম যা বিদ্বজনের মনে হ'তে পারে বাহুল্য। এ-সব কারণে টীকার ব্যবহার অনিবার্য হ'লো, এবং পৌনঃপুনিক অনুচিন্তনের ফলে সেগুলি সংখ্যায় বা আয়তনে আর বিনীত রইলো না। কোনো পাঠককে সেগুলি প্রতিহত করবে না, আশা করি। কেউ কেউ হয়তো কৌতূহলের খোরাক পাবেন।

বলতে ভালো লাগছে, এই প্রচেষ্টায় অনেকের সাহায্য পেয়েছি। আমি গৃহবাসী জীব, সম্প্রতি লোকসমাজ থেকে বিবিক্ত, বিষয়টির

প্রসার অনুযায়ী উপাদান আহরণ আমার পক্ষে সম্ভব হ'তো না, যদি না কয়েকটি বন্ধু আমার সহায় থাকতেন। অনেক প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ ক'রে দিয়ে বা সন্ধান জানিয়ে, আর কখনো কোনো তথ্য বিষয় নিশ্চিত ক'রে, আমাকে উপকৃত করেছেন শ্রীনরেশ গুহ, সুধীর রায়চৌধুরী, স্বপন মজুমদার, দেবব্রত রায় ও প্রবাল দাশগুপ্ত। শ্রী স্টার্লিন স্টীল ও সত্রাজিৎ দত্ত বিদেশ থেকে কিছু জরুরি বই উপহার পাঠিয়েছেন; আমার কোনো কোনো আত্মীয়ের কাছে বই কেনার জন্য আর্থিক সাহায্যও পেয়েছি। প্রুফ-সংশোধন ও সম্পৃক্ত বিষয়ে নিরন্তর আমার সহায় ছিলেন শ্রী নরেশ গুহ ও অমিয় দেব; তাঁদের প্রযত্ন ও অভিনিবেশ আমাকে নানা ধরনের ত্রুটি ও অসংগতি থেকে রক্ষা করেছে। মাঝে-মাঝে আমার আবেদনের উত্তরে, আমাকে জ্ঞানের কণিকা উপহার দিয়েছেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর গবেষণা-সহচারী শ্রী অনিলকুমার কাঞ্জিলাল। 'প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা'র লেখক শ্রী মনোনীত সেন পত্রযোগে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন আমাকে, দু-একটি অনুপুঙ্খ উদ্‌ঘাটন করেছেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষার তুলসীদাস-দত্ত ব্যাখ্যার প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তরুণ হিন্দি লেখক শ্রী সোমনাথ মেহ্‌টা; তাঁর সাহায্যে মূল তুলসীদাসের স্বাদ নিতে পেরেছি। শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী নির্দেশিকাটি রচনা করে দিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারো-কারো কাছে গভীরভাবে ঋণী; কিন্তু গ্রন্থে প্রকাশিত ব্যাখ্যা ও মতামতের জন্য শুধু আমিই দায়ী, সে-কথা হয়তো' না বললেও চলে।

বইখানার অভিপ্রায় ও পরিধি বিষয়ে দু-একটি কথা ব'লে রাখতে চাই। প্রথম কথা, আমার আলোচনার ধারা সাহিত্যিক, অথবা —যেহেতু 'সাহিত্য' কথাটা বড়ো বেশি ব্যাপক—তাই বলা যাক কবিতা ও কবিতার মতো মিথলজির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে যে-সব ব্যাপার অবিশ্বাস্য (কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরাও পুরাকালে যা বিশ্বাস করতেন), আমি সেগুলিকে 'অবাস্তব' ব'লে প্রত্যাখ্যান করিনি, বরং সেই সব বাস্তবাতীত রহস্যের মধ্যেই মর্মকথার

সন্ধান করেছি। দ্বিতীয় কথা, আমার প্রধান আলোচ্য মহাভারত হ'লেও তুলনা ও প্রতিতুলনার টানে রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণের প্রসঙ্গ অনিবার্য-ভাবেই গ্রথিত হ'য়ে গেছে; পশ্চিমদেশীয় প্রাচীন ও অর্বাচীন সাহিত্য এবং স্বদেশজাত আরো কিছু দৃষ্টান্ত, সেই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'লো। নানা দেশের ও নানা যুগের কল্পনাচিত্র, যারা পরস্পরের দর্পণের কাজ করে আর কখনো কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাও — এদের সংসর্গে স্থাপন ক'রে আমি দেখাতে চেয়েছি যে মহাভারত কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানবজীবনের মধ্যে প্রবহমান। এই কথাটা অবশ্য ভারতবাসীদের অজানা নয়, তবু নতুন ক'রে বলারও প্রয়োজন আছে।

এবারে আমার কলকব্জার ব্যাখ্যা দেয়া দরকার, নয়তো বন্ধনীভুক্ত উল্লেখগুলি নিয়ে পাঠকেরা ধাঁধায় পড়বেন। মহাভারতের পর্বাধ্যায় সংখ্যায় আমি সর্বত্র কালীপ্রসন্নর অনুসরণ করেছি, কেননা সেটাই একমাত্র সমগ্র সংস্করণ, যা বাঙালি পাঠকের পক্ষে — অন্তত অধিকাংশের পক্ষে — অক্লেশে অধিগম্য হবে; কারো ইচ্ছে হ'লে অংশটি প'ড়ে নিতে পারবেন। দুঃখের বিষয়, বাল্মীকি-রামায়ণের কোনো তুলনীয় বঙ্গানুবাদ প্রচলিত নেই, তাই তৎসম্পৃক্ত উল্লেখ মূল গ্রন্থ অনুসারে দিতে হ'লো। আমি প্রথমে নাম করেছি পর্বের অথবা কাণ্ডের, পরবর্তী প্রথম সংখ্যাটি অধ্যায় বা সর্গ-সূচক, দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্লোক বা শ্লোকগুচ্ছ নির্দিষ্ট হ'লো। যে সব গ্রন্থে (যেমন দীর্ঘতর উপনিষৎসমূহে) অধ্যায়গুলিও পরিচ্ছেদে বিভক্ত, সেখানে তৃতীয় সংখ্যাটি শ্লোকবাচক। যেখানে একই প্রসঙ্গে একাধিক বিশ্লিষ্ট অধ্যায় বা শ্লোক উল্লিখিত হয়েছে সেখানে আমি কমা ব্যবহার করেছি, পারম্পর্য বোঝাতে হাইফেন। সংস্কৃত উল্লেখ ও উদ্ধৃতি কোন পুঁথির কোন সংস্করণ অনুযায়ী, তার তালিকা নিচে দেয়া হ'লো:

মহাভারত	আর্যশাস্ত্র (আদি থেকে শল্যপর্ব),
	বঙ্গবাসী (সমগ্র, নীলকণ্ঠের টীকা সংবলিত)
বাল্মীকি-রামায়ণ	আর্যশাস্ত্র
মনুসংহিতা	

মু খ ব ন্ধ

কঠোপনিষৎ	উদ্বোধন
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ	"
শ্বেতাশ্বতর "	"
ছান্দোগ্য "	"
কৌষীতকি "	মহেশচন্দ্র পাল সম্পাদিত
ভগবদ্গীতা	উদ্বোধন
আধ্যাত্ম-রামায়ণ	বঙ্গবাসী
মার্কণ্ডেয়পুরাণ	"

মহাভারতের সিদ্ধান্তবাগীশ-সংস্করণটিও আমি প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছি, যথাস্থানে তা উল্লিখিত হ'লো। লক্ষ করেছি, বঙ্গবাসী ও আর্যশাস্ত্রের লেখন ঠিক অনুরূপ নয়, সিদ্ধান্তবাগীশে পাঠান্তর ও ব্যত্যয় আরো বেশি, এবং এই তিনটি সংস্করণের মধ্যে পর্বাধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যাতেও অসাম্য অনেক। এদিকে আবার কালীপ্রসন্নে পর্বাধ্যায়-সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে ভিন্ন। কিন্তু এ-সব জটিলতা আমার আলোচনার পক্ষে তেমন জরুরি নয়; কেননা অধিকাংশ পাঠান্তর তুচ্ছ, অথবা সমার্থক বিকল্প শব্দে পর্যবসিত; আমি পাঠভেদের উল্লেখ করেছি শুধু নতুন কোনো তথ্য পাওয়া গেলে, অথবা যেখানে শ্লোকপর্যায় পৃথক — যেমন ৩,২১,৩০ ও ৪১ সংখ্যক পাদটীকায়। কোনো পাঠক যদি আমার উল্লেখ থেকে মূল শ্লোকে পৌঁছতে চান — আশা করি অন্তত কোনো কোনো পাঠক তা চাইবেন — তার জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র শ্রমের প্রয়োজন হবে, পুঁথিসংক্রান্ত হেরফেরগুলি বৃহৎ কোনো বিঘ্ন ঘটাবে না — যদি না অবশ্য অংশবিশেষ বর্জিত হ'য়ে থাকে।

আমার ব্যবহৃত অন্যান্য আকর-গ্রন্থের পরিচয়:

ঋগ্বেদ	রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত বঙ্গানুবাদ
অথর্ববেদ	William Dwight Whitney-কৃত ইংরেজি অনুবাদ (মূলের বহু শব্দ ও শব্দার্থ সংবলিত)
মৎস্যপুরাণ	বঙ্গবাসী (মূল ও বঙ্গানুবাদ)
ভাগবতপুরাণ	" (বঙ্গানুবাদ)
বিষ্ণুপুরাণ	আর্যশাস্ত্র (মূল ও বঙ্গানুবাদ)

হরিবংশ	বর্ধমান সং বঙ্গানুবাদ
জাতক	ঈশানচন্দ্র ঘোষ-কৃত বঙ্গানুবাদ
মহাভারত (বনপর্ব)	বর্ধমান সং বঙ্গানুবাদ
কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত	বসুমতী (সমগ্র)
কাশীরাম দাসের	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত
কৃত্তিবাসী রামায়ণ	দীনেশচন্দ্র সেন
তুলসীদাসের 'শ্রীরামচরিতমানস'	গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (মূল ও ইংরেজি অনুবাদ)

যেহেতু এই পুস্তক পুরাসাহিত্য-সম্পৃক্ত, তাই গ্রীক ও লাতিন নামের লিপ্যন্তরণে আমি একটু বিশেষ যত্নবান ছিলাম, সংশয়স্থলে বহুভাষাবিদ ফাদার রবের আঁতোয়ান, এস. জে. ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের উৎকৃষ্ট অভিধানটির কাছে নির্দেশ নিয়েছি। ফলত, আমার পূর্ব-ব্যবহার এখানে অনেক বদলে গেলো (ঈডিপাস স্থলে অয়দিপৌস, ইলেকট্রা স্থলে এলেকত্রা), কিন্তু পাঠকের স্বাচ্ছন্দ্যহানির আশঙ্কায় এ-ধরনের আক্ষরিক অনুকরণ আমি সর্বত্র করিনি। কোনো-কোনো বহুশ্রুত নামের প্রচলিত ইঙ্গ-বঙ্গীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রাখলাম (হোমার, ভার্জিল, সক্রেটিস, ট্রয়, ইলিয়াড); অন্য অনেক স্থলে মূলের ধ্বনি ও বাঙালির অভ্যাসের মধ্যে একটা রফা করা হ'লো। পাঠককে অনুরোধ, তিনি যেন এ-বিষয়ে কোনো যান্ত্রিক সমত্ব প্রত্যাশা না করেন।

গ্রন্থের অনামী অনুবাদ সবই আমার। কোনো-কোনো স্থলে পূর্বকৃত অনুবাদের অনুসরণ করেছি — অবশ্য ভাষাটাকে আমরা নিজের ছাঁচে ঢালাই ক'রে নিয়ে। সংস্কৃত থেকে অনুবাদকালে আমার সাধ্য-মতো মূলের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলাম।

'মহাভারতের কথা'র প্রথম লেখন রচিত হয় ১৯৭১-৭২-এর হেমন্ত ও শীতঋতুতে, প্রকাশিত হয় আঠারোটি কিস্তিতে 'দেশ' পত্রিকায়—বঙ্গাব্দ ১৩৭৮, ১৮ চৈত্র থেকে ১৩৭৯, ১৩ শ্রাবণ তারিখের সংখ্যা পর্যন্ত। প্রেস-কপি তৈরি করার সময় প্রথম দফা পরিশোধন ও পরিবর্ধন

করেছিলাম ; আর তারপর, আজকের দিনের শ্লথকর্ম বিদ্যুত-বিরল বিশৃঙ্খল কলকাতায় মুদ্রণব্যাপারে এত দীর্ঘ সময় কেটে গেলো যে, ইচ্ছে না ক'রেও, পুনর্বিবেচনার সময় পেয়েছিলাম প্রচুর। আমার সত্বর-তৃপ্ত শোধন-স্পৃহার তাড়নে, আদি রচনার অনেক অংশ ক্রমে-ক্রমে নতুন ক'রে লিখেছি, যোগ করেছি অনেক নতুন প্রসঙ্গ ও টীকা — প্রুফ সংশোধনের সময় পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার বিরাম ছিল না। আর বাংলা বইয়ের দুর্মরতম শত্রু যে ছাপার ভুল, তার বিরুদ্ধেও তিনজনে মিলে দীর্ঘায়িত যুদ্ধ চালিয়েছি। তবু, সব চেষ্টা সত্বেও, কিছু ত্রুটি অনিবার্যভাবে ঘ'টে গেলো, বইয়ের পরিশিষ্টে তা উল্লেখ করলাম।

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের সময় যাঁরা আমাকে পত্রদ্বারা বা টেলিফোনযোগে উৎসাহ দিয়েছিলেন, এই সুযোগে তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ তাঁদেরও, যাঁরা বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন; তাঁদের সব কথা আমি চিন্তা ক'রে দেখেছি, এবং আমার বিচারবুদ্ধি যেখানে সায় দিয়েছে, সেখানে যথোচিত পবিবর্তনও করেছি। আর যাঁরা আমাকে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাস বিষয়ে প্রশ্ন ক'রে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে ও সব বিষয় আমার চর্চার ও এই গ্রন্থের পরিধির বহির্ভূত। আমি পণ্ডিত নই, প্রেমিক-মাত্র ; এই আলোচনা এক রসভোক্তার আনন্দবোধের নিঃসরণ।

বইখানার একটি দ্বিতীয় খণ্ড আমার পরিকল্পিত আছে, কিন্তু কতদিনে তা লিখে উঠতে পারবো জানি না।

মার্চ, ১৯৭৪ — বু. ব.

নাকতলা, কলকাতা

সংকেত

অ	অধ্যায়
অনু	অনুবাদ
আশ্রম	আশ্রমবাসিক পর্ব
আশ্ব	আশ্বমেধিক পর্ব
ঈশান	ঈশানচন্দ্র ঘোষ
ঋ	ঋগ্বেদ
কালী	কালীপ্রসন্ন সিংহ-সম্পাদিত মহাভারত বঙ্গানুবাদ
গী	ভগবদগীতা
টী	টীকা
প	পঙক্তি
পরি	পরিচ্ছেদ
পৃ	পৃষ্ঠা
মনু	মনুসংহিতা
মহা	মহাপ্রস্থানিক পর্ব
রা-বসু	রাজশেখর বসু
সং	সংস্করণ
সিদ্ধান্তবাগীশ	হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য -সম্পাদিত মহাভারত
স্বর্গ	স্বর্গারোহণ পর্ব

মনিয়র মনিয়র-উইলিয়মস-প্রণীত *A Sanskrit English Dictionary*, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-প্রণীত 'বাঙলা ভাষার অভিধান', ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' বোঝাতে যথাক্রমে মনিয়র উইলিয়মস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, ও হরিচরণ লিখেছি।

সূচিপত্র

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥

কোনো-কোনো কবি এই ইতিহাস পৃথিবীতে পূর্বে বলেছিলেন, কেউ কেউ সম্প্রতি বলছেন, ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন।

১ : বনবাসের শেষ দিন

বনবাসের বারো বছর শেষ হ'য়ে এলো। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে দ্বৈতবনে আছেন — সুখে আছেন বলা যায় না। রাজ্য হারিয়ে দীর্ঘকাল বনে-বনে ঘুরছেন, সেই স্থায়ী পরিতাপের উপর সম্প্রতি একটি নতুন মনঃপীড়া যুক্ত হয়েছে: এই সেদিন জয়দ্রথ হঠাৎ দ্রৌপদীকে হরণ করেছিলেন। সত্য, দ্রৌপদীর উদ্ধার বিদ্যুৎবেগে সাধিত হয়েছিলো আর ভীমের হাতে প'ড়ে সিন্ধুরাজের নিগ্রহও কিছু কম হয়নি — তবু পঞ্চস্বামীরক্ষিত পাঞ্চালীর এই আকস্মিক অপহরণ যে আদৌ ঘটতে পেরেছিলো, সে-কথা ভেবে যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা পাচ্ছেন না। কিন্তু এরই স্বল্পকাল পরে এমন একটি দিক থেকে পাণ্ডবেরা আক্রান্ত ও পরাস্ত হলেন যা আমাদের পক্ষে চমকপ্রদ ও তাঁদের পক্ষে প্রায় চূড়ান্ত অপমান।

একদিন এক হরিণ এসে এক ব্রাহ্মণের অরণিকাষ্ঠ নিয়ে পালিয়ে গেলো। সেই মৃগকে নির্জিত ক'রে অগ্নিগর্ভ কাষ্ঠদণ্ডটি ফিরিয়ে আনা — এর চেয়ে সহজ কাজ পাণ্ডবদের পক্ষে আর কী হ'তে পারে? ধ'রে নেয়া যায় তাঁদের যে-কোনো একজনের দ্বারা — এমনকি নকুল বা সহদেবের দ্বারাও — এই কর্মটি অনায়াসে সম্পাদিত হ'তে পারতো, কিন্তু পঞ্চভ্রাতাই একসঙ্গে যাত্রা করলেন, এবং — আশ্চর্যের বিষয় — বহু অস্ত্রক্ষেপ ক'রেও তাঁদের নিত্যভক্ষ্য একটি তৃণভুক পশুকে বিদ্ধ করতে পারলেন না। আমাদের অস্পষ্টভাবে রামায়ণের মায়ামৃগকে মনে পড়ে, কিন্তু রাম তাকে শেষ পর্যন্ত বধ করতে পেরেছিলেন — যদিও তার ফলাফল মর্মান্তিক হয়েছিলো। এখানে ঘটনাটি অনেক বেশি মৃদু এবং কিছুটা রহস্যময় — তস্কর মৃগ নিজেকে রাক্ষসরূপে আত্মপ্রকাশ করলো না, অনুধাবনকারী বীরবৃন্দকে প্রতারিত ক'রে অরণ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। পাণ্ডবেরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে এক বটগাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য উপবিষ্ট হলেন।

মনে রাখতে হবে এর আগে সার্থকনামা ভীম বহুবার তাঁর দুর্দান্ত পেশীবলের পরিচয় দিয়েছিলেন। আদিপর্বে হিড়িম্ব ও বকরাক্ষসবধ এবং বনবাসের পঞ্চম বৎসরে কুবেরভবনে যক্ষসংহার তার কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। আর ইতিমধ্যে দেবদুলাল অর্জুনও এমন বহু অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে এনেছেন, যা দৈবশক্তিসম্পন্ন ও দুর্বার। অবশ্য এমন নয় যে এর আগেও তাঁদের কখনো পরাভব ঘটেনি — পাঠকের মনে পড়বে গাণ্ডীবধন্বা একবার এক বনচর কিরাতের বিক্রম সইতে না-পেরে মূর্ছিত হয়েছিলেন, এবং বলবান ভীমসেনকেও এক মহান অজগর বশীভূত করেছিলো। কিন্তু কিরাত ছিলেন ছদ্মবেশী বরদাতা শিব এবং মহাসর্পটিও শাপভ্রষ্ট নহুষ—পাণ্ডবদেবই এক দূর পূর্বপুরুষ তিনি। দেবতা বা দেবতুল্যের কাছে পরাজয়ে পরাজিতেরও কিছু গৌরব ঘোষিত হয় (কেননা দেবতা যাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে স্বীকার করেন সেই মানুষও ধন্য), কিন্তু তুচ্ছ এক মৃগের কাছে নতিস্বীকার, অতি সাধারণ একটি অরণিকাষ্ঠের পুনরুদ্ধার-চেষ্টার ব্যর্থতা — এ যে পাণ্ডবদের পক্ষে কত বড়ো গ্লানিকর ও সন্তাপজনক ঘটনা তা তাঁদের পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করামাত্র প্রতিভাত হয়। এবং তাঁরা যে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে পড়লেন তাতেও আমরা অস্বস্তি অনুভব করি ; মনে হয় এই দেবপুত্র ভ্রাতৃপঞ্চক তাঁদের বলবীর্য অসামান্যতা হারিয়ে জীবনের প্রাকৃত স্তরে অধঃপতিত হলেন।

কিন্তু একটু পরেই আমরা জানতে পারবো যে তাঁদের এই পরাভবও এক দেবতার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো : সে-দেবতা পেশীবলে বা অস্ত্রবলে নিজেকে প্রকাশ করেন না, তাঁর শক্তির উৎস অন্যত্র।

বৃক্ষছায়ায় ব'সে পাণ্ডবেরা দু-চারবার বিলাপোক্তি করলেন, তারপর তাঁদের জলতৃষ্ণা অদম্য হ'য়ে উঠলো। নকুল গাছে উঠে

অদূরবর্তী জলাশয়ের লক্ষণ দেখতে পেয়ে, যুধিষ্ঠিরের আদেশে জল আনতে গেলেন। বহুক্ষণ কেটে গেলো, নকুল ফিরলেন না। তারপর যা হ'লো, আশা করি কোনো পাঠককে তা মনে করিয়ে দিতে হবে না — যথাক্রমে সহদেব, অর্জুন, ও ভীম নারীজনোচিত জলাহরণকর্মে এগিয়ে গেলেন, কেউ ফিরলেন না। অগত্যা উৎকণ্ঠিত যুধিষ্ঠিরকেই ভাইয়েদের খোঁজে বেরোতে হ'লো। অতি রমণীয় এক সরোবরতীরে উপস্থিত হ'য়ে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর 'ইন্দ্রপ্রতিম ভ্রাতৃগণ যুগান্তকালীন লোকপালের ন্যায়'[১] মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ভূমিতে প'ড়ে আছেন। যথোচিতভাবে দীর্ঘায়িত শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশের পর যুধিষ্ঠির নিজে যখন সরোবরে নামলেন ঠিক সেই মুহূর্তে অন্তরীক্ষ থেকে এক নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হ'লো : —

> আমি মৎস্যশৈবালভোজী বক, আমিই তোমার অনুজদের প্রেতলোকে পাঠিয়েছি ; রাজপুত্র, তোমাকে তাদের অনুগামী পঞ্চম হ'তে হবে, যদি না আমার প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও।
>
> তাত কৌন্তেয়, সাহস কোরো না, এই সরোবর আমার পূর্ব-অধিকৃত ; আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পান করো বা জল নিয়ে যাও।
>
> (বন : ৩১২)

নেপথ্য-কণ্ঠ শুনে যুধিষ্ঠিরের মনে যেমন মহৎ কৌতূহল জাগলো তেমনি হৃদয় কেঁপে উঠলো আতঙ্কে ; এই দুই ভাবের যুগপৎ সংক্রমণে তিনি এমনকি মাথা-ধরায় পীড়িত হ'য়ে পড়লেন ('সমুৎপন্ন-শিরোজ্বরঃ')। তবু, ধীর ও যোগ্য ভাষায় আজ্ঞাকারীকে বন্দনা ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবন, আপনি কে ?' উত্তর হ'লো : 'ভদ্র, আমি যক্ষ, জলচর পক্ষী নই।[২] আমিই তোমার তেজস্বী ভ্রাতৃবৃন্দকে নিধন করেছি … কেননা তারা আমার বাক্য উপেক্ষা করে জলপানে উদ্যত হয়েছিলো। … পার্থ, যদি প্রাণে

বাঁচতে চাও, তাহ'লে আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপর পান করো বা জল নিয়ে যাও।'

যুধিষ্ঠির সম্মত হ'য়ে সরোবর থেকে তীরে উঠে দাঁড়ালেন: কূটবক্তা যক্ষের চৌত্রিশটি[৩] প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভাইয়েদের জীবন ফিরে পেলেন, আনুষঙ্গিক দু-একটা বরপ্রাপ্তিও ঘটলো। এর পর বনপর্বের আর একটিমাত্র ক্ষুদ্রাকার অধ্যায় আছে, তাতে পাণ্ডবেরা পরদিন থেকে অজ্ঞাতবাস উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এ থেকে বোঝা যায়, পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তর-পর্ব বনবাসের অন্তিম বা উপান্ত্য দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো[৪]।

এই ঘটনাটির তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে মহাভারতের একটি মূল রহস্য বেরিয়ে পড়বে।

১। অনু: কালীপ্রসন্ন।

২। যক্ষ তাঁর প্রথম উক্তিতেই বললেন: 'আমি মৎসশৈবালভোজী বক,' এবং যুধিষ্ঠিরও প্রশ্নোত্তরকালে তাঁকে একবার 'বারিচর' ও পরে আর-একবার 'এক-পায়ে-দাঁড়ানো' ('একেন পাদেন তিষ্ঠন্তম্') ব'লে অভিহিত করেছেন। কিন্তু যে-রূপে তিনি যুধিষ্ঠির দ্বারা — এবং আমাদের দ্বারা — দৃষ্ট হ'লেন, তা এক নিদারুণমূর্তি যক্ষের — কালীপ্রসন্নর ভাষায়, 'বিরূপাক্ষ, মহাকায়, তালসমুন্নত, সূর্যাগ্নিসদৃশ ও পর্বতোপম'। বকরূপী ধর্মের বর্ণনা কোথাও নেই। উপরন্তু, প্রশ্ন-কর্তাটি সর্বদাই যক্ষ ব'লে উল্লিখিত হয়েছেন ('যক্ষ উবাচ'), বকপক্ষীরূপে একবারও নয়। তবু সংলাপের ভাষা থেকে আমরা ধ'রে নিতে পারি যে ধর্ম অধিকাংশ সময় (এবং প্রশ্নোত্তরকালেও) বকপক্ষীরূপে স্থিত ছিলেন, শুধু প্রথম সাক্ষাতের পর একবার বিশালকায় যক্ষরূপে দেখা দিয়েছিলেন — সম্ভবত পুত্রের হৃদয়ে অধিকতর ভীতিসঞ্চারের জন্য। এবং নিজেকে ধর্মরূপে ঘোষণা করার পরেও তাঁর যে কোনো রূপান্তর ঘটেছিলো, এমন ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না।

এই কাহিনী থেকেই আমাদের 'বকধার্মিক' শব্দ উদ্ভূত হয়েছে কি? এর

কোনো সঠিক উত্তর আমার জানা নেই; শুধু মনে হয় এ-দুয়ে কোনো সম্বন্ধ নেই তা হ'তে পারে না — আছে নিশ্চয়ই; মনে হয় বনপর্বের ধর্মবকই প্রাকৃত ভাষায় 'বকধার্মিকে' রূপান্তরিত হয়েছেন; এ রকম অর্থবিপর্যয় জীবিত ভাষায় স্বভাবতই অনেক ঘ'টে থাকে। কিন্তু মনিয়র-উইলিয়মস-এর সংস্কৃত অভিধানে কপটতা অর্থে 'বকবৃত্তি' ও 'বকব্রত' শব্দ দুটি পাওয়া যায়; তাই ধারণাটি একেবারে অর্বাচীনও বলা যায় না। আমার মনে হয়, জলের ধারে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে-থাকা বকপক্ষীর মূর্তিতে পুণ্যাত্মা কবি শুধু ধ্যানীর প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু সংসারী লোকেরা কখনো ভুলতে পারেনি যে বক আসলে মৎস্যশিকারে মনোযোগী।

৩। আসলে অনেক বেশি, কেননা শুধু ৭, ২৯, ৩০ ও ৩১ নম্বরে একটি ক'রে প্রশ্ন আছে; অন্যগুলিতে দুই থেকে পাঁচ, আর অধিকাংশে চারটি ক'রে গ্রথিত। আমি কালীপ্রসন্ন থেকে গণনা ক'রে সাকুল্যে একশো-ছাব্বিশটি পেয়েছি। (এই সংখ্যা আর্যশাস্ত্র ও বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুযায়ী, কিন্তু সিদ্ধান্ত-বাগীশে প্রশ্নসংবলিত শ্লোকের সংখ্যা তেইশ, মোট প্রশ্ন সাতাশিটি।)

৪। এ-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই, কেননা যুধিষ্ঠির তা প্রাঞ্জলভাবেই যক্ষকে জানিয়ে দিচ্ছেন। ('বর্ষাণি দ্বাদশারণ্যে ত্রয়োদশমুপস্থিতম।') বন-পর্বের শেষ অধ্যায়ে এবং আরো একবার বিরাটপর্বের আরম্ভে বলা আছে যে অজ্ঞাতবাসের সময় আগত হ'লো। ('অজ্ঞাতবাসসময়ং শেষ বর্ষং ত্রয়োদশম্'। 'দ্বাদশেমানি বর্ষাণি রাজ্যবিপ্রোষিতা বয়ম্। ত্রয়োদশঽয়ং সম্প্রাপ্তঃ…' ॥)

২ : 'এক অন্তহীন অরণ্য'

[মহাভারত] এক ভারতবর্ষীয় অরণ্যের মতো বিস্তীর্ণ; তাতে বৃক্ষ-সমূহ পরস্পরে বিজড়িত ও স্থূলাঙ্গ লতাগুল্মে জটিল; বহুবিচিত্র পুষ্পমঞ্জরীতে তা বর্ণিল ও সুগন্ধি, সর্বপ্রকার জীবের তা বাসস্থান। আমরা শুনতে পাই মনোমুগ্ধকর বিহঙ্গধ্বনি, আর সেই সঙ্গে বন্য শ্বাপদের ভীষণ হুংকার; বিষাক্ত সাপ নম্র কপোতের পাশেই কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে থাকে; সেখানে বাস করে দস্যু—বিধিবিধান থেকে মুক্ত, কিন্তু অবিশ্বাস্য কুসংস্কারের

দাস; আর সেই সঙ্গে থাকেন ত্যাগপরায়ণ মনস্বী, যাঁর দৃষ্টি জগৎসীমান্তের ঊর্ধ্বলোকে সংহত, এবং যাঁর ভাবনা বহির্বিশ্বের ও তাঁর নিজের অন্তরাত্মার গভীরতম স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। অন্য যে-কোনো ক্ষমতাকে যা ইচ্ছাশক্তিতে অতিক্রম ক'রে যায়, এমনি এক অফুরান প্রাণের ঐশ্বর্য এখানে বদ্ধমূল; আর তারই পাশে পাওয়া যায় বহু-সহস্রাব্দ-সঞ্চিত এক গুরুভার ও নিষ্প্রাণ নিদ্রা, স্বপ্নের সেই অতি গভীর তলদেশ, য'র মধ্যে আমরাও হয়তো মগ্ন হ'য়ে যেতাম, যদি না দংশনকারী অসংখ্য মক্ষিকাও থাকতো। আর এমনি ক'রে দীর্ঘকাল ধ'রে চলতে পারতাম আমরা বিস্ময়ের পর বিস্ময় অনুধাবন ক'রে, কিন্তু যাত্রাশেষে কখনোই উত্তীর্ণ হতাম কিনা সন্দেহ[৫]।

জর্মান পণ্ডিতের এই বর্ণনায় সম্মতি জানাতে কারোরই আপত্তি হবার কথা নয়। আমরা অনেকেই, কোনো-না-কোনো সময়ে, এই অরণ্যের মধ্যে দিকভ্রান্ত হয়েছি; হারিয়ে ফেলেছি ক্ষীণবঙ্কিম পথরেখার চিহ্ন; কোথায় আছি — কোন দেশে, কোন কালে, কোন লৌকিক বা অলৌকিক সংসর্গে, আমাদের সেই চেতনাটুকুও অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে। অতিপ্রজ, অসংলগ্ন, পুনরুক্তিবহুল, নির্বাচনহীন, ভয়াবহভাবে বৃহদায়তন — এগুলোই মহাভারতের প্রাথমিক ও সবচেয়ে প্রতীয়মান চরিত্রলক্ষণ। এর দ্বারা বাঙালি বুধবৃন্দের মধ্যে যিনি সবচেয়ে তীব্রভাবে ও সোচ্চারভাবে প্রতিহত হয়েছিলেন, তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র'-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র; আর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা, গ্রন্থটির মৌলিক বা আংশিক মহত্ত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েও, এই অতিবিস্তার-দোষে কতদূর পর্যন্ত উত্ত্যক্ত, উপরোক্ত 'দংশনকারী মক্ষিকারা'ই তার প্রমাণ দিচ্ছে। সমভাবাপন্ন মৃদু বা রূঢ় ভর্ৎসনার অভাব নেই, কিন্তু আমি আমার স্বীয় বক্তব্যে সত্বর চ'লে আসতে চাই, তাই শুধু একটি কাব্যস্তবক তুলে দিচ্ছি, যার মধ্যে নিখিল-প্রতীচীর মর্মানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। স্তবকটির রচয়িতা ফ্রীডরিখ

র‍্যুকার্ট, উনিশ-শতকী ভারত-ভক্ত জর্মান কবি, সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদক ও প্রচারক। রামায়ণ বিষয়ে তাঁর অভিমত তিনি পদ্যাকারে নিবদ্ধ করেছিলেন, আমি গদ্য ভাষায় অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি :

> রামায়ণে যা প্রাপণীয়, সেই সব অস্বাভাবিক বিকৃত মুখভঙ্গি ও ফেনোচ্ছল বাগাড়ম্বরকে অবজ্ঞা করতে হোমার তোমাকে শিখিয়েছিলেন; কিন্তু অমন গভীর অনুভূতি ও উন্নত চিন্তাপর্যায় ইলিয়াডে লভ্য নয়।

এই কথা মহাভারত বিষয়ে আরো কত গভীরভাবে প্রয়োজ্য, তা না-বললেও চলে।

মহাভারতকে 'দোষমুক্ত' করার জন্য য়োরোপীয় পণ্ডিতেরা দেড়শো বছর ধ'রে সচেষ্ট আছেন, আজ পর্যন্ত সেই প্রয়াসের নিবৃত্তি হয়নি। তাঁদের বহুশ্রমসাপেক্ষ গবেষণার ফলে আজকের দিনে এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত যে মহাভারত (এবং রামায়ণও) আদিতে ছিলো শুধু সূতকীর্তিত রণকাহিনী, আকারে অনেক উনদীর্ঘ, ঘটনাবিন্যাসে অনেক বেশি সুশৃঙ্খল। পরবর্তী কালে যুগে-যুগে তাতে বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, এবং ব্রাহ্মণেরা—তাঁদের স্ববর্ণ ও স্বধর্মের গৌরব-ঘোষণার জন্য — প্রগাঢ় হস্তাবলেপনে মূল চিত্রটিকে কখনো বিকৃত, কখনো অসমঞ্জস, ও কখনো বা মিথ্যার দ্বারা আবৃত করেছেন। এ-কথা অবশ্য অস্বীকৃত হয়নি যে র‍্যুকার্ট-কথিত 'মহৎ চিন্তাগুলি'ও ব্রাহ্মণেরই অবদান; তবু আধুনিক যুগের খাঁটি ক্ষত্রিয়েরা, অর্থাৎ উত্তর-য়োরোপীয়গণ, এই ব্রাহ্মণীকরণকে অবিমিশ্র প্রীতির চোখে দেখতে পারেননি। আর সেটাও একটা কারণ, যেজন্যে অবলেপনের আচ্ছাদন সরিয়ে আদিম ক্ষাত্র কাব্যটির পুনরুদ্ধার-চেষ্টায় তাঁরা অনবরত যত্নশীল। কোন-কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বা নয়, তা নিয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে স্বভাবতই বিতর্ক আছে, কিন্তু মহাভারতের বহু অংশ—এমনকি অধিকাংশই—যে অমৌলিক সে-বিষয়ে

পণ্ডিতমহলে প্রায় মতান্তর নেই। বঙ্কিমও তাঁর 'আদর্শ মনুষ্য' কৃষ্ণের চরিত্র আঁকতে গিয়ে বার-বার মহাভারতের আদিম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় স্তরের উল্লেখ করেছেন — যেখানেই তাঁর অভিপ্রেত আদর্শের মধ্যে চতুর কৃষ্ণ কোনোমতেই ধরা দিচ্ছেন না, সেখানেই অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত ব'লে ধ'রে নিয়ে সমস্যা চুকিয়ে দিয়েছেন — অতি সহজে, এবং সব সময় বিশ্বাস্যভাবেও নয়।

মহাভারতের স্তরভেদ আমি অস্বীকার করতে চাচ্ছি না, তা কারো পক্ষে সম্ভবও নয়; বরং আমি বলি — শুধু তিনটি কেন, আটটি বা দশটি স্তরপর্যায় থাকাও অসম্ভব নয়, এ-বিষয়ে যথার্থ ও অকাট্য জ্ঞান কখনো লব্ধ হবে এমন দুরাশা না-করাই ভালো। সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে গ্রন্থটি এমন বহু কবির সমবায়কর্ম, যাঁদের রচনাশক্তি দুস্তরভাবে অসমান, উপাস্য দেবতা ও ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন, এবং জীবৎকাল বহু শতাব্দীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। নয়তো কেন এখানে মহনীয় ও তুচ্ছ বিষয় একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের মতো সহবাসী, কেন কবিত্বের তুঙ্গ চূড়া থেকে বার-বার আমরা ধূমাচ্ছন্ন নিম্নভূমিতে পতিত হচ্ছি, কেন অনুশাসনপর্বে গো-ব্রাহ্মণস্তুতি এমন দুঃসহভাবে পুনরাবৃত্ত, আর কেনই বা সৌপ্তিকপর্বের শেষ দুই অধ্যায় জুড়ে স্বয়ং কৃষ্ণ শূলপাণির মাহাত্ম্য রটনা করবেন, আবার শঙ্করের মুখ দিয়েই বা বিষ্ণুমহিমা কীর্তিত হবে কেন (অনুশাসন : ১৪৭)? শুধু তা-ই নয়, অনার্য পশুপতি-শিবকে আমরা একবার গো-বন্দনায় ভাবাপ্লুত হ'তে দেখি (অনুশাসন : ১৩৩), এমনকি কঠোপনিষদের রোমাঞ্চকর যম-নচিকেতাও গোদানের পুণ্যপ্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছেন (অনুশাসন : ৭১)! সমগ্র গ্রন্থটির দিকে বিহঙ্গ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেও এই বৈষম্য ও বিমিশ্রতা অনুভূত হয়, প্রমাণের জন্য গবেষকের দ্বারস্থ হ'তে হয় না — অথবা সে-প্রয়োজন আছে শুধু অন্যান্য গবেষকদের, আমরা যারা পাঠক ও ভোক্তা আমাদের

নয়। মহাভারতের জন্মকথা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তা মেনে নেবার কোনো বাধা আমি দেখতে পাই না[৬]। এ-কথা খুবই বিশ্বাসযোগ্য যে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও অবক্ষয়ের পরে এমন একটা সময় এসেছিলো যখন ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা তাঁদের সুদীর্ঘ ও অতিবিচিত্র ঐতিহ্যের সংরক্ষণকার্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন — স্মৃতির উপরে আর নির্ভর না-ক'রে অবিক্ষিপ্ত ও লিপিবদ্ধভাবে। সেই প্রেরণা থেকেই, কোনো-একটি অস্পষ্ট-স্মৃত ইতিহাসবিন্দুকে ঘিরে-ঘিরে যুগ-যুগ ধ'রে সেই গ্রন্থ রচিত বা নির্মিত বা সম্পাদিত হয়েছিলো, প্রাচীনেরা যার নাম দিয়েছিলেন ভারতসংহিতা। এখানে 'ভারত' শব্দে যুগপৎ ভরতবংশ ও ভৌগোলিক ভারতবর্ষ সূচিত হচ্ছে, এবং 'সংহিতা'রও অর্থ সংগ্রহ। আত্মরক্ষার তাড়নায় ব্রাহ্মণেরা এই সংহিতাটিকে এক সর্বগ্রাহী নির্বিচার ভাণ্ডার ক'রে তুলেছিলেন, সেইজন্যেই আধুনিক দৃষ্টিতে তা এত সমস্যাকীর্ণ ও বিভ্রান্তিজনক।

৫। *Sexual Life in Ancient India :* Johann Jakob Meyer, Routledge and Kegan Paul, London, সং ১৯৫২, পৃ ১। (ইংরেজি অনুবাদকের নাম উল্লিখিত নেই।)

৬। 'পরিচয়,' "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা"। যাঁরা মহাভারত রামায়ণ বিষয়ে কৌতূহলী, তাঁদের পক্ষে পুরো প্রবন্ধটি অনুধাবনযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে বৌদ্ধ বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন সমাজকে আবার সংবদ্ধ করার জন্যই হিন্দুরা সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর কালনির্দেশ এই কারণেও মান্য যে মহাভারতে জৈন-বৌদ্ধ উল্লেখ প্রচ্ছন্নভাবে বহুবার এবং দু-একবার স্পষ্টভাবেও পাওয়া যায়। এ থেকে অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত অসংগত যে বর্তমান গ্রন্থের কোনো-কোনো প্রধান অংশ বৌদ্ধযুগ-পূর্ববর্তী নয়।

৩ : গোত্রবিচার

মহাভারত বিষয়ে আর-একটি অসুবিধে এই যে আজকের দিনে আমরা সাহিত্য বলতে যা বুঝি — অথবা প্রাচীনেরা যা বুঝতেন — তার সব সীমানা ও সংজ্ঞার্থ তা দুর্ধর্ষভাবে লঙ্ঘন ক'রে যায়। আদিপর্বের অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে, প্রথম ছিয়াশিটি শ্লোকের মধ্যেই এই ভারত-কথা নানা নামে চিহ্নিত হয়েছে : সৌতি ও শ্রবণেচ্ছু ঋষিরা প্রথমে বললেন 'ইতিহাস', ব্যাসদেব নাম দিলেন 'কাব্য', স্বয়ং ব্রহ্মা সেই আখ্যা সমর্থন করলেন — কিন্তু পরে আবার একে বলা হ'লো 'পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র', যা থেকে 'শ্রুতিরূপ জ্যোৎস্না' বিকীর্ণ হচ্ছে — এখানে 'শ্রুতি' কথাটি বেদান্ত অর্থে গ্রহণীয়। প্রতিটি অভিধাই প্রয়োজ্য, কিন্তু কোনো-একটির মধ্যে এই মহাগ্রন্থকে আটকে ফেলার কোনো উপায় নেই। য়োরোপীয় পরিভাষা অনুসারে এটি (বা এর মৌলিক অংশটি) পৃথিবীর অল্প কয়েকটি আদিম এপিকের অন্যতম; কিন্তু যে-মানদণ্ডে আমরা অন্যান্য আদিকাব্যের — ধরা যাক ইলিয়াড বা অদিসি বা এমনকি আমাদের নিজস্ব রামায়ণের বিচার করতে পারি, মহাভারতের সমগ্রতায় ছোঁওয়ানোমাত্র তা চূর্ণ হ'য়ে যায়। খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের রোম-নিবাসী গ্রীক কবি দিয়ন ক্রিসোস্তোম এমন একটি হিন্দু কাব্যের অস্তিত্ব জানতেন যা হোমার থেকে 'অপহৃত বা অনূদিত' — এটি কোন কাব্য তা সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে রামায়ণ ব'লেই মনে হয়। রামায়ণ ও ইলিয়াডের তুলনামূলক আলোচনা — গল্পাংশের অগভীর ও আংশিক সাদৃশ্যের জন্য — পাশ্চাত্ত্য জগতে এখনো প্রচলিত আছে; কিন্তু আবহমান বিশ্বসাহিত্যে মহাভারত এক তুলনাহীন নিঃসঙ্গতা নিয়ে বিরাজমান। 'তুলনাহীন' বিশেষণটা এখানে প্রশংসাসূচক নয়; আমি বলতে চাচ্ছি যে অন্যান্য এপিকের তুলনায় — ইলিয়াডের

মতো 'আদিম' বা ঈনীডের মতো 'সাহিত্যিক' যা-ই হোক না — অন্য সব এপিকের তুলনায় মহাভারত অভিপ্রায়ে ভিন্ন, পদ্ধতিতে বা পদ্ধতির অভাবেও স্বতন্ত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের পরিভাষা অনুসারে রামায়ণকে কাব্য বললে ভুল হয় না, এবং তা বলাও হয়েছে অনেকবার; পরবর্তী অলংকারবহুল কাব্যরীতির উৎসই হ'লো রামায়ণ: কিন্তু মহাভারতকে ঐ অ্যাখ্যা দিতে গেলে 'কাব্য' কথাটার অর্থ অন্যায়ভাবে সম্প্রসারিত হ'য়ে পড়ে। এমন নয় যে মহাভারত কাব্যগুণে দরিদ্র — তার কোনো-কোনো অংশে কবিতার বিভা নক্ষত্রের মতো অনির্বাণ; কিন্তু অনেক স্থলে দেখি রসাত্মক বাক্য-রচনার চেষ্টামাত্র নেই, ছন্দোবন্ধের ন্যূনতম দাবিটুকুও স্বীকৃত হয়নি সর্বত্র — কোনো-কোনো চরণ শ্লোকচ্যুত ও একক, কখনো দ্বিপদীর বদলে ত্রিপদী পাওয়া যায়, এবং আদিপর্বের তৃতীয় অধ্যায়টির অধিকাংশ একেবারেই পদাতিক গদ্যে লিপিবদ্ধ আছে, সাংবাদিক ধরনে তথ্যজ্ঞাপন ছাড়া লেখকের সেখানে আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই। শান্তিপর্বের ৩৪২ সংখ্যক অধ্যায়েরও শুধু কথারম্ভটি শ্লোকবদ্ধ, তারপর সমস্তটাই গদ্যরচনা। সৌতির অনুসরণে আলংকারিকেরা মহাভারতকে 'ইতিহাস' আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ইতিহাস অর্থ ছিলো — 'হিস্ট্রি' নয়, কিংবদন্তী, ইতি-হ-আস, 'এমনি ছিলো, এমনি হয়েছিলো' [ব'লে শোনা যায়][৭]। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে মহাভারত আধুনিক অর্থে (বা অলীকবিশ্বাসী হেরোদোতস-এর অর্থেও) ইতিহাস নয় — ইতিহাসের এক বিশাল ও অস্পষ্ট আকরভাণ্ডার, যাতে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তথ্য ও উদ্ভাবনা, ধূসর ও ধূসরতর স্মৃতিসমূহ কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। এরই অন্তর্ভূত ভগবদ্‌গীতা ধর্মগ্রন্থ হিশেবে যে-মর্যাদা পেয়েছে, তা কখনো সমগ্রটির প্রতি অর্পিত হয়নি এবং হ'তেও পারে না। পক্ষান্তরে, আকারে তুলনীয় কথাসরিৎসাগরের

মতো একে য়োরোপীয় ভাষায় 'রোমান্টিক' কাহিনীসম্ভারও বলা যায় না, কেননা এতে গল্পের ফাঁকে-ফাঁকে উপদেশের স্রোত প্রবহমান; আবার সেই উপদেশে পঞ্চতন্ত্রের স্পষ্টতা ও একমুখিতাও নেই যে আমরা একে নীতিশাস্ত্র নামে অভিহিত করবো। অথচ এতে সবই আছে: শান্তিপর্বে পঞ্চতন্ত্র ধরনের অনেক পশু-কথিকা; এক যুবতী-বৃদ্ধা মায়াবিনীর কাহিনী (অনুশাসন: ১৯-২১) যা অংশত চমকপ্রদভাবে রোমান্টিক; আছে য়োরোপীয় বীরগীতি-শোভন বিদুলা-সংবাদ (উদ্যোগ: ১৩১-১৩৪); আর গীতার বাইরেও উন্নত ধর্মচিন্তার কোনো অভাব নেই। আর জরাসন্ধবধ, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের সংঘর্ষ, দ্রোণ-দ্রুপদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা — এই ধরনের ঘটনার সূত্রে ভূগর্ভপ্রোথিত ঐতিহাসিক ভিত্তিশিলাও আমাদের অনুমেয় হয়ে ওঠে। 'সাহিত্য' শব্দের যে-মিলনধর্মী ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ একবার দিয়েছিলেন,[৮] সে-অনুসারে সাহিত্য-পদবিতে মহাভারতের অধিকার সর্বাগ্রগণ্য — কিন্তু কোনো-একটি 'বই' কোনো-একটি সুনির্দিষ্ট পুস্তক বা সাহিত্যসংকলন হিশেবে একে যেন ঠিক ধারণা করা যায় না, কেবলই মনে হয় এটি একটি বিপুলবিস্তৃত বিশ্বকোষ।

বিশ্বকোষ? এক অর্থে নিশ্চয়ই তা-ই, কেননা এতে প্রবিষ্ট হয়েছে তৎকালীন ভারতভূমিতে প্রচলিত সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান; সব ভাবনা ও সাধনা; ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, বিধিবিধান; সব উপাখ্যান ও উপকথা; লোকাচার, লোকবিদ্যা ও প্রবচন; সব সৌন্দর্য ও আনন্দবোধ; সাংসারিক অভিলাষ ও আধ্যাত্মিক অভীপ্সা; সব জ্যোৎস্না ও সূর্যকিরণ; সব দ্বন্দ্ব ও সংশয় ও সম্ভবপর সমাধান। হ্যাঁ, কুসংস্কারও আছে, কেননা কুসংস্কার উচ্ছিন্ন করলে তার অন্তর্লীন বিশ্বাসটিও হারিয়ে যায়; আছে দুঃস্বপ্ন ও আতঙ্ক ও তমিস্রা, কেননা সেগুলিও জীবনের অঙ্গ, আমাদের মানুষিক উত্তরাধিকার।

এই সবই সত্য, কিন্তু আজকাল আমরা বিশ্বকোষ বলতে যা বুঝি যাতে তথ্যনির্ভর নিখিলবিদ্যা বিশুষ্কভাবে বিবৃত হয়, এবং যার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সংযোগসাধনের একমাত্র উপায় বর্ণানুক্রম, তার সঙ্গে মহাভারতের যে কোনো সাদৃশ নেই তা অবশ্য না-বললেও চলে। আমরা দেখতে পাই এমন অনেক অংশ যা নিছক তথ্যসেবনে পর্যবসিত: যেমন সঞ্জয়কথিত ভূবৃত্তান্ত (ভীষ্ম: ৬-৯) বা মার্কণ্ডেয় মুনির সৃষ্টিবর্ণনা (বন: ১৮৮)। বিষ্ণুর সহস্র ও শিবের অষ্টোত্তর-সহস্র নামের তালিকা বিষয়ে (অনুশাসন: ১৪৯, ১৭) কিছু বলা বাহুল্য, কিন্তু বনপর্বের সারবান তীর্থ-প্রশস্তিটিও (অ: ৮২-৮৫) আধুনিক ভ্রমণনির্দেশিকার শৈলীতে লেখা বিবরণমাত্র। এমনকি মহামতি ভীষ্মের উপদেশও কখনো-কখনো অধ্যাপকীয় ধরনে নিতান্তই তাত্ত্বিক হ'য়ে পড়ে; উদাহরণত তাঁর রাজধর্মবিষয়ক ভাষণটি উল্লেখ্য (শান্তি: ৫৬-৫৮)। এবং এই আক্ষরিকভাবে শিক্ষাপ্রদ অংশগুলি পরিমাণেও প্রচুর। কিন্তু অনেক স্থলেই — অধিকাংশ স্থলেই — তথ্য ও তত্ত্বসমূহ উপাখ্যানে আশ্রিত: সেগুলি সবই সমানভাবে তেজস্ক্রিয় নয়, কিন্তু এমন উদাহরণ অবিরল ও অজস্র পাওয়া যায় যেখানে উপাখ্যানের অন্তঃস্তল থেকে — সপ্রাণভাবে, সাংকেতিকভাবে, আমাদের কল্পনাবৃত্তির পক্ষে উত্তেজকভাবে — মেঘচ্ছুরিত সূর্যরশ্মির মতো বেরিয়ে আসছে এক-একটি দ্যুতিময় চিত্রকল্প — সেই সব সগর্ভ ও অনিঃশেষ-রহস্যপূর্ণ চিত্রকল্প যাকে য়োরোপীয় ভাষায় 'মিথ' বলা হয়, আর হিন্দুরা আরো দৃষ্টিবানভাবে যার নাম দিয়েছিলেন পুরাণ[১] — একাধারে আদিম ও চিরন্তন, চিরপুরাতন ও চিরনূতন সেই সামগ্রী। আর সেটাই কারণ, যেজন্য আজ বহু দীর্ঘ শতাব্দী ধ'রে শিক্ষিতনিরক্ষর-নির্বিশেষে, ভারতবাসীরা মহাভারতে মুগ্ধ হ'য়ে আছে। একদিকে এই পৌরাণিক ঐশ্বর্য, অন্যদিকে এক বদ্ধমূল

ধর্মবোধ, ভালো-মন্দের বিচারে ক্লান্তিহীন ও বিচিত্র অধ্যবসায় — এই দুটো দিক মিলিয়ে দেখলে মহাভারত একটি নতুন পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিভাত হয়। তখন দেখতে পাই, হোমার ও হেসিয়দ থেকে আরম্ভ ক'রে, আথেনীয় নাট্যকারদের পেরিয়ে, অভিদ ও ভার্জিলকে স্মরণ রেখে দান্তে পর্যন্ত পৌঁছলে আমাদের মানসপটে যা অঙ্কিত হয়, মহাভারত সেই সুদীর্ঘ ভাবরেখারই সমান্তর[১০]। সমান্তর মানে সমধর্মী নয়, য়োরোপীয় ও ভারতীয় চিৎপ্রকৃতির বৈষম্য বিষয়ে আমরা সকলেই অবহিত আছি, এবং এও আমি স্বীকার করি যে শিল্পগুণে সফোক্লেসের নাটক বা দান্তের কাব্যের সঙ্গে মহাভারতের তুলনার কোনো প্রশ্ন ওঠে না — বস্তুত, এই সংহিতাটিকে একটি 'শিল্পকর্ম' হিশেবে বিবেচনা করাই বাতুলতা। না, কোনো শিল্পকর্ম নয়, কিন্তু শিল্পকর্মের অনিঃশেষ উপাদান-ভাণ্ডার, সমগ্র গ্রীক-রোমক মিথলজির চেয়েও ঐশ্বর্যবান ও বিশালতর। অর্থাৎ, য়োরোপীয় পুরাসাহিত্যে যে-পরিমাণ বস্তু ও মনীষিতা ও কল্পনা-বিভা বহু বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, ভারতবর্ষ যেন স্পর্ধিতভাবে, বা উপায়ান্তর না-দেখে তার নিজের ধরনে ঠিক ততটাই সন্নিবিষ্ট করেছিলো — একটিমাত্র গ্রন্থনের মধ্যে, একটিমাত্র শিরোনামার তলায়।

এইজন্যে আমি মহাভারতের অসংখ্য ত্রুটি লক্ষ ক'রেও সে-বিষয়ে অসহিষ্ণু হ'তে পারি না। সম্প্রতি আমি প্রবলভাবে অনুভব করছি যে মহাভারত কোনো নান্দনিক সূত্রে বিচার্য নয়: তা থেকে নিজেদের মনোমতো অংশগুলিকে ছেঁকে নিয়ে শুধু সেটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকার অধিকার আমাদের কারোরই নেই, আর তা থাকতে গেলে আখেরে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো। মেঘদূতের কোনো-একটি শ্লোক কাব্যগুণে মলিন হ'লে সেটিকে প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ অন্য হাতের রচনা ব'লে সন্দেহ করা বিধেয়, কিন্তু যাতে কালান্তরবর্তী বহু স্বাক্ষর

অদৃশ্যভাবে কিন্তু বোধগম্যভাবে অঙ্কিত হ'য়ে আছে, তার অংশ-বিশেষকে 'প্রক্ষিপ্ত' ব'লে আমরা শুধু এই অভিমতটি জানাতে পারি যে মহাভারত মাপে অত লম্বা না-হ'লে অনেক বেশি ভালো বই হ'তো। যে-সব অংশ প্রাসঙ্গিকভাবে — বা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক-ভাবেও আবির্ভূত হচ্ছে, সেগুলি আসলে সংযোজন বা পরিবর্ধন; কখনো-কখনো হতশ্রী বা অনর্থক মনে হ'লেও আমরা তাদের আঙুলের টোকায় উড়িয়ে দিতে পারি না। আর অসংগতি? সেই সব জাজ্বল্যমান স্ববিরোধ, যা সর্বদেশীয় সমালোচকের সর্বপ্রধান আক্রমণ-স্থল, আর যা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও বহু বিক্ষোভ প্রকাশ করে গেছেন — সেগুলির বাহুল্য এমন একটি সনাতন ও স্বাভাবিক কারণে ঘটেছে যে 'অসংগতি' কথাটাই এখানে অসংগত। গ্রীক জাতি সামঞ্জস্য-বোধের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু তাদের পুরাণেও আমরা সুসংবদ্ধতা পাই না। ধরা যাক হেরাক্লেস-এর দ্বাদশ কীর্তি — সেগুলি ঠিক কোন উপায়ে সাধিত হয়েছিলো তার নানারকম ব্যাখ্যা আমরা শুনেছি। অদিসেয়ুসের পিতা কে ছিলেন তা নিয়েও আমাদের সংশয় জাগে যখন দেখি হোমারে তিনি ইথাকাপতি লায়ের্তেস-এর পুত্র বলে ঘোষিত, কিন্তু ইউরিপিদেস তাঁকে নরকভোগী ধূর্ত সিসিফসের পুত্র ব'লে উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং দেবরাজ জেয়ুস ক্রনস-এর জ্যেষ্ঠ না কনিষ্ঠ পুত্র তা নিয়েও মতভেদ আছে। আর আগামেম্নন-কন্যা এলেক্‌ত্রা — যার নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করা হয়েছে 'অপরিণীতা' — ঈস্কিলসের সেই হত্যাপণকারিণী অবিস্মরণীয় কুমারী — তাকে আমরা ইউরিপিদেসে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ দেখতে পাই, একবার এক দীন কৃষকের, আর-একবার অরেস্তেস-সুহৃৎ পিলাদেস-এর সঙ্গে। আগামেম্নন-এর আর-এক কন্যাকেও এই প্রসঙ্গে মনে প'ড়ে যায়: ইফিগেনিয়া, এক অশ্রুমতী তরুণী, যাকে তারই পিতা নিজের হাতে আউলিস-তটে বলি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই

কন্যাবধের ব্যাপারটাও অনিশ্চিত, কেননা অন্য এক উপাখ্যান অনুসারে ইফিগেনিয়া এক দেবীর দয়ায় রক্ষা পেয়েছিলো — ছুরিকাঘাতের পূর্বমুহূর্তে আর্তেমিস তাকে আকাশ-পথে দূর বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি দেবরাজদুহিতা মেনেলাঅস-পত্নী পারিসপ্রেমিকা হেলেন — যার মুখশ্রীর জন্য ট্রয় নগরী বিধ্বস্ত হ'লো — তিনিও, শোনা যায়, সতীত্ব থেকে ভ্রষ্ট হননি, পারিস যাকে নিয়ে পালিয়েছিলো সে হেলেনের এক ছায়ামূর্তি মাত্র[১১]। উদাহরণ পুঞ্জিত করা নিষ্প্রয়োজন: কেননা পুরাণ-কথার ধর্মই এই যে তা একই বীজ থেকে — শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে — বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে। এখন কথাটা এই যে মহাভারতের মতো একটি সৃষ্টিছাড়া গ্রন্থ, যাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ভারতপুরাণ সঞ্চিত আছে — সেই দূরবৈদিক ইন্দ্র বরুণ অগ্নিদেব থেকে নবীনাভীষণা দুর্গা-কালিকার রূপায়ণ পর্যন্ত (বিরাট : ৬, ভীষ্ম : ২৩) — তাতে অসংগতির এই যে প্রাচুর্য ও নিষ্কুণ্ঠ সমাবেশ আমরা দেখতে পাই, সেটাই কি তার বৈভবের অভিজ্ঞান নয়? যুদ্ধ হয়েছিলো কুরু-পাঞ্চালে না কুরু-পাণ্ডবে, কৃষ্ণের পত্নীর সংখ্যা দুই না চার না আট না সাকুল্যে ষোলো-শো-আটটি, বিরাটপর্বে অত সহজে জয়লাভ করার পরেও পাণ্ডবদের কেন আঠারো দিন ধ'রে ঘোর যুদ্ধ করতে হয়েছিলো, অথবা শিবিরাজার উপাখ্যানটি কেন তিনবার তিন ভিন্ন ধরনে বলা হয়েছে (বন : ১৩১, ১৯৬ ও অনুশাসন : ৩২), এবং তার একটি প্রকরণে আত্মমাংসদাতা ব্যক্তিটি কেন শিবিও নন, তাঁরই পিতা উশীনর — এ-সব প্রশ্ন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ও চিন্তাকুল হ'য়ে পড়লে আমরা মহাভারতকে তার সত্য রূপে দেখতে পাবো না। আমরা কে কী চাই, কোন প্রত্যাশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে মহাভারতে পর্যটক হয়েছি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তারই উপর নির্ভর করছে। যদি বেরিয়ে

থাকি নগণ্য বা সারবান কোনো ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে, অথবা কুঠার হস্তে অরণ্যকে উদ্যানে পরিণত করার দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে, তাহ'লে অবশ্য খণ্ডীকরণ ও ব্যবচ্ছেদই আমাদের ব্যবহার্য উপায়। কিন্তু যদি চাই এক বিশাল তরঙ্গোচ্ছল পুরাণস্রোতে অবগাহন করতে, আর সেই জলের তলা থেকে মাঝে-মাঝে যে-সব সুন্দর, ভীষণ অদ্ভুত ও মনোমুগ্ধকর ভাবমূর্তি মুহূর্তের জন্য উত্থিত হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, তাদের দূরপ্রসারী তাৎপর্য কিয়দংশেও উপলব্ধি করতে চাই, তাহ'লে, যা-কিছু আমাদের হিশেবে বিসদৃশ বা অসংগত বা বিভ্রান্তি-জনক সেই সবই আমাদের যথাযথ ব'লে মেনে নিতে হবে। মেনে নিতে হবে, হরিবংশ-বর্জিত আঠারো সর্গের যে-গ্রন্থটিব সঙ্গে আমরা বহুকাল ধ'রে পরিচিত আছি, তথাকথিত ব্যাসদেব যার রচয়িতা, আর বাংলা ভাষায় যার প্রথম[১২] সামগ্রিক অনুবাদ সম্পাদনা ক'রে কলকাতার এক আলালের ঘরের দুলাল, এক বিলাসপরায়ণ বিদ্যোৎসাহী অমিতব্যয়ী যুবক প্রাতঃস্মরণীয় হ'য়ে আছেন, সেইটেই প্রামাণিক ও সর্বজনীন মহাভারত। এও মনে রাখা চাই যে মহাভারতে — এবং একমাত্র মহাভারতেই — ভারতভূমিতে উদ্ভূত সবগুলি চিন্তা-ধারার পদচিহ্ন প্রতীয়মান, এবং এটি কোনো গোষ্ঠীগত গুহাবদ্ধ ধর্মপুস্তক নয় — স্ত্রীশূদ্রাদিনির্বিশেষে যে-কোনো 'পুণ্যবান'কে এর স্বাদগ্রহণের অধিকার ব্রাহ্মণেরাই দিয়েছিলেন। এই পঞ্চম বেদটির স্বরূপ ঠিক বুঝতে হ'লে, একে খণ্ডিতভাবে দেখা চলবে না।

৭। বন্ধনীভুক্ত শব্দ তিনটি আমি জুড়ে দিয়েছি; এবং সেটা যে অনাচার নয়, মহাভারতেই তার নির্দেশ আছে। শান্তি ও অনুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভীষ্ম প্রায়ই 'পুরাতন ইতিহাস' বলেছেন, যার অনেকগুলো আবার তিনি শুনেছিলেন কোনো-না-কোনো মুনির মুখে। তাছাড়া আদিপর্বের অনুক্রমণিকা অংশে, গ্রন্থটি আরম্ভ হওয়ামাত্র, স্পষ্টই ব'লে দেয়া হয়েছে যে সমগ্র ভারতসংহিতাই 'শোনা কথা'।

৮। 'সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে; মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর-কিছুর দ্বারা সম্ভবপর নহে।' — 'সাহিত্য', "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" দ্র।

৯। একাধারে পুরাতন, চিরন্তন ও আদিম — প্রাচীন ব্যবহারে 'পুরাণ' শব্দের অর্থ ছিলো এই; সেই অর্থে 'পুরাণপুরুষ' কথাটা আমরা এখনো ব্যবহার ক'রে থাকি। 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো —' উপনিষদে ও গীতায় উক্ত এই পঙক্তির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত আছেন (কঠ : ১ : ২ : ১৮, গী : ২ : ২০); কিন্তু হরিচরণ তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' ঋগ্বেদের যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন আমাদের পক্ষে সেটি আরো ইঙ্গিতময়। 'পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরাণী'— এখানে বিশেষণটির লক্ষ্য হলেন উষাদেবী, কিন্তু পুরাণ-কথা বা মিথলজিও যে বার-বার নতুন ক'রে জন্মায় তা আমাদের কারোরই অবিদিত নেই।

'ইতিহাস' ও 'পুরাণ' নামে চিহ্নিত গ্রন্থসমূহ বিষয়ে মহাভারতের একটি শ্লোক উদ্ধৃতিযোগ্য :

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥
(আদি : ১ : ২৬৯)

— 'ইতিহাস ও পুরাণসমূহের দ্বারা বেদকে বলীয়ান ক'রে নিতে হবে, কেননা বেদ অল্পবিদ্বানকে ভয় পায় পাছে তারা প্রহার করে (কোনো অনিষ্ট ঘটায়)।'

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে ইতিহাস-পুরাণকে বেদেরই পরিপূরকরূপে বা লোকোপযোগী প্রকরণরূপে গণ্য করা হ'তো — এবং সেই অর্থেই 'পঞ্চম বেদ' আখ্যাটি গ্রহণীয়।

১০। আমি কি বড্ড বেশি দাবি করছি? অন্ততপক্ষে পুরাকালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা আমার উচিত ছিলো না কি? কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব য়োরোপীয় সভ্যতায় আমাদের অর্থে ধর্মবোধ ছিলো না; তাই প্রথম যীশুভক্ত কবি পর্যন্ত রেখা টানতে হ'লো।

১১। এই উপাখ্যানের উৎস খ্রী-পূ ৭-৬ শতকের গ্রীক লেখক স্তেসি-কোরস। কথিত আছে, একটি কাব্যে স্বামীত্যাগিনী হেলেনকে নিন্দা করার অপরাধে তিনি অন্ধ হ'য়ে যান। পরে নিজের কথা ফিরিয়ে নিয়ে তিনি বলেন যে হেলেন কখনো ট্রয়নগরে পদার্পণ করেননি, ট্রয়-যুদ্ধের দশ বছর ধ'রে মিশরদেশে স্বামীর অপেক্ষায় ব'সে ছিলেন। এই ক্ষমাপ্রার্থনার ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে।

এই উপাখ্যান অবলম্বনে ইউরিপিদেস তাঁর 'হেলেন' নাটক লিখে-ছিলেন।

১২। প্রথম, কেননা সঞ্জয় বা জনপ্রিয় কাশীরাম দাসের পদ্য-প্রকরণ অনেকাংশে তাঁদের স্বাধীন রচনা — এবং মানসত্তায় সম্পূর্ণ বঙ্গীকৃত ও মধ্য-যুগাবলম্বী। উনিশ শতকে বর্ধমান সংস্করণের কাজ আগে শুরু হ'য়ে শেষ হয়েছিলো কালীপ্রসন্নর পরে। অতএব এ-কথা নিঃসংশয় যে বৈয়াসিক আস্বাদযুক্ত সামগ্রিক অনুবাদ বাংলাভাষায় কালীপ্রসন্নই প্রথম প্রকাশ করেন, এবং বর্তমানে সেটি একমাত্র প্রচলিত সামগ্রিক বঙ্গানুবাদ।

কালীপ্রসন্নে অনুবাদের অনেক গরমিল আছে, এ-বিষয়ে শ্রী নরেশ গুহ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানে তার দু-একটি উদাহরণ দিতে লুব্ধ হচ্ছি। মৃগয়ারত দুষ্মন্ত বহু পশুবধের পরে এক তপোবনে প্রবেশ করেছেন — কিন্তু কণ্বের আশ্রমটি তখনও তাঁর চোখে পড়েনি, আশ্রমকন্যাটিও তাঁর অ-দৃষ্টা, শুধু বনস্থলের নিসর্গশোভায় তিনি আহ্লাদিত (আদি : ৭০)। এই বর্ণনা-প্রসঙ্গে ব্যাসদেব বলেছেন : 'সুখঃ শীতঃ সুগন্ধী চ পুষ্পরেণুবহোঽনিলঃ। পরিক্রামন্ বনে বৃক্ষানুপৈতীব রিরংসয়া॥' (আদি : ৭০ : ১৬)। কালীপ্রসন্নর অনুবাদ : 'পুষ্পরেণুবাহী, সুখস্পর্শ, সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহ সর্বদা বহিতেছে।' 'অনিলঃ উপৈতীব রিরংসয়া বৃক্ষান্ পরিক্রামন্—বাতাস যেন রিরংসাবশত বৃক্ষসমূহের মধ্য দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে' : এখানে মূল কবি আসন্ন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন, খুলে দিয়েছিলেন কালিদাস-কথিত একটি 'ভবিতব্যের দ্বার'; বাংলায় 'রিরংসা' কথাটা নেই ব'লে সেই আয়তনটি হারিয়ে গেলো। কুন্তীর প্রতি ব্যাসদেবের একটি উক্তি : 'সন্তি দেবনিকায়াশ্চ সংকল্পাজ্জনয়ন্তি যে। বাচা দৃষ্ট্যা তথা স্পর্শাৎ সংঘর্ষেণেতি পঞ্চধা॥ — দেবতারা পাঁচ উপায়ে

প্রজনন ক'রে থাকেন : সংকল্প, দৃষ্টি, বাক, স্পর্শ ও সংঘর্ষ' (আশ্রমবাসিক : ৩০ : ২২)—এখানে 'সংঘর্ষ' অর্থ স্পষ্টতই ইন্দ্রিয়মিলন — নীলকণ্ঠও বলেছেন 'সংঘর্ষেণ রত্যা' — কিন্তু কালীপ্রসন্নে আছে 'প্রীতি উৎপাদন'। দেখা যাচ্ছে, পাথুরেঘাটার বীর বালক কালী সিঙ্গিও পাণ্ডুতাসাধক ব্রাহ্ম সংক্রমণ কাটাতে পারেননি।

কিন্তু কোনো বাঙালীর মুখেই কালীপ্রসন্নর নিন্দা সাজে না, এবং আমার পক্ষে তা কৃতঘ্নতা হবে — কেননা আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই পুস্তকে প্রথম প্রবেশ করেছিলাম, আর আজ পর্যন্ত তার মায়াজাল থেকে বেরোতে পারিনি। সত্য, এখানে কোনো-কোনো অংশ সংক্ষেপিত বা আচ্ছাদিত ও কোনো-কোনোটি বিস্ফারিত হয়েছে, তবু এও সত্য যে মহাগ্রন্থটি সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমেত উপস্থিত, ভাষা-ব্যবহারে তৎসম শব্দের অবিরল নিবিড়তার জন্য সংস্কৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়, অথচ কোথাও নেই কৃত্রিমতা বা দুরন্বয়, প্রাতটি বাক্যের ধ্বনিকল্লোল মনোহর এবং অনেক স্থলেই মূলের শব্দে সমৃদ্ধ; — মোটের উপর আমরা বলতে পারি যে একাধারে সুখপাঠ্য ও মূলানুগ সমগ্র অনুবাদ হিশেবে কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে এখনো অদ্বিতীয়।

৪ : মূল কাহিনী

কিন্তু সত্যি কি আমরা আশা করতে পারি যে আজকের দিনের কোনো অপেশাদার পাঠক আস্ত, পুরো, অখণ্ড মহাভারতটি প'ড়ে উঠবেন? মূল সংস্কৃতের কথা না-তোলাই ভালো, কালীপ্রসন্নর বৃহদাকার তিন হাজার পৃষ্ঠার সম্মুখীন হ'লেও তিনি কি ত্রস্ত পায়ে পশ্চাদপসরণ করবেন না? এমন কথাও কি তাঁর মনে হবে না যে এ-রকম একটি ওজনহীন ভোজনের জন্য ভীমের তুল্য জঠরাগ্নি ও অগস্ত্যের মতো পরিপাকশক্তি প্রয়োজন? আর যদি বা কোনো আকস্মিক খেয়ালে তিনি ঋজুপৃষ্ঠভাবে পাঠারম্ভ করেন, তাহ'লেও, অতিভাষণের চাপ সইতে না-পেরে, তিনি যে অচিরেই নিবৃত্ত হবেন না

তারই বা নিশ্চয়তা কী? এই সবই সম্ভবপর, এবং স্বাভাবিক; আমি এমন কোনো যুক্তিরহিত প্রস্তাব করছি না যে মহাভারতকে জানতে হ'লে তার প্রতিটি অক্ষর অবশ্যপাঠ্য। বরং অন্য অনেকের মতো আমারও বিশ্বাস যে সংক্ষেপীকরণের পক্ষে মহাভারত বিশেষ-ভাবে উপযোগী; এবং আমরা সকলেই জানি, বর্তমান যুগে তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সানন্দে ও কৃতজ্ঞ চিত্তে এও আমি ঘোষণা করবো যে রাজশেখর বসুর মনোজ্ঞ সারানুবাদে মূলের প্রতিভা প্রতিফলিত হয়েছে, বহুলাঙ্গতারও পরিলেখ পাওয়া যায়; তাঁরই জন্য এ-যুগের বাঙালি পাঠক বুঝতে পেরেছে ব্যাসের সঙ্গে কাশীরাম দাসের (এবং কৃত্তিবাসের সঙ্গে বাল্মীকির) ব্যবধান শুধু কালগত নয়, চারিত্রিক। কিন্তু কোনো সংক্ষেপীকরণ যতই না তৃপ্তিকর হোক, তা কখনো পর্যাপ্ত হ'তে পারে না; তা থেকে যা-কিছু বর্জিত হয়েছে তা-ই আমাদের পক্ষেও পরিত্যাজ্য নয়, এই কথাটি মনে রাখা চাই। আধুনিক যুগের ব্যস্ততাকে মেনে নিয়েও এ-কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে সমগ্রটির সঙ্গে পরিচিত না-হ'লে—যার যেমন সাধ্য, যার যতটুকু অবকাশ, সেই অনুযায়ী অল্পবিস্তর পরিচিত না-হ'লে — মহাভারতের ঐশ্বর্য বিষয়ে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট থেকে যাবে; আর, সমগ্রটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে যেতে পারলে, আমরা সেই পরিমাণে আরো বেশি লাভবান হবো। লাভবান হবো — কোনো বিশেষজ্ঞের অর্থে নয়, মানবিক অর্থেই, জৈবনিক অর্থেই। 'আমরা' বলতে এখানে শুধু বিদগ্ধসমাজ ভাবছি না — তথাকথিত 'সাধারণ' পাঠক, চাকুরিজীবী, সিনেমাপ্রিয় মহিলা, ধনার্জনকারী ব্যস্ত ব্যবসায়ী, সকলেই এর অন্তর্ভূত। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত যে-সব আবিষ্কার পণ্ডিতেরা মহাভারত থেকে অহরহ ক'রে যাচ্ছেন, তাতে আমাদের আগ্রহ থাকতেও পারে, নাও পারে; কিন্তু যা হৃদয়গ্রাহী ও চিত্ররূপময়,

যার অনুচিন্তনে আমরা আনন্দ পাই, তার জন্য কে না আমরা নিত্য পিপাসিত? আর এই ধরনের কত যে কল্পনা-মণি মহাভারতে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, যে-সব স্থলে আমরা আপতিকভাবে শুধু শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছি, সেখানেই লুকিয়ে আছে হয়তো, শুধু সংক্ষেপিত প্রকরণে আবদ্ধ থাকলে সেগুলির সন্ধান আমরা পাবো না। আর যে-সব অংশ আমাদের 'চিরকালের চিরচেনা' ব'লে আমরা ধ'রে নিয়েছি — যেমন সাবিত্রী-কথা বা দময়ন্তী-উপাখ্যান — তাদের অন্তর্নিহিত সব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিও আমরা শুনতে পাবো না, যতক্ষণ তাদের মৌলিক ও সম্পূর্ণ রূপকরণ আমাদের অজ্ঞাত থাকছে, এবং যতক্ষণ আমরা দেখতে না পাচ্ছি মহাভারতের মধ্যে তাদের সংলগ্নতা ঠিক কোথায়।

উদাহরণস্বরূপ পূর্বোক্ত সৃষ্টিবিবরণটিকে নেয়া যেতে পারে (বন : ১৮৮)। রাজশেখর বসু এটিকে মাত্র কয়েকটি বাক্যে সীমিত ক'রে দিয়েছেন, তা না-ক'রে তাঁর উপায় ছিলো না; কিন্তু এর সানুপুঙ্খ বিস্তার পেরিয়ে এলে, আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি যে আর যা-ই হোক, এটি মার্কণ্ডেয় মুনির 'গায়ে-পড়া' কোনো বক্তৃতা নয়, পৌর্বাপর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর অব্যবহিত আগে আমরা পাই য়িহুদি পুরাণের নোহ-তুল্য বৈবস্বত-মনুকে, যিনি একটি শৃঙ্গধারী পর্বতাকার মৎস্যের সাহায্যে সর্বজীবের বীজসঞ্চয় নিয়ে প্রলয়বন্যায় ভাসমান ছিলেন। এই কাহিনীর সূত্রেই, প্রলয়ের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে, মার্কণ্ডেয় তাঁর সৃষ্টিবর্ণনা শুরু করলেন, এবং সেই বাচস্পত্য বিবরণ শেষ করামাত্র, তারই জের টেনে, অন্য একটি উপাখ্যান বললেন, যা মনু-মৎস্য বৃত্তান্তেরই একটি ভিন্ন প্রকরণ কিন্তু পুনরুক্তি নয়, এক নতুন সৃষ্টি। অনন্তজীবী মার্কণ্ডেয় একবার প্রলয়কালে বালকবেশী বিষ্ণুর উদরে প্রবিষ্ট হ'য়ে সেখানে নিখিলবিশ্ব দেখতে পেয়েছিলেন, শতবর্ষ সঞ্চারণ ক'রেও তার অন্ত পাননি —

দ্বিতীয় কাহিনীর চুম্বক হ'লো এই[১৩]। দু-দিকে দুটি প্রাক্-পুরাণিক কাহিনী, মধ্যবর্তী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ — এই তিনটি অংশকে মিলিয়ে দেখলে আমরা সমগ্রটির মধ্যে একটি ঐক্য ও এমনকি ঈষৎ নাটকীয়তা অনুভব করি, সৃষ্টিবর্ণনাটিকে অবাস্তর বা নীরস ব'লে আর মনে হয় না ; বরং তার সান্নিধ্যের জন্য উপাখ্যান দুটির অভিঘাত আরো প্রবল হ'য়ে ওঠে। এ-রকম স্থলে আমাদের মনে এ-চিন্তাটিও ধরা দিতে পারে যে মহাভারতকে আমরা যত অবিন্যস্ত ব'লে ভাবি আসলে হয়তো তা নয় ; প্রথম দর্শনে আমাদের চোখে যা অসংলগ্ন তাও — সর্বত্র না হোক — অনেক স্থলেই যথোচিতভাবে সংস্থাপিত।

কিন্তু শুধু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে নয়, সমগ্র মহাভারতেও একটি ঐক্য আমরা খুঁজে পাবো, যদি তার বহিরাশ্রয় বিশ্লেষণ করি। বহিরাশ্রয় — মানে গল্পাংশ, যাকে বলে 'প্লট' অথবা মূল কাহিনী। প্রশ্ন উঠতে পারে, সেটি কী, কতটুকু, কোন-কোন অংশ নিয়ে তার সংগঠন, আমরা তার সীমারেখা টানবো কোথায় ? এ-বিষয়ে আমার যা ধারণা তা আশা করি এই আলোচনাক্রমে প্রকাশ পাবে ; এখানে শুধু দু-একটি কথা ব'লে রাখতে চাই। প্রথমত, তা নিছক যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নয় — কোনোমতেই নয় ; কোনো রুধিরাক্ত নিবেলুঙ্গেন-গাথার হিন্দু প্রকরণরূপে মহাভারতকে কল্পনা করা অসম্ভব। যদি কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষই মূল কাহিনী ব'লে নির্দিষ্ট হয়, তাহ'লে তো আদিপর্বের শেষার্ধ, সভাপর্ব, উদ্যোগপর্ব আর গীতা-বর্জিত ভীষ্মপর্ব থেকে সৌপ্তিক পর্যন্ত পাঁচটি পর্বকে সংক্ষেপিত ক'রে নিলেই আমরা 'বিশুদ্ধ' মহাভারতটিকে হাতে পেয়ে যাই, অন্য সবই অনাবশ্যক হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এ-ভাবে সম্পাদিত হ'লে, নির্ভয়ে বলা যায়, এই ভারত-কথাটি ভারতবর্ষীয় জীবনযাত্রার বাইরে প'ড়ে থাকতো, গ্রন্থাগারে সুখনিদ্রায় মগ্ন, যা থেকে তাকে মাঝে-মাঝে

টেনে তুলতেন শুধু শ্যামল অথবা অরুণবর্ণ পণ্ডিতেরা। অথবা যদি ভরতবংশের বিবরণ ব'লে ভাবি তাহ'লে প্রথমেই বন ও মৌষলপর্বকে ছেঁটে ফেলতে হয় — মহাভারতকে বর্বর হাতে মর্মাঘাত ক'রে। আমার কাছে এ-কথা অতি স্পষ্ট যে মহাভারতের মূল কাহিনী তার প্রতিটি পর্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত — অচ্ছেদ্যভাবে, যুক্তিসিদ্ধভাবে — মরুপ্রতিম শান্তি ও অনুশাসনটিও সর্বতোভাবে এর ব্যতিক্রম নয়। এবং এই মূল কাহিনীটিকে আদ্যন্ত অনুধাবন ক'রে আমি দেখতে পাই এক মহান পরিকল্পনা, যা বাধাগ্রস্ত হ'লেও অলঙ্ঘনীয় থেকে যায়; এক বদ্ধমূল অভিপ্রায়, যা মাঝে-মাঝে সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হ'লেও অবিরলভাবে সৃষ্টিশীল। কেমন ক'রে, এই জটিল-বন্ধুর বৃহদরণ্যে, লতাগুল্ম কণ্টকবনের ফাঁকে ফাঁকে, গাত্রলগ্ন তৃণপল্লব পতঙ্গের বোঝা সঙ্গে টেনে নিয়ে — অপ্রতিহত, আত্মবিস্মৃতিহীন — অত্বর গতিতে এগিয়ে যায় এই কাহিনী বা পরিকল্পনা, এক বিরাট বিঘ্নবহুল দূরত্ব পেরিয়ে তার অমোঘ ও অবিস্মরণীয় পরিণামের দিকে, এক মণ্ডলাকার সম্পূর্ণতা নিয়ে সমাপ্ত হয় — মহাভারতের বহু বিস্ময়ের মধ্যে এইটি হ'লো মহত্তম। এখানেই মহাভারতের ঐক্য; এরই জন্য, সংগ্রহধর্মিতা সত্ত্বেও, তা শেষ পর্যন্ত একটি গ্রন্থ হ'তে পেরেছে। কিন্তু ঐক্যসাধনও অবলম্বননির্ভর, আর আমার কাছে এ-কথাও স্পষ্ট যে সেই অবলম্বন বা উপায় হিশেবে ব্যাসদেব একটি চরিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন — একটি চরিত্র, যাঁকে কেন্দ্র ক'রে অন্য সব বিষয় দিগ্বিদিকে বিকীর্ণ হ'তে পারে — অর্থাৎ মহাভারতে আমি একজন নায়কের উপস্থিতি অনুভব করি। এবং সেই নায়ক বা কেন্দ্রিক চরিত্রটি — বহুযুদ্ধজয়ী বহুনারীসেবিত শ্রুতকীর্তি অর্জুন নন, সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লোকোত্তর বাসুদেবও নন — তিনি এক ধীর মৃদু লজ্জাশীল অস্থিরমতি মানুষ: তিনি যুধিষ্ঠির।

এই কথাটার ব্যাখ্যার জন্য পূর্বোল্লিখিত ধর্মবকের কাছে ফিরে যেতে হচ্ছে।

১৩। এই উপাখ্যানের আরো চমকপ্রদ মৎস্যপুরাণ-অনুযায়ী একটি বিবরণ হাইনরিখ ৎসিমার-এর *Myths and Symbols in Indian Art and Civilization* বইটিতে আমি পড়েছি। কিন্তু মহাভারতীয় প্রকরণটির বিশেষ মূল্য এইখানে যে তা গীতার একটি পূর্বলেখ; অর্জুনের অনেক আগেই মার্কণ্ডেয় মুনির ভাগ্যে বিশ্বরূপদর্শন ঘটেছিলো।

৫ : নায়কের সন্ধানে

আমি কোনো নতুন কথা বলছি না; রাজশেখর বসুও তাঁর সারানুবাদের ভূমিকায় মহাভারতের নায়ক ও কেন্দ্রস্থ পুরুষরূপে যুধিষ্ঠিরকেই চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁর নায়কত্ব কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা তলিয়ে দেখা দরকার। যাঁকে সাধারণত এক দুর্বল ও উদ্যমহীন পুরুষ ব'লে ভাবি আমরা, ভীমার্জুনের বাহুবল ও কৃষ্ণের বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল; কৃষ্ণ, বিদুর, বা ভাইয়েদের পরামর্শ ছাড়া কোনো পদক্ষেপে যিনি অপারগ; যিনি প্রায় ধৃতরাষ্ট্রের মতোই অব্যবস্থিত, ধর্মভীরু হ'য়েও কখনো কখনো অবিশ্বাস্যরূপে সদাচারভ্রষ্ট — সেই যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব আমরা কোন যুক্তিতে মেনে নিতে পারি? তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ কত ক্ষীণ তা এতেও বোঝা যায় যে তাঁকে অবলম্বন ক'রে, কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, কোনো কবি কোনো কাব্য বা নাটক রচনা করেননি; আধুনিক বঙ্গভূমিতে অর্জুন পার্থ সব্যসাচীদের ছড়াছড়ি থাকলেও কোনো উচ্চবর্ণ হিন্দুসন্তান এ-পর্যন্ত 'যুধিষ্ঠির' নাম প্রাপ্ত হননি, আর বাংলা ভাষার 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' কথাটাও ব্যঙ্গার্থেই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। আমরা স্পষ্ট দেখছি, এপিক কাব্যের নায়কোচিত

কোনো লক্ষণে তিনি ভূষিত নন, আর কাহিনীর মধ্যে তাঁর অগ্রসরণও অতি মন্থর। 'গাও, দেবী, আকিলেউসের ক্রোধ', বা 'কে আছেন এই জগতে একাধারে বিদ্বান, গুণবান ও বীর্যবান?'— এ-রকম কোনো উদাত্ত বাণীসহযোগে যুধিষ্ঠির প্রবর্তিত হননি; বরং কথারম্ভকালে তাঁর ভূমিকা খেদজনকভাবে নগণ্য। ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডুপুত্রেরা যখন কিশোর, তখন থেকেই ভীম, অর্জুন, দুর্যোধন উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত; তখন থেকেই তারা ব্যায়ামদক্ষ ও বিক্রমশালী, তাঁদের ভবিতব্য তখন থেকেই পরিস্ফুট। কিন্তু ঐ সব স্বাস্থ্যদায়ক ধাবন লম্ফন সন্তরণক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে কোনো অংশ নিতে দেখি না আমরা, বরং তাঁকে মাতার অঞ্চল-লগ্ন অন্তঃপুরচারী জীব ব'লে মনে হয়। শোনা যায়, দ্রোণের কাছে শিক্ষা পেয়ে তিনি রথচালনায় দক্ষ হয়েছিলেন, কিন্তু সারা মহাভারতে তার কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন নেই। আর অস্ত্রশিক্ষা? সে-কথা না-তোলাই ভালো, কেননা দ্রোণের ইশকুলে ফেল-হওয়া ছাত্র যদি কেউ থাকেন, তিনি যুধিষ্ঠির। সেই যখন দ্রোণ-কর্তৃক শরসন্ধানে আহূত হ'য়ে, তিনি কৃত্রিম পাখিটির উপর তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে পারলেন না, পক্ষী বৃক্ষ ও উপস্থিত আচার্য ও ভ্রাতৃবৃন্দ সবাই একসঙ্গে তাঁর চোখে পড়লো, তখন দ্রোণ তাঁকে সাফ কথা শুনিয়ে দিলেন (আদি: ১৩২)— 'তুমি চ'লে যাও; তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।' কৈশোরজীবনে, ভীম ও অর্জুনের কীর্তির তলায় যুধিষ্ঠির প্রায় প্রচ্ছন্ন; আদিপর্বে তিনি প্রথম আমাদের লক্ষণীয় হন যখন বিদুর, দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে, সাংকেতিক ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে ব'লে দিলেন কেমন ক'রে জতুগৃহ থেকে বাঁচতে হবে (অ: ১৪৫)। সেই সাংকেতিক বা ম্লেচ্ছ ভাষা যুধিষ্ঠির যে বুঝতে পেরেছিলেন সেটুকু তাঁর কৃতিত্ব; কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের আগে ও পরে যা-কিছু করণীয় ছিলো, সেই সবই—

তাঁর দুই বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ বাহু দিয়ে — একা ভীমসেন সম্পাদন করলেন। এর পর থেকে আদিপর্বের সমাপ্তি পর্যন্ত ভীম আর অর্জুনই আমাদের দৃষ্টি জুড়ে থাকেন — বিশেষত অর্জুন, যিনি দ্রৌপদীজয়ে ক্ষান্ত না-থেকে আবার সুভদ্রাকে সংগ্রহ ক'রে নিলেন, ক্ষণকালীন সঙ্গিনীরূপে উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকেও উপেক্ষা করলেন না। ভীমকে রমণীমোহন ব'লে কল্পনা করা শক্ত, কিন্তু তাঁরও একটি চলতি পথের প্রেমিকা জুটলো — কোনো রাজকন্যা নয়, এক রাক্ষসী, আর তাই হয়তো ভীমের পক্ষে প্রীতিকর। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে দেখি পঞ্চমাংশে বিভক্ত একটিমাত্র নারী নিয়ে তৃপ্ত[১৪] — অতি সাত্ত্বিক ও রতিরিক্তভাবে, অন্তত তা-ই মনে হয় আমাদের। যেমন তিনি কুরুবংশের নগণ্যতম যোদ্ধা তেমনি প্রণয়ব্যাপারেও দুষ্মন্ত-শান্তনুর অতি অযোগ্য এক বংশধর।

এবং তিনি যে ইতিহাসের ন্যূনতম রাজা, সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। আশ্রমবাসিকপর্বে বলা হয়েছে যুধিষ্ঠির যুদ্ধবিরতির পর ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু তা যে নামে মাত্র, আসলে যে রাজকার্যের ভার বিদুরের উপরেই অর্পিত ছিলো, সে-কথাটাও গোপন রাখা হয়নি। তাছাড়া, আশ্রমবাসিকে রাজত্বচালনার কোনো বৃত্তান্ত নেই; সেই বিদায়লিপ্ত পর্বটি যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানেরই ভূমিকাস্বরূপ। 'রাজা যুধিষ্ঠির'কে আমরা দেখতে পাই একবারমাত্র, সভাপর্বে, কিছুক্ষণের জন্য — কিন্তু কখনোই রাজোচিতভাবে নয়, দীপ্তিশালীভাবে নয়। বরং দেখি, সাক্ষাৎ নারদমুনির উপদেশ সত্ত্বেও (সভা : ৫) তিনি কাটাতে পারলেন না তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভীরুতা, মৃদুতা ও দীর্ঘসূত্রতা, কূটনীতিনির্ভর রাজকর্ম শিখে নিতে পারলেন না। 'মহারাজ, অর্থচিন্তায় নিরত থেকে ধর্মচিন্তা বিস্মৃত হচ্ছেন না তো?' — নারদের এই প্রশ্ন আমাদের কানে প্রায় ঠাট্টার মতো শোনায়, কেননা যুধিষ্ঠির যে ধনের জন্য লালায়িত নন

তা আমরা আদিপর্ব থেকেই অনুভব ক'রে আসছি। তাঁর রাজত্ব বিষয়ে প্রশংসাবাক্য অনেক আছে সভাপর্বে, কিন্তু এমন কথা কোথাও নেই যে প্রজাদের হিতসাধন ছাড়া অন্য কোনো উচ্চাশায় তিনি স্পৃষ্ট হয়েছিলেন। সেটা প্রজাদের পক্ষে সুখের কথা কিন্তু তাঁর সুহৃৎবর্গের কাছে যথেষ্ট নয়; অর্জুনকে মুখ ফুটে বলতে হলো যুদ্ধের দ্বারা রাজত্ববিস্তার না-করলে রাজকৃত্য অসম্পূর্ণ থেকে যায় (সভা : ২৪)। যুধিষ্ঠির যে এই কথাটা মেনে নিলেন, তা — আমরা সহজেই বুঝি — সোৎসাহে নয়, দার্ঢ্যের সঙ্গে প্রতিবাদ করা তাঁর স্বভাব নয় ব'লে। অমাত্য ও ভ্রাতারা মিলে তাঁকে জপালেন তিনি সম্রাট হবার যোগ্য, রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী (সভা : ১২); শুনে তিনি যে-পরিমাণে চিন্তাকুল হ'য়ে পড়লেন তাতেই তাঁর অবিশ্বাস সূচিত হ'লো — ঐ উক্তির উপর, নিজেব সামর্থ্যের উপর অবিশ্বাস[১৫]। রাজাদের পক্ষে যথাযোগ্য মন্ত্রণা নিয়েই কাজ করা ভালো; কিন্তু যুধিষ্ঠির যেন বড়ো বেশি পরামর্শলিপ্সু, নিজের দায়িত্বে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাই তাঁর নেই। পুরোহিত ধৌম্য, বহু ঋত্বিক-ঋষি ও সাক্ষাৎ নারদ মুনির অনুমোদন এবং নারদের মুখে প্রেরিত মৃত পিতা পাণ্ডুর নির্দেশ — এই সব প্ররোচনা সত্ত্বেও তাঁর দ্বিধা কাটলো না; তাঁকে রাজি করাবার জন্য কৃষ্ণকে দ্বারকা থেকে চলে আসতে হ'লো। তারপর রাজসূয় যজ্ঞের পুরো বৃত্তান্তটায়, যুধিষ্ঠির শুধু ভাববাচ্যে উপস্থিত — কোনো ঘটনার তিনি প্রয়োজক নন, শুধু ভুক্তভোগী; অনুষ্ঠাতা নন, উপলক্ষমাত্র। তাঁর চার ভাই দিগ্বিজয়ে বেরোলেন, তিনি রইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে ব'সে; জরাসন্ধবধের সংকল্প শুনে তিনি ভয় পেলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে বাধা দেবার কোনো চেষ্টা করলেন না। এমনি ক'রে অন্যদের বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে, তিনি প্রাপ্ত হলেন তাঁর রাজচক্রবর্তীপদ — যার জন্য তিনি নিজে কখনো আগ্রহ দেখাননি

সেই অভিধা; যেখানে কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণ ও রণদক্ষ চার ভাই মিলে তাঁকে প্রায় ধরাধরি ক'রে বসিয়ে দিলেন, সেই সিংহাসন। আমরা প্রায় কৌতুক অনুভব করি, আর সেই সঙ্গে একটু করুণাও হয়তো, যখন যজ্ঞসভায় শিশুপালপন্থী ক্রুদ্ধ রাজাদের গর্জন শুনে এই সদ্যসম্রাট সন্ত্রস্তভাবে ভীষ্মের শরণার্থী হলেন। আর তখনই বোঝা গেলো ধৌম্য থেকে কৃষ্ণ পর্যন্ত সকলেই ভুল বলেছিলেন — মুকুটধারণের যোগ্য ব্যক্তি ভীম অর্জুন কর্ণ দুর্যোধন যে-কেউ হ'তে পারেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির নন, কখনোই যুধিষ্ঠির নন।

এ-পর্যন্ত, যা-ই হোক, আমাদের চোখে কিছুটা শ্রদ্ধেয় তিনি থেকে যান, অন্তত একটি নিরীহ ভালোমানুষ ব'লে আমরা তাঁকে স্নেহের চোখে দেখতে পারি। হয়তো আমাদের মনে পড়ে যে ভীমেব হাতে হিড়ম্বার ও অর্জুনের হাতে অঙ্গারপর্ণের মৃত্যু তিনি নিবারণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে, যদিও, তাঁর জ্ঞাতসারে কিছু নরহত্যা এবং একটি নারীহত্যাও[১৬] ঘটে গেছে, তবু ভীম অথবা অর্জুনের মতো নির্দয় যে তিনি নন, অন্তত সেটুকু আমরা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু এর পরেই, এক মর্মান্তিক মুহূর্তে, এই নিষ্ক্রিয় নির্বিষ নির্বিরোধী মানুষ, যাকে আমরা এতদিন ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত ব'লে জেনেছি, অত্যন্ত বেশি শঙ্কাপরায়ণ ব'লে, তাঁকেই হঠাৎ এক উন্মত্ত জুয়াড়িতে রূপান্তরিত হ'তে দেখে আমরা স্তম্ভিত হ'য়ে যাই। আর যখন দেখি, সর্বনাশের পরেও যুধিষ্ঠির নীরব, কৌরবদের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে নিরুত্তর, অনুজদের উত্তেজনায় অবিচল, অশ্রুপ্লুত জননীর দুঃখেও নির্বিকার; যখন দেখি অল্প কথায় ভীষ্মাদি গুরুজনের কাছে বিদায় নিয়ে তিনি অবিষণ্ণভাবে বনযাত্রায় নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন ভেবে পাই না তাঁকে কী বলবো, কী ভাববো তাঁর বিষয়ে — নির্বোধ না ধৈর্যশীল, হতচেতন না অনাসক্ত, অপ্রকৃতিস্থ না প্রাণশক্তিহীন। আমাদের মনে প্রশ্ন

জাগে : তিনি কি এই আঘাতে প্রস্তরীভূত হ'য়ে গিয়েছেন, না কি আঘাত তাঁকে স্পর্শ করেনি ?

এই প্রশ্নের উত্তর, যতই আমরা অরণ্যে তাঁর অনুসরণ করি, যত দেখি তাঁকে শান্ত পায়ে ভ্রাম্যমাণ, যত শুনি তাঁর কথা, আর তিনি যা শুনছেন তাও শুনি, ততই আমাদের অনুমেয় হ'যে ওঠে — ধীরে-ধীরে, কিন্তু ক্রমশ আরো বিশ্বাস্যভাবে। য়োরোপীয় সমালোচকেরা যাকে 'tragic flaw' ব'লে থাকেন যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি ঠিক তা নয়, আরিস্টটল-কথিত ত্রাস অথবা করুণার তিনি ঊর্ধ্বে। আমরা লক্ষ করি যে জুয়োখেলার জন্য তাঁর পতন হ'লো না — বা পতন হ'লো শুধু সাংসারিক অর্থে, চারিত্রিক অর্থে নয়, তাঁর নৈতিক সত্তা বিধ্বস্ত হওয়া দূরে থাক, তা যে উন্মীলিত ও বিকশিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হ'তে পারলো তাঁর দ্যূতজনিত বনবাস ও পরবর্তী যুদ্ধঘটনাই তার কারণ[১৭]। এমন বললেও অত্যুক্তি হয় না যে তাঁর মনের কোনো-এক অংশে, কোনো গোপন অবচেতন গভীরে তিনি এ-ই চেয়েছিলেন — এই মুক্তি ময়নির্মিত ইন্দ্রপুরী থেকে, শৃঙ্খলতুল্য আয়োজন ও আড়ম্বর থেকে, শ্বাসরোধকারী ধনবাহুল্য থেকে, আর সর্বোপরি—যার জন্য জরাসন্ধ- ও শিশুপালবধ সাধিত হ'তে হ'লো, সেই রাজনীতির ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি। চেয়েছিলেন অনিবার্য মহাযুদ্ধের আগে[১৮] কিছুক্ষণ সময় — বাঁচার জন্য, মানুষিকভাবে বাঁচার জন্য। কিন্তু কেমন ক'রে তা পেতে পারেন তিনি — এত লোক তাঁকে ঘিরে আছে, এত চোখ তাঁর চারিদিকে সারাক্ষণ! আর সেইজন্যেই কি জুয়োর দিকে এই অদম্য টান, তাঁর এই আকস্মিক অভাবনীয় আত্মবিলোপ ? এমনও কি হ'তে পারে না যে আমাদের পক্ষে যে-ঘটনা পীড়াদায়ক, তাঁর পক্ষে সেটা নিষ্কৃতি-লাভের একটি উপায় বা অছিলামাত্র — তাঁর পক্ষে প্রাপণীয় একমাত্র উপায় ? কিন্তু ধরাধামে বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না :

এই মুক্তির বিনিময়ে তাঁকেও মেনে নিতে হ'লো — এক দুঃখ, বনবাসকালে নিত্যসঙ্গী তাঁর — নিজের কারণে নয়, তাঁর অনুগামী আত্মীয়দের কারণে। কিন্তু তাঁর জীবনে এই দুঃখেরও যে প্রয়োজন ছিলো, আমরা তা বনপর্বে দেখতে পাবো। যুধিষ্ঠিরের সত্যিকার পরিচয় বনপর্ব থেকেই আরম্ভ।

১৪। পুরুবংশবর্ণন-প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের আর-একটি স্ত্রী ও তার গর্ভজাত এক পুত্রের উল্লেখ আছে (আদি : ৯৫, আর্যশাস্ত্র সং), কিন্তু উল্লেখমাত্র — সেই পত্নী বা পুত্রকে কখনো চোখে দেখা যায় না।

১৫। শ্রুত্বা সুহৃদ্‌বচস্তচ্চ জানংশ্চাপ্যাত্মনঃ ক্ষমম্।
পুনঃ পুনর্মনো দধ্রে রাজসূয়ায় ভারত ॥ (সভা : ১৩ : ২৮)

—'সুহৃৎগণের সেই কথা শুনে, নিজের সামর্থ্য বুঝে, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের বিষয়ে বার-বার চিন্তা করতে লাগলেন।'

পরবর্তী অংশ থেকে বোঝা যায়, এখানে 'সামর্থ্য' মানে সামর্থ্যের অভাব।

১৬। জতুগৃহ থেকে পালাবার সময় পাণ্ডবেরা এক নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রকে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। যুধিষ্ঠির এটা জানতেন এমন কথা পুঁথিতে লেখা নেই, কিন্তু আমাদের তা ই ধ'রে নিতে হবে। এমন অনাবশ্যকভাবে নিরপরাধহত্যার দ্বিতীয় উদাহরণ মহাভারতে নেই।

১৭। এ-প্রসঙ্গে অয়দিপৌস স্মর্তব্য ; যে-'হুব্রিস' বা অহংকার বা অনম্যতা তাঁর পার্থিব পতনের কারণ, সেটাই তাঁকে আত্মিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলো — যখন তিনি বার্ধক্যপীড়িত অন্ধ এক ভিখারীর মতো কন্যার হাত ধ'রে কলোনস-এ এসে রহস্যময়ভাবে ইহলোক থেকে অন্তর্হিত হলেন।

জুয়োর জন্য নৈতিক পতনের উদাহরণও মহাভারতে চিত্রিত হয়েছে ; একদিকে নল-কর্তৃক দময়ন্তী-ত্যাগ, অন্যদিকে দ্রৌপদী ও চার ভ্রাতার জন্য যুধিষ্ঠিরের অনবচ্ছিন্ন বেদনাবোধ — এ-দুয়ের মধ্যে স্পষ্ট একটি বৈপরীত্য লক্ষণীয়।

১৮। রাজসূয় যজ্ঞের পরে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন না-জানিয়ে এক বিষাদ-বার্তা শোনালেন (সভা : ৪৫) :

—'শোনো যুধিষ্ঠির, তোমাকে উপলক্ষ ক'রে ক্ষত্রিয় রাজারা কালক্রমে বিনষ্ট হবেন। রাত্রিশেষে এক স্বপ্ন দেখবে তুমি: শূলপিনাকধারী শঙ্কর পিতৃরাজাশ্রিত (যম-কর্তৃক অধিকৃত) দক্ষিণ দিক নিরীক্ষণ করছেন। বৎস, তুমি চিন্তিত হোয়ো না, তোমার মঙ্গল হোক'

ব্যাসোক্ত স্বপ্ন যুধিষ্ঠির সত্যি দেখেছিলেন কিনা বলা নেই।

৬ : এক বিশ্ববিদ্যালয়

সম্মিলিত ইলিয়াড ও অদিসির চাইতে মহাভারত আটগুণ বেশি দীর্ঘাকার, আর তার মধ্যে বনপর্বটি একাই একটি ইলিয়াডের সমান। দৈর্ঘ্যে একে অতিক্রম করে শুধু উপদেশধর্মী কথিকাকীর্ণ শান্তিপর্ব; কিন্তু ঘটনাবহুল বিরাটের সঙ্গে উদ্যোগ, আর উদ্যোগের সঙ্গে ভীষ্মপর্বকে জুড়ে দিলে যা যোগফল দাঁড়ায়, বনপর্বের ঠিক ততটাই ব্যাপ্তি। আরো লক্ষণীয়: ঠিক সেখানে ও সেই মুহূর্তে ঘটছে এমন ঘটনা বনপর্বে বিরল; এর আয়তনের বড়ো অংশটা জুড়ে আছে অতীতকাহিনী—উপাখ্যান। কেন, যখন সবেমাত্র প্লট জ'মে উঠছে তখনই এত পুরাতন কথার অবতারণা, কৌতূহলজনক আসন্নকে ঠেকিয়ে রেখে অতীতের দিকে ফিরে-ফিরে তাকানো? মানছি, এই সুযোগে কয়েকটা মনোমুগ্ধকর কাহিনীকে স্থায়িত্ব দেয়া হ'লো, কিন্তু মূল কাহিনীর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কি?

অনিবার্যভাবে মনে পড়ে অন্য এক পৌরাণিক পুরুষ, লোক-মানসে কৃষ্ণের পরেই যার স্থান—তিনিও ভ্রাতা-পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে চোদ্দ বছর বনবাসে কাটিয়েছিলেন। এই দুই বনবাসের মধ্যে চাক্ষুষ কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এদের অন্তঃপ্রকৃতি যে কত ভিন্ন তা রামের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের তুলনা করলেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। দুয়েরই মূল কথা হ'লো সত্যরক্ষা কিন্তু এ-দুই সত্যের ধরন একেবারে আলাদা।

যে-কারণে বনবাস, সেটা রামের অজান্তে ঘটেছিলো, আর যুধিষ্ঠির সেটা নিজেই ঘটিয়ে তুলেছিলেন। রাম যেখানে রাজ্যত্যাগী, যুধিষ্ঠির সেখানে রাজ্যহারা; রাম যেখানে বনগামী, যুধিষ্ঠির সেখানে নির্বাসিত। দশরথ নিজে, এবং অযোধ্যায় অন্য অনেকেই রামকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বনযাত্রার বিষয়ে অনেক খেদোক্তি উচ্চারিত হ'য়ে থাকলেও কেউ কোনো প্রতিবাদ করেননি — করার কোনো উপায় ছিলো না। যুধিষ্ঠিরকে বনে যেতে হ'লো — কোনো ঈর্ষাতুর বিমাতার চক্রান্তে নয়, কোনো স্ত্রৈণ পিতার স্খলিত বাক্যে আবদ্ধ হ'য়ে নয় — স্বদোষে, এক স্বকৃত কর্মের ফলাফলস্বরূপ। দুর্যোধনের অসূয়া, শকুনির শাঠ্য — কিছুই তাঁকে মার্জনীয় ক'রে তোলে না, কেননা তিনি ইচ্ছে করলেই দ্যূতসভায় না-গিয়ে পারতেন, আর ঐ দুষ্ট ক্রীড়া — একবার নয়, দু-বার অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এতদিনে যে-একটি কর্ম তিনি নিজের দায়িত্বে সাধন করলেন, তারই জন্য তাঁর ভাইয়েরা আজ ভিক্ষাজীবী, দ্রৌপদীর মনে সুখ নেই। তিনি ভুলতে পারেন না তিনি অপরাধী, তাঁর প্রিয়জনেরাও মাঝে-মাঝে তাঁকে মনে করিয়ে দেন[১৯]। বনবাস-কালে রামের সব দুঃখ এসেছিলো বাইরে থেকে, তাঁর চিত্তে অপ্রসাদ ছিলো না; আর যুধিষ্ঠিরকে দেখি বহিরাগত বিপদে ততটা বিব্রত নন, যতটা তাঁর নিজেরই মনে পরিতপ্ত। তাছাড়া, অরণ্যকাণ্ড প্রথম থেকেই সীতাহরণকে লক্ষ্য ক'রে চলেছে; দ্বিতীয় সর্গেই বিরাধরাক্ষসের ব্যাপারটায় তার ছায়াপাত হ'লো; আর তার পর থেকে শূর্পণখার আগমন পর্যন্ত আমরা দ্রুত সেই চরম ঘটনার নিকটতর হচ্ছি। কিন্তু বনপর্বে কোনো ঘটনামূলক অভিপ্রায় নেই[২০]; যদি বা থাকে সেটা প্রকট নয়, অভ্যন্তরীণ, যান্ত্রিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক। এবং সেটা যুধিষ্ঠিরেরই জীবনীসংক্রান্ত, অন্য কারো নয়।

ভেবে দেখা যাক, অরণ্যকাণ্ডে রামের ক্রিয়াকর্ম কী, আর

বনপর্বে যুধিষ্ঠিরই বা কী নিয়ে ব্যাপৃত। রামকে দেখছি অর্জুন-ভীমের যুগ্ম ভূমিকায় অবতীর্ণ, কিন্তু যুধিষ্ঠিরোচিত কোনো আচরণ তাঁর নেই। লক্ষ্মণের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে বহু রাক্ষস তিনি বধ করলেন, সংগ্রহ করলেন অগস্ত্য মুনির কাছে দিব্যাস্ত্র; কিন্তু দশ বছর ধ'রে বনে-বনে ঘুরে[২১], অনেক মুনিঋষির সাক্ষাৎ পেয়েও, তিনি তাঁদের কাছে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলেন না, কিছু জানতে চাইলেন না — বসবাসের পক্ষে যোগ্য বন কোনটি হবে, এই তথ্যটি ছাড়া। চতুর্দশ সর্গে জটায়ু তাঁকে সংক্ষেপে একটি সৃষ্টিকাহিনী শোনালো; রাম তা থেকে ছেঁকে নিলেন তাঁর পিতার সঙ্গে জটায়ুর সৌহার্দ্যের অংশটুকু — সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। আর তারপর জটায়ুর কাছে সীতাকে রেখে, চ'লে গেলেন ঘর বাঁধার জন্য লক্ষ্মণসমেত পঞ্চবটী বনে। কোনো পাঠকের যদি মনে পড়ে পূর্বোক্ত অন্য একটি সৃষ্টিবর্ণনা (বন: ১৮৮), মনে পড়ে যুধিষ্ঠির সেখানে পরস্পর কেমন প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছেন — কোনো কার্যকর উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, শুধু কৌতূহলবশত — তাহ'লেই তিনি বুঝবেন এই দুই নায়ক কতদূর পর্যন্ত অসবর্ণ।

দু-জনেই ক্ষত্রকুলজাত, দু-জনেই বহুদুঃখভোগী, কিন্তু ভেবে দেখলে মনে হয় যুধিষ্ঠির যা-কিছু নন বা হ'তে পারেননি, রাম সহজাত ও সমন্বিতভাবে তা-ই। কর্মিষ্ঠ তিনি, বীর যোদ্ধা, দ্বিধাহীন ও ভয়চিহ্নহীন। তিনি রাজনীতি বোঝেন, সংকটকালে সিদ্ধান্ত নেন বিদ্যুৎবেগে;— উপায়নিপুণ, সংগঠনে দক্ষ, আত্মবিশ্বাসে অটল — সর্বতোভাবে লোকনায়ক হবার যোগ্য তিনি। একদিকে তাঁর এই সব উজ্জ্বলতা, আবার অন্যদিকে তিনি প্রেমিক — অতি মহনীয় ও শ্লাঘনীয় এক প্রেমিক। সীতাহরণের পর থেকে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের শেষ পর্যন্ত, তাঁর প্রেমিক-সত্তা মুখর হ'য়ে উঠছে বার-বার — সেই বিরহদুর্ভর সান্ত্বনাহীন বেদনায়, যার প্রতিধ্বনি মেঘদূত ও রঘুবংশ-

কাব্যে কতই না শুনতে পেয়েছি আমরা। কিন্তু এই শোকবেগ তাঁকে বিকল ক'রে দিচ্ছে না, সময়োচিত সব কাজ তিনি নির্ভুল-ভাবে ক'রে যাচ্ছেন। সামনে কোনো রাক্ষস দেখলে তখনই তিনি ধনুর্বাণে দারুণ; অপহৃতার উদ্ধারের জন্য তাঁর চেষ্টার বিরাম নেই;— তাঁর সঙ্গে চলতি পথে যাদের দেখা হচ্ছে (যেমন শাপমুক্ত কবন্ধ বা মুমূর্ষু জটায়ু) তাদের বার্তাও সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখী। তাঁর কুণ্ঠা হ'লো না কপট যুদ্ধে বালীকে বধ করতে, যেহেতু সুগ্রীবের মৈত্রী তাঁর পক্ষে এখন অপরিহার্য। আবার দেখি, 'চিত্রকাননা শুভদর্শনা' পম্পার তীরে তিনি ইন্দ্রিয়পুলকে কম্পমান ('হর্ষাদিন্দ্রিয়াণি চকম্পিরে', কিষ্কিন্ধ্যা : ১ : ২); আর যখন কিষ্কিন্ধ্যায় বর্ষা নামলো, আর বর্ষার পরে প্রস্ফুটিত হ'লো শারদশ্রী (কিষ্কিন্ধ্যা : ২৮, ৩০), তখন তাঁর মুখে ঋতুবর্ণনা শুনে তাঁকে প্রায় মনে হয় রোমান্টিক অর্থে প্রকৃতিমুগ্ধ। কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের শেষাংশেই যুদ্ধযাত্রা, আর তখন থেকে রাম আবার কর্মপরায়ণ। এই দুটি ধারা, সান্তরভাবে আর কখনো বা মিশ্রিতভাবে, বনবাসী রামের জীবনে প্রবহমান একটি বীরোচিত, অন্যটি প্রেমিকোচিত —দুটোই গৌরবজনক।

আর যুধিষ্ঠির — তিনি? রাজ্য হারিয়ে তেমনি কি তিনি ব্যাকুল, যেমন কান্তাবিরহে রামচন্দ্র? না, তা তিনি নন, তাঁর কাছে সে-রকম কোনো প্রত্যাশাও নেই আমাদের। কিন্তু, যা যুদ্ধ নয়, রাজনীতি নয়, নির্মল এক আনন্দের উৎস, সে-রকম একটি বিষয়েও তাঁর অনীহা দেখে আমরা ঈষৎ অবাক না-হ'য়ে পারি না। তিনিও তো, রামেরই মতো, ভ্রমণ করেছেন বন থেকে বনান্তরে, ষড়ঋতুর আবর্তন দেখেছেন বারো বার, অনেক দেখেছেন নদী পর্বত স্বচ্ছ সরোবর, আর তরুশ্রেণী, আর ফুল পল্লব পশুপক্ষী :— কিন্তু একবারও তিনি নিসর্গপ্রীতির কোনো পরিচয় দেন না, কোনো দৃশ্যের সামনে থমকে দাঁড়ান না কখনো, লক্ষ করেন না পৃথিবীতে

এখন বর্ষা চলছে না বসন্ত : — মনে হয় তাঁর জগৎ যেন ঋতুরহিত, রূপগন্ধহীন[২২]। তাহ'লে, কী করছেন তিনি বনপর্বে, ঐ দীর্ঘ বারো বছর তিনি কেমন ক'রে কাটালেন ?

সত্যি বলতে, আর-কিছুই করছেন না, শুধু শুনছেন। কখনো কিছু বলছেন না তা নয়, কিন্তু শোনার অংশটা বহুগুণ বেশি। শোনা : এই তাঁর কাজ, তাঁর বৃত্তি : তিনি যে শুনছেন এটাই বনপর্বের 'ঘটনা'। তাঁকে শুনতে হচ্ছে রোষতপ্ত বিলাপ — তেজস্বিনী পাঞ্চালীর মুখে — আর রণোৎসাহী ভীমের মুখে অনেক ভর্ৎসনা ও কুতর্ক ; কিন্তু যা তিনি স্বপ্রণোদনায় শুনছেন — সাগ্রহে, সতৃষ্ণভাবে, অবিরল — তা হ'লো মুনিদের মুখে পুরাণ-কথা — ভরতবংশের ধূসর ইতিহাস নয়, নয় পূর্বপুরুষের গতানুগতিক গুণকীর্তন, কিন্তু সেই সব অজর ও অমেয় কাহিনী, যার দ্বারপথ দিয়ে আমরা যেন বিশ্বজীবনের অন্তঃপুরে চ'লে যাই, দেখতে পাই অনির্ণেয় এক জ্যোতি — আমাদের সুপ্রিয় ও সুপরিচিত সব নীলিমা ও শ্যামলিমা থেকে বহুদূরবর্তী এক বিন্দুর মতো। পুঁথিতে লেখা আছে কাহিনীগুলি যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছিলো, কিন্তু আমরা জানি যে সান্ত্বনা ছাপিয়ে, তাঁর দ্যূতজনিত বেদনাকে অতিক্রম ক'রে, তাঁর মনে সঞ্চারিত হচ্ছে অন্য এক অনুভূতি, প্রায় আনন্দের মতো — কিন্তু রামচন্দ্রের ইন্দ্রিয়পুলক তা নয়, যুধিষ্ঠির প্রীত হচ্ছেন বলা যায় না — শুধু ধীরে-ধীরে, একটি গোপন ও অব্যক্ত আনন্দের সঙ্গে, নিজেরই মধ্যে জেগে উঠছেন, যেন হ'য়ে উঠছেন — এবং শুধুই তিনি। পুঁথি অনুসারে, মুনিদের সামনে তাঁর সঙ্গীরাও উপস্থিত ছিলেন — ছিলেন তাঁর চার অথবা তিন ভাই[২৩], কখনো-কখনো দ্রৌপদীও হয়তো ; কিন্তু আমরা দেখছি যে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে, লোমশ ও বৃহদশ্ব ও মার্কণ্ডেয়র কাছে, জিজ্ঞাসু শুধু যুধিষ্ঠির এবং শ্রোতাও শুধু তিনি, মুনিদের মুখে সম্বোধন শুধু তাঁরই উদ্দেশে। এটা যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অগ্রাধিকারবশত ঘটেনি, অন্যেরা

যে শুনেও শুনছেন না, অথবা সেখানে উপস্থিত থেকেও সেখানে নেই, তা অন্যদের ব্যবহার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। আর যখন, বনবাসের অন্তিম দিনে, সেই রহস্যময় বকপক্ষীর সামনে যুধিষ্ঠিরকে আমরা দেখতে পাই, তখনই উপলব্ধি করি যে এই অরণ্য — যেখানে দ্রৌপদী মনোদুঃখী, আর ভীম-অর্জুন অবিশ্রান্ত সংগ্রামশীল — তা ছিলো যুধিষ্ঠিরের কাছে এক বিদ্যালয়, এক মহান বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে বারো বছর ধ'রে শিক্ষা পেয়েছেন তিনি — অস্ত্র-বিদ্যায় নয়, পুঁথিগত শাস্ত্রেও নয় — আত্মবিকাশে, আত্মসন্ধানে, বিশ্বচেতনায়। সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাবার আগে, সংসারজীবনে প্রত্যাবর্তনের পূর্বমুহূর্তে, এক ছদ্মবেশী দেবতার কাছে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হ'লো। এ-ই তাঁর শেষ পরীক্ষা নয়, প্রথমও নয়, কিন্তু কেন্দ্রিক ব'লে এটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

১১। বনপর্বে দ্যূতের উল্লেখ চারবার আছে : একবার দ্রৌপদী মনের কষ্ট চাপতে না-পেরে যুধিষ্ঠিরকে বললেন (অ : ৩০), 'মহারাজ, আপনার মতো ঋজু, মৃদু, লজ্জাশীল, বদান্য ও সত্যবাদী পুরুষ আর নেই ; তবু দ্যূতব্যসনের দুর্মতি আপনার হ'লো কী ক'রে ?' যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে কোনো উত্তর দিলেন না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভীমের বাক্যশলাকায় বিদ্ধ হ'য়ে বললেন (অ : ৩৪) : 'আমি দুর্যোধনের রাজ্যহরণের আশায় পাশা খেলেছিলাম, কিন্তু শকুনি আমাকে কপট দ্যূতে জয় ক'রে নিলো।...দ্বিতীয় বার, ধূর্ত শকুনির প্রতি ক্রোধবশত আমি নিজেকে নিরস্ত করতে পারলাম না।' এটা, তাঁর নিজের মুখের কথা হ'লেও, আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য, হয়তো ভীমের তা-ই মনে হয়েছিলো। যুধিষ্ঠির কেমন আকস্মিকভাবে ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠেন তা আমরা পরে কয়েকবার দেখবো, কিন্তু দ্যূতসভায় তার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায়নি। আর রাজ্যহরণের আশা? তৃতীয় রিপু? যুধিষ্ঠিরের সমগ্র জীবনচরিত তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলেও এমন একটি মুহূর্ত পাওয়া যায় না, যখন তাঁকে রাজ্যলোভী (বা কোনো অর্থেই লোভী) ব'লে সন্দেহ

করা যায়। এখানে, স্পষ্টত, যুধিষ্ঠির তাঁর অপরাধবোধের তাড়নায় যে-কোনো একটা মন-গড়া সাফাই দিচ্ছেন।

অর্জুনের অস্ত্রাহরণ-যাত্রার পর আরো একবার জুয়োর কথা উঠলো (অ : ৫২)। এবার অগ্রজের প্রতি ভীমের বাক্য ঋজু ও তীক্ষ্ণতর : 'আমরা পরাক্রান্ত হ'য়েও দুর্দশায় পড়েছি — তা আপনারই দোষে।…আপনার দ্যূতক্রীড়ার জন্যই আমরা আজ বিনষ্টপ্রায়।' যুধিষ্ঠির আগেকার মতো কোনো খঞ্জ জবাবদিহি দিলেন না, সদ্য-আগত মহর্ষি বৃহদশ্বকে তাঁর বেদনা জানালেন। 'আমার অক্ষবিদ্যায় দক্ষতা নেই, অক্ষচতুর ধূর্তেরা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। সেই দ্যূতবিষয়ক কঠোর কথা শুনে আমি বিষাদগ্রস্ত; তৎকালে (দ্যূতক্রীড়ার সময়) বন্ধুরা আমাকে যা-কিছু বলেছিলেন তার স্মৃতি আমাকে দিনে-রাত্রে ব্যথিত করে। ভগবন, আমার মতো ভাগ্যহীন রাজা আপনি কি পৃথিবীতে আর দেখেছেন, বা শুনেছেন কখনো?' — এর উত্তরেই নল-দময়ন্তীর গল্প বলা হ'লো।

অনেক পরে, বনবাসের সমাপ্তির কিছু আগে, যুধিষ্ঠির আরো একবার তাঁর দ্যূতক্রীড়ার উল্লেখ করেন (অ : ২৯২)।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির একটি সনাতন ব্যসন হ'লো দ্যূতক্রীড়া। অথর্ববেদের একাধিক সূক্তে তার নিদর্শন আছে (৪ : ৩৮, ৭ : ৫২, ১১৪); আর ঋগ্বেদের বিখ্যাত 'জুয়াড়িবিলাপ' কবিতাটিকে সভাপর্বের একটি পূর্বাভাস বললে ভুল হয় না। রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে সেই কবিতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

'আমার এই রূপবতী পত্নী কখনো আমার প্রতি অপ্রসন্ন হননি, কখনো আমার কাছে লজ্জিত হননি। তিনি শুশ্রূষা করেছেন আমার, এবং আমার বন্ধুবর্গেরও। কিন্তু শুধুমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সেই পরম অনুরাগিণী পত্নীকে পরিত্যাগ করলাম।… অতি কঠিন এই পাশার আকর্ষণ; তার লোভদৃষ্টি কারো ধনের উপর পতিত হ'লে পত্নীকে অন্য লোক স্পর্শ করে।…স্বীয় পত্নীর দুর্দশা দেখে দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয় … হে দ্যূতকার, কখনো পাশা খেলো না, বরং কৃষিকার্য করো…' (ঋক্ : ১০ : ৩৪)।

ঋগ্বেদের সময়ে মুদ্রা ছিলো না, মহাভারতের সময়েও তার প্রচলন হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই — তখনও ধন বলতে বোঝাতো ভূমি, গাভী, স্বর্ণ ও বিবিধ সামগ্রী, এবং দাসদাসী ও পত্নীসমেত আত্মীয়-স্বজন। সে-অবস্থায়, জুয়োর নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে ভার্যাকে সুদ্ধ পণ রাখা অসম্ভব নয়, যদিও আমাদের আধুনিক ধারণায় তা অগম্য, আর সেকালেও কদাচার ব'লে গণ্য ছিলো।

২০। বলা বাহুল্য, রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণের সঙ্গে জয়দ্রথ-কর্তৃক দ্রৌপদীহরণের কোনো তুলনা চলে না; দ্বিতীয় ঘটনাটি ভ্রূণাকার ও কলাকলহীন — দ্রোণপর্বে জয়দ্রথবধের সময় পাণ্ডবদের কারোরই সেটা মনে পড়েনি। বরং তুলনা চলে সীতাহরণের সঙ্গে দ্যূতসভায় কৌরব-কর্তৃক দ্রৌপদীনিগ্রহের; কিন্তু মহাভারতে যুদ্ধের কারণ নারী নয়, ভূমি।

২১। অরণ্যকাণ্ডের একাদশ সর্গে দশ বৎসরের উল্লেখ আছে (শ্লোক ১২); এর অল্পকাল পরেই শূর্পণখার অনুপ্রবেশ ঘটবে।

২২। বলা যেতে পারে, তফাৎটা আসলে বাল্মীকি ও ব্যাসের মধ্যে, কিন্তু এ-মুহূর্তে আমার আলোচ্য তাঁরা নন, তাঁদের দুই মানসপুত্র।

২৩। বনবাসের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত অর্জুন অনুপস্থিত ছিলেন; তিনি ততদিন সুরলোকে অস্ত্রসংগ্রহে ব্যস্ত।

যুধিষ্ঠির যে বনপর্বের একমাত্র শ্রোতা তা দুটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। অজগর-যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তরের সময় ভীমসেন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, (তাঁর মুক্তিলাভের পরেও কিছুক্ষণ সংলাপ চলেছিলো ব'লে মনে হয়), কিন্তু তাঁর মুখে একটিও মন্তব্য শোনা গেলো না, তিনি যে কথাগুলো শুনলেন তারও কোনো নিদর্শন নেই। তেমনি, হ্রদপ্রান্তিক পরীক্ষার পরে ধর্ম যখন আত্মপ্রকাশ করলেন তখন ভীমাদি চার ভ্রাতা পুনর্জীবিত ও সম্পূর্ণ সুস্থ — কিন্তু আমরা তাঁদের উপস্থিতির কোনো পরিচয় পেলাম না, মুহূর্তের জন্যও মনে হ'লো না তাঁরা কেউ ঘটনাটির তাৎপর্য অনুভব করেছেন।

৭ : পূর্বাভাস ও প্রতিরূপ

যুধিষ্ঠির কোনো প্রেরণাপ্রাপ্ত নচিকেতা নন, এক ঝাপটে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হবার মতো শক্তি তাঁর নেই, তাঁর অগ্রসরণ সর্বদাই ধীর, তাঁকে চলতে হয় ঘুরে-ফিরে, এঁকে-বেঁকে, মাঝে-মাঝে কোনো পথপ্রদর্শকের সাহায্য নিয়ে। নচিকেতা যেন তাঁর সংকল্পের বেগেই দেবসন্নিধানে উপস্থিত হলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের হ্রদপ্রান্তিক পরীক্ষায় সে-রকম কোনো আকস্মিকতা নেই — এর অন্তত তিনটি পূর্বলেখ বনপর্বে গ্রথিত হ'য়ে আছে। তিনটিরই মূল কথা হ'লো কোনো মৃত অথবা মৃতকল্পের উদ্ধারসাধন, আর তিনটিতেই সেই দুরূহ কর্ম যে-উপায়ে সম্পন্ন হ'লো তা বিদ্যাবত্তা, বাণীসিদ্ধি — কোনো হেরাক্লেস-তুল্য বাহুবল বা অর্জুনতুল্য শরসিদ্ধি নয়। পাঠকের হয়তো মনে পড়বে সেই মুনিকুমারকে — যুধিষ্ঠির-শ্রুত অন্যতম কাহিনীর নায়ক — যিনি গর্ভবাসকালেই পিতার অধ্যয়নে ভুল ধ'রে, পিতৃদত্ত শাপে 'আট-ব্যাঁকা' হ'য়ে জন্মেছিলেন — অথচ সেই অভিশাপ-দাতা পিতাকেই ত্রাণ করেছিলেন সিন্ধুতল থেকে, শুধু সারস্বত বিদ্যা প্রয়োগ ক'রে, দৈহিক বিকৃতি সত্ত্বেও সম্পূর্ণ সপ্রতিভ, তাঁর বয়স যখন মাত্র দশ (বন : ১৩২-৩৪)। এই অসামান্য বালকটির সঙ্গে প্রথমে দ্বারপালের, তারপর জনকরাজার, আর সর্বশেষে সভাপণ্ডিত বন্দীর যে-বাদানুবাদ হ'লো, সেটিকে বক-যুধিষ্ঠির-সংবাদের একটি প্রাথমিক খশড়া ব'লে ধ'রে নেয়া যায়[২৪]। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে সাদৃশ্য আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো : এখানে যুধিষ্ঠির নিজেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত, এবং এখানেও এক ভ্রাতার প্রাণরক্ষার চেষ্টায় তাঁকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লো (বন : ১৮০-৮১)। অবশ্য বকরূপী ধর্মের তুলনায় সর্পরূপী নহুষকেব ঢ়ো মৃদু পরীক্ষক ব'লে মনে হয়, মাত্র তিনটি প্রশ্নের সদুত্তর পেয়েই তিনি ভীমকে নিস্তার দিতে রাজি হলেন। লক্ষণীয়, ভ্রাতার নিরাপত্তালাভে যুধিষ্ঠির সে-মুহূর্তে কোনো হর্ষপ্রকাশ করলেন না;

হ'য়ে উঠলেন আবার এক শিক্ষার্থী, সেই বেদবেত্তা অজগর-আচার্যের ভাণ্ডার থেকে কুড়িয়ে নিলেন কিঞ্চিৎ জ্ঞান, একটি-দুটি পথনির্দেশক ইঙ্গিত (বন : ১৮১)। তারপর আরো দূরত্ব, আরো অনেক উপাখ্যান পেরিয়ে এসে, বনবাসের অন্তিম সময়ে তিনি শুনলেন সেই আশ্চর্য সাবিত্রী-কথা, যেখানে এক সার্থকভাষিণী তরুণীর কাছে স্বয়ং যম নতিস্বীকার করলেন (বন : ২৯২-৯৬)। এরই স্বল্পকাল পরে ধর্মের কাছে যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা[২৫]।

না-বললেও চলে, প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতিটি অতি প্রাচীন : কেন, প্রশ্ন ও শ্বেতাশ্বতর এই তিনটি উপনিষৎ প্রধানত প্রশ্নোত্তরনির্ভর। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মহাভারতের উপজীব্য নয়, এখানকার অনেক প্রশ্নোত্তরে কোনো অর্থগৌরব খুঁজে পাই না আমরা, কিন্তু অষ্টাবক্রের বিতর্ক, অজগর-যুধিষ্ঠির-সংলাপ, আর সাবিত্রীর সুনির্বাচিত বাক্যযোজনা — এই তিনটির মধ্যে একটি ঊর্ধ্বারোহণরেখা সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমটিকে মনে হয় যেন মুখস্থ-বিদ্যার পরীক্ষা-মাত্র — এবং কিছুটা উপস্থিতবুদ্ধির : অষ্টাবক্রকে জনক, ও বন্দীকে অষ্টাবক্র যে-সব প্রশ্ন করলেন, তার কোনো-কোনোটি হেঁয়ালিগোছের, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন 'বর-ঠকানো প্রশ্ন', এবং অন্যগুলোকে আমাদের ছেলে-ভুলোনো ছড়ার 'চার কালো, চার ধলো'রই গুরুগম্ভীর প্রকরণ ব'লে মনে হয়। জনকের সভাপণ্ডিত 'তেরো' সংখ্যায় এসে দুটির বেশি উদাহরণ জোটাতে পারলেন না, আর সেজন্যেই তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হ'লো — এতে যেন উপাখ্যানটি হঠাৎ কৌতুকনাট্যের স্তরে নেমে আসে। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে যুধিষ্ঠিরের উক্তিসমূহে আমরা স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাই ; আর সাবিত্রী এমন কিছু বলছেন না যার উৎস নয় তাঁরই মেধা এবং তাঁরই হৃদয়বৃত্তি। তবু মনে হয় যে সর্পরূপী নহুষের মতোই যমদেবতাও প্রার্থীর আবেদন সহজেই মঞ্জুর ক'রে দিলেন ; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের

পরীক্ষা আরো সর্বাঙ্গীণ — তাঁকে প্রথমেই একটি নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হ'তে হ'লো।

এই নিষেধাজ্ঞাও আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। আদিপর্বে, পাণ্ডবেরা যখন একচক্রা ছেড়ে পাঞ্চালের পথে, অর্জুনও একবার এমনি এক আদেশ শুনেছিলেন, অন্য এক জলের ধারে দাঁড়িয়ে (অ: ১৭০)। সন্ধ্যা তখন, মশাল হাতে এগিয়ে চলেছেন অর্জুন, তাঁর পিছনে কুন্তী ও অন্য চার ভাই, তাঁর সামনে স্রোতস্বিনী গঙ্গা। হঠাৎ ধ্বনি উঠলো: 'কে তোমরা অবিমৃশ্যকারী পথিক, জানো না কি রাত্রিকাল যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্বের সময়, সন্ধ্যা থেকে প্রভাত পর্যন্ত মানুষের সঞ্চরণ নিষিদ্ধ? আমি গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ, এই নদী এখন আমার দ্বারা অধিকৃত — তোমরা ফিরে যাও।' অর্জুন যে উদ্ধতভাবে সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করলেন, আর আখেরে, অঙ্গারপর্ণকে যুদ্ধে হারিয়ে, তাঁরই কাছে বহু মূল্যবান উপঢৌকন পেলেন, এখানেই অর্জুনের অর্জুনত্ব। আর যুধিষ্ঠিরের অনন্যতাও এইখানে যে তিনি বক-যক্ষের আজ্ঞাপালনে মুহূর্তকাল দেরি করলেন না।

আরো একবার, বনবাসের প্রথম বছরে, আমরা অন্য এক নিষেধের সামনে অর্জুনকে দাঁড়াতে দেখি — যখন হিমালয়প্রান্তিক অরণ্যে, এক বন্য বরাহকে উপলক্ষ ক'রে, তিনি নামলেন এক কিরাতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় (বন: ৩৯-৪০)। 'এই বরাহকে আমি আগে লক্ষ্য করেছি, তুমি নিবৃত্ত হও!' — কিরাতের এই দাবিকে স্পর্ধাপূর্বক অগ্রাহ্য করলেন অর্জুন; কিন্তু এবারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্গারপর্ণের চেয়ে কিছুটা বেশি সমর্থ — কিরাতের ভুজ-নিষ্পেষণ সইতে না-পেরে অর্জুন মৃতের মতো ভূলুণ্ঠিত হলেন। কিন্তু সেও ছিলো এক পরীক্ষা, আর সেখানেও এক সুদক্ষিণ দেবতা ছিলেন পরীক্ষক; আর তাই অর্জুন আরো একবার জয়ী হ'তে পারলেন, যেন তাঁর অবাধ্যতার জন্যই দেবতার হাতে পুরস্কার পেলেন

দিব্যাস্ত্র। কিন্তু অর্জুনের হ্রদপ্রান্তিক দ্বিতীয় 'মৃত্যু' যখন ঘটলো, তখন অর্জুন নিজে নিজেকে পুনর্জীবিত করতে পারলেন না, নাগপাশ-বদ্ধ ভীমের মতোই হ'য়ে পড়লেন চেষ্টাহীন ও নিতান্ত অসহায়। উদ্ধারের জন্য যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন হ'লো।

প্রতিরূপ আরো পাওয়া যায় — মহাভারতের বাইরে জাতকগ্রন্থে, অত্যন্ত কৌতূহলজনক আকারে। দেবধর্মজাতক কথিকাটিকে মনে হয় রামায়ণ-মহাভারতের সংমিশ্রণে রচিত[২৬] — যদিও এ-ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না কোনটি কার উত্তমর্ণ বা অধমর্ণ, না কি দুটিই কোনো লৌকিক উৎস থেকে আহৃত। সুখের বিষয়, তা জানার কোনো প্রয়োজনও নেই আমাদের, কেননা আমাদের উদ্দেশ্য শুধু তুলনা ও প্রতিতুলনা, আর এখানে তার অপর্যাপ্ত সুযোগ আছে। আলোচনার সুবিধের জন্য কাহিনীটি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

বোধিসত্ত্ব সেবার — শ্রুতিকটু মহিংসাসকুমার নাম নিয়ে — বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র হ'য়ে জন্মেছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ভ্রাতা চন্দ্রকুমার তাঁর সহোদর, কনিষ্ঠ সূর্যকুমার বৈমাত্রেয়। রাজাকে এক পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, পতিসোহাগিনী বিমাতা জেদ ধরলেন তাঁর গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্য দিতে হবে। রাজা বৃদ্ধ হ'লেও দশরথের মতো বিহ্বল নন; তিনি জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রকে ডেকে বললেন, 'এই তো অবস্থা — তোমরা এখন কিছুদিনের মতো অরণ্যে প্রচ্ছন্ন থাকো, আমার মৃত্যু হ'লে দু-ভাই এসে রাজ্য অধিকার কোরো।' রাজকুমারদ্বয় যখন বনগমনের জন্য প্রস্তুত, তখন ঘটনাচক্র জানতে পেরে কনিষ্ঠ ভ্রাতাও লক্ষ্মণের মতো তাঁদের সহযাত্রী হ'লো। — এই পর্যন্ত রামায়ণ, কিন্তু পরবর্তী অংশে অন্য এক যুধিষ্ঠিরকে দেখা যাচ্ছে — আমাদের চেনা, অথচ প্রায় অচেনা।

এখানেও এক সরোবর, কুবেরসখা উদকরাক্ষস তার অধিকারী; এখানেও জলাহরণ ও প্রশ্নোত্তর, অপমৃত্যু ও উদ্ধার। কাঠামোটি প্রায়

হুবহু এক, কিন্তু অনুপুঙ্খগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে রাম যেমন যুধিষ্ঠিরের অনাত্মীয় তেমনি বোধিসত্ত্বের সঙ্গেও যুধিষ্ঠিরের কোনো সাদৃশ্য নেই : দু-জনে দুই ভিন্ন জগতের অধিবাসী।

প্রথমেই দেখি বোধিসত্ত্ব এক রাজকীয় ও রজোগুণসম্পন্ন পুরুষ, যুধিষ্ঠিরের তুলনায় অনেক বেশি প্রত্যুৎপন্নমতি, এবং স্বভাবতই কর্তৃত্বক্ষম। ঘটনাস্থলে ভাইয়েদের কাউকে দেখতে না-পেয়ে তিনি একটিও বিলাপবাক্য বললেন না; পদচিহ্ন দেখেই বুঝে নিলেন তারা সরোবরবাসী রাক্ষস-কর্তৃক ধৃত হয়েছে। আর তক্ষুনি ধনুর্বাণ ও অসি নিয়ে প্রস্তুত হলেন বোধিসত্ত্ব; বনচরবেশী রাক্ষসের প্ররোচনা সত্ত্বেও জলে নামলেন না। এদিকে যুধিষ্ঠির, যাঁর হাতে কোনো অস্ত্র নেই, মনে নেই বিরোধ অথবা প্রতিরোধচিন্তা, তাঁকে দেখি অনুরূপ অবস্থায় শোকার্ত এবং বিবেচনাহীন; দুর্ঘটনার কারণ-নির্ধারণের চেষ্টা না-ক'রে, তিনি নিজেই সেই সন্দেহজনক জলে অবতরণ করলেন। একটি ভ্রাতার পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি পেয়ে উভয়েই চাইলেন বৈমাত্রেয়কে — এটাকে যদি বা বলা যায় যৌথপরিবারসম্মত লোকাচার, তবু মানতে হয় প্রণোদনায় এঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বোধিসত্ত্ব ছিলেন লোকনিন্দা বিষয়ে সতর্ক (পাছে বিমাতাপুত্রের মৃত্যুর জন্য তাঁকেই কেউ দায়ী ব'লে সন্দেহ করে!); আর যুধিষ্ঠির, তাঁর নিজের হিতাহিত না-ভেবে, শুধু চেয়েছিলেন তাঁর জননীর মতো তাঁর বিমাতারও একটি অন্তত পুত্র বেঁচে থাক। উভয় ভ্রাতাকে ফিরে পেয়ে বোধিসত্ত্ব কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন না, উল্টে তার পাপকর্মের জন্য তিরস্কার করলেন রাক্ষসকে, নরকবাস ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে তার ধর্মান্তর ঘটালেন। সত্যি বলতে, এই উদক-রাক্ষসটির রাক্ষসত্ব আমরা দেখতে পাই একবার মাত্র — যখন জলাবতীর্ণ দুই ভ্রাতাকে সে গ্রেপ্তার করলো সবলে, তার প্রশ্নের ভুল উত্তর দেবার শাস্তিস্বরূপ তাদের টেনে নিয়ে গেলো জলের তলায় —

খুব সম্ভব খাদ্যবস্তু হিশেবে মজুত রাখলো[২৭]। কিন্তু তারপর, যে-মুহূর্তে বোধিসত্ত্ব এলেন, তিনি প্রশ্নের উত্তর দেবারও আগে থেকে, রাক্ষস হঠাৎ সুশীল বালকে পরিণত হ'য়ে গেলো ; তাঁর সেবা করলো পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে ভৃত্যের মতো ; তাঁকে পালঙ্কে বসিয়ে, নিজে পদতলে ব'সে শুনলো তাঁর মুখে দেবধর্মের ব্যাখ্যান। আর শেষ পর্যন্ত, তিনি বারেক বলামাত্র জন্মের মতো ছেড়ে দিলো তার রাক্ষস-বৃত্তি। এই সবই বোধিসত্ত্বের মাহাত্ম্যসূচক ; রাক্ষস যেন অজান্তেই তাঁর প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিলো — আর বোধিসত্ত্ব নিজেও তাঁর শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সচেতন, তাঁর বচনে ও ব্যবহারে প্রথম থেকেই একটি দৃপ্তির ভাব আমরা দেখতে পাই। এই স্বগৌরববোধ তাঁর গুণরাশিরই অন্যতম, এবং এটিও রাজোচিত — যদিও শুধুই রাজোচিত নয়। ব্রাহ্মণবালক অষ্টাবক্রকে আর-একবার মনে আনা যাক ; জনকসভায় তাঁর প্রতিটি কথা বুঝিয়ে দিচ্ছে তিনি গর্বিত ও প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয়ে অসহিষ্ণু — যেন বন্দীকে চোখে দেখার আগেই তিনি তাঁর নিজের জয় বিষয়ে নিঃসংশয়। এমনকি যুধিষ্ঠির — যিনি 'মৃদু ও লজ্জাশীল' ব'লে মাঝে-মাঝে প্রশংসিত ও প্রায়শই নিন্দিত হ'য়ে থাকেন, তিনিও অজগরের সম্মুখীন হ'য়ে প্রথমটায় ঠিক বশংবদ ব্যবহার করেননি। 'সর্প, তুমি যে-ই হও, বলো তুমি ভীমসেনকে কেন গ্রাস করেছো ? যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে — সত্য বলো, তুমি কী জানতে চাও, কী খাদ্য চাও, কিসের বিনিময়ে তুমি ভীমকে মুক্তি দেবে !' — যাকে বলে ন্যায়সংগত দাবি, এ হ'লো তা-ই ; আমরা বুঝতে পারি, ভীমের দুর্দশায় তিনি ব্যাকুল হয়েছেন ; কিন্তু 'যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে !' — এই কথাটায় ধরা পড়লো যে তিনিও আত্মাভিমানবর্জিত মানুষ নন। তারপর : 'তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো, তবেই তোমার ভ্রাতাকে নিষ্কৃতি দেবো —' অজগরের এই উক্তির উত্তরে যুধিষ্ঠির আগে পরীক্ষককেই পরীক্ষা

করতে চাইলেন: 'আপনি ব্রাহ্মণের বেহু বিষয় অবগত আছেন কিনা বলুন, তা না-জেনে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো না।'— আবার আমরা তাঁর চোখে দেখলাম গর্বের ঝিলিক — হঠাৎ মনে হ'লো বক্তা যেন যুধিষ্ঠির নন, অষ্টাবক্র।

কিন্তু যে-মানুষকে আমরা যুধিষ্ঠির ব'লে জানি, ভাবি, এবং অনুভব করি, যাঁকে দ্যূতসভার পরে বনযাত্রার প্রাক্কালে আমরা দেখেছিলাম, তিনি যেন বিলীয়মান অপরাহ্নের আলোয় কিছুক্ষণের জন্য উদ্ভাসিত হলেন — আমাদের আলোচ্য হ্রদপ্রান্তিক অধ্যায়ে, এক কিম্ভূত সত্তার দ্বারা আক্রান্ত বা অধিকৃত অবস্থায়। এখানে দেখি, ভ্রাতাদের নিপাতকারী বিষয়ে তাঁর কোনো অভিযোগ পর্যন্ত নেই; তিনি কোনো প্রতিবাদ করলেন না বা তর্ক তুললেন না; শুধু অনুভব করলেন অনির্ণেয় এক দেবতার উপস্থিতি। হয়তো সেইজন্যে — বা আসলে তাঁর নিজেরই মধ্যে পরিবর্তন ঘ'টে গেছে ব'লে — এখানে তাঁর ভঙ্গিটা প্রতিযোগীর নয়, সম্মতিদাতার — বোধিসত্ত্বের মতো প্রচারক ও সংস্কারকের নয়, তাঁর নিজস্ব-চিরাচরিতভাবে শিক্ষার্থীর। যক্ষ-বকের আহ্বানের উত্তরে তাঁর কণ্ঠস্বরও বিনম্র:

—'হে যক্ষ, আত্মপ্রশংসা কোনো সৎপুরুষের কর্ম নয়; আমি শুধু বলছি আমার সাধ্য অনুযায়ী উত্তর দেবার চেষ্টা করবো। আপনি প্রশ্ন করুন।'

যুধিষ্ঠিরের জীবনে এই এক সন্ধিক্ষণ: এই বারো বছর ধ'রে যে-শিক্ষা তাঁর লব্ধ হ'লো, এর পরে তা প্রয়োগ করতে হবে তাঁকে — অরণ্যের নির্জনতায় নয়, রাজসভায়, আবার সেই রাজনীতির আবর্তে, ভীষণ এক যুদ্ধ পেরিয়ে, আর যুদ্ধপরবর্তী দীর্ঘশ্বাসের বৃত্তে ঘুরে-ঘুরে — কতটা নিষ্ফল এবং কতটুকুই বা সফলভাবে, তা আমরা ক্রমশ দেখবো।

২৪। একটি প্রশ্নোত্তরে সাদৃশ্য একেবারে আক্ষরিক: মূল সংস্কৃতে ভাষা পর্যন্ত অভিন্ন (বন : ১৩৩ : ২৮-২৯ ও ৩১৩ : ৬১-৬২ দ্র)।

—'সুপ্ত হ'য়ে কে চক্ষু মুদ্রিত করে না? জন্মগ্রহণ করেও কে স্পন্দিত হয় না? কার হৃদয় নেই? বেগ দ্বারা কে বৃদ্ধি পায়?'

—'মৎস্য নিদ্রাকালেও চক্ষু মুদ্রিত করে না, অণ্ড প্রসূত হ'য়েও স্পন্দিত হয় না, পাষাণের হৃদয় নেই, নদী বেগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়।' (অনু: রা-ব)

এ-দুয়ের মধ্যে কোনটা মৌলিক আর কোনটা কুশীলকর্ম, তা নিয়ে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক, কেননা এই ধরনের পুনরুক্তি বা ঋণগ্রহণ 'ক্লাসিক'-যুগ-পূর্ববর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের একটি প্রতিষ্ঠিত চরিত্রলক্ষণ। অনেকেই জানেন, বিভিন্ন বেদ ও উপনিষদের মধ্যে, উপনিষৎ ও গীতার মধ্যে, এবং মহাভারত ও রামায়ণের মধ্যেও অনেক সামান্য শ্লোক পাওয়া যায়।

অজগরের প্রশ্নগুলিও ধর্মবকের মুখে আবার আমরা শুনতে পাই—যদিও ভিন্ন ভাষায় এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে।

২৫। সাবিত্রী-কথা ও বক-যুধিষ্ঠির-সংবাদের এই সান্নিধ্য অতি সুষ্ঠু ব'লে আমার মনে হয়; কিন্তু ও-দুয়ের মধ্যে একটি কর্ণজীবনী প্রবিষ্ট করা হ'লো কেন (বন : ২৯৯-৩০৯), আমি অনেক ভেবেও তা বুঝে উঠতে পারিনি। অবশ্য যুধিষ্ঠির এই কর্ণ-কথা শুনছেন না (শুনলে প্লটের পক্ষে মারাত্মক হ'তো), এটি সোজাসুজি বৈশম্পায়ন বলেছেন জনমেজয়কে, এবং কর্ণের জীবন ও তাঁর কুমারী-মাতার মনস্তত্ত্ব বোঝার পক্ষে কাহিনীটি অত্যন্তই জরুরী। কিন্তু পৌর্বাপর্যের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না: এই একটি অংশে সংস্থাপনা অনুচিত হয়েছে, তা স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্ণের জন্মকথা মহাভারতে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তার প্রথম উল্লেখ পাই 'সংক্ষিপ্ত ক্ষত্রিয়বংশবর্ণনে', (আদি : ৬৩), কঙ্কালের আকারে: 'কুন্তীর কন্যকাবস্থায় তাঁর গর্ভে সূর্যের ঔরসে কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন' — এই একটির বেশি বাক্য সেখানে নেই। পাণ্ডববংশবর্ণনে (আদি : ৬৭) কর্ণজীবনীর চুম্বক কথিত হ'লো — জন্ম থেকে কুণ্ডলহরণের

ব্যাপারটা পর্যন্ত। তারপর — বেশি পরেও নয় — কর্ণের জন্মকথার সবিস্তার বিবরণ পাই আদিপর্বের ১১১ সংখ্যক অধ্যায়ে। এগুলি সবই বৈশম্পায়নের বিবৃতি, কিন্তু অন্যভাবেও ঘটনাটা আমরা শুনি না তা নয়, উদ্যোগপর্বেই তিনবার এর উল্লেখ আছে (অ: ১৩৮, ১৪২, ১৪৩)—প্রথমে কর্ণের প্রতি কৃষ্ণের ভাষণে, তারপর কর্ণজননীর স্বগতচিন্তায়, আর তার অব্যবহিত পরেই প্রথমজাত পুত্রের সঙ্গে তাঁর সংলাপে। তাঁর সেবারকার উক্তি ছিলো যুক্তিনির্ভর, আবেগহীন, কিন্তু স্ত্রীপর্বে যখন যুদ্ধে নিহত বীরগণের শ্রাদ্ধক্রিয়ার আয়োজন হচ্ছে (অ :২৭), তখন কুন্তী আর শোকোচ্ছ্বাস সামলাতে না-পেরে সকলের সামনে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করলেন, এবং পরে আরো একবার সেই একই কাহিনী শোনালেন ব্যাসদেবকে (আশ্রমবাসিক : ৩০)।

২৬। জাতক: ঈশানচন্দ্র ঘোষ-কৃত বঙ্গানুবাদ, সং বঙ্গাব্দ ১৩২৩, প্রথম খণ্ড, পৃ ২২-২৬ দ্র।

২৭। কেননা কুবের রাক্ষসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'দেবধর্ম-জ্ঞান-হীন যে-ব্যক্তি ইহার জলে অবতরণ করিবে সে তোমার ভক্ষ্য হইবে।'

(অনু : ঈশান)

৮: বিভিন্ন কোরাস

উদকরাক্ষসের একটিমাত্র প্রশ্ন ছিলো: 'দেবধর্ম কী?', এবং বোধিসত্ত্ব যে-উত্তর দিয়েছিলেন, তাও যথাসম্ভব সরল।

নিয়ত প্রশান্ত চিত্ত সত্যপরায়ণ
নির্মল অন্তরে করে ধর্মের ভজন;
উদিলে কলুষভাব লাজ পায় মনে;
দেবধর্মা বলি তুমি জানিবে সে-জনে।

(অনু : ঈশান)

রাক্ষসের বুদ্ধি বেশি নেই, সে ওটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়েছিলো; কিন্তু ধর্মবক হয়তো জিজ্ঞাসা করতেন: 'সত্য কাকে বলছো? কোন-কোন ভাব কলুষিত? কোন উপায়ে প্রশান্তি লাভ করা যায়?' বস্তুত, তাঁর প্রশ্নের সংখ্যা একশো-ছাব্বিশে পৌঁছতে পারতো না, যদি না তিনি পুত্রের কাছে দাবি করতেন — শুধু নির্বস্তুক একটি ধর্মসূত্র নয়, একটি ব্যবহার্য ও সম্পূর্ণ জীবনদর্শন। আমরা লক্ষ করি যে প্রশ্নগুলি জ্ঞানের নানা বিভাগ থেকে সংকলিত হয়েছে — নীতি ও ধর্মের প্রসঙ্গ বেশি থাকলেও জীববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যাও বাদ পড়ে নি। এমন নয় যে সব কথাই উচ্চভাবসম্পন্ন; এখানেও আছে বেদ-ব্রাহ্মণের গতানুগতিক প্রশস্তি, পিতা মাতা দেবতা বিষয়ে প্রথাসম্মত সম্মানবাক্য: — তবু যুধিষ্ঠিরকে মনে হয় না আক্ষরিকভাবে শাস্ত্রানুগামী, একান্তভাবে বেদের প্রতি আস্থাবান। নয়তো কেন তিনি প্রার্থনাকে 'বিষ' ব'লে আখ্যাত করবেন, আর কেনই বা একই নিশ্বাসে বেদকে বলবেন 'সর্বদা ফলবান'[২৮]; আর আনৃশংস্যকে (অহিংসাকে) 'প্রধান' ধর্ম? তিনি কি জানতেন না ঐ দুই উক্তি পরস্পরবিরোধী, পশুবলিনির্ভর যজ্ঞপরায়ণ যোদ্ধৃজনোচিত বৈদিকধর্মে আনৃশংস্যের কোনো স্থান নেই? জানতেন না, বৈদিক ঋষিরা ধন জন সুখ স্বাস্থ্য জয়ের জন্য প্রার্থনায় কেমন উন্মুখর? মাঝে-মাঝে তাঁর উত্তর শুনে চমকে উঠি আমরা: যখন তিনি 'মনোমল-ত্যাগ'কে বলেন স্নান, প্রাণীরক্ষাকে বলেন দান, আর সকলের সুখ ইচ্ছে করাকেই বলেন দয়া — তখন মনে হয় সব শাস্ত্র ছাপিয়ে তাঁর নিজের কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো; মনে হয় এ-সব তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা, তাঁরই অভিজ্ঞতাপ্রসূত উচ্চারণ। হয়তো অরণ্য-ভূমি ছেড়ে যাবার আগে, তিনি তাঁর অতীতের দিকে তাকিয়েছিলেন একবার, যেখানে সঞ্চিত আছে কুরুপাণ্ডবের মধ্যে মনোমল — কালীপ্রসন্নর ভাষায় 'মনোমালিন্য' — এবং একবার ভবিষ্যতের

দিকেও, যেখানে অপেক্ষা ক'রে আছে মহাযুদ্ধ — আর তাই, স্নান, দান ও দয়ার এ-রকম অশাস্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এ-সবের মধ্য দিয়ে তাঁর গোপন মনের এই ইচ্ছেটাই ফুটে বেরোচ্ছে যেন যুদ্ধ নিবারিত হয়, যেন যুদ্ধরূপ ব্যাধির বীজ থেকে কুরুবংশ আরোগ্য লাভ করে।

কথাটাকে উল্টো দিক থেকেও বলা যায়। 'অস্ত্রশস্ত্রই ক্ষত্রিয়ের দেবভাব, বেদচর্চাতেই ব্রাহ্মণের দেবত্ব —' এই ধরনের শাস্ত্রবচন শুনে ধর্মবক তৃপ্ত হ'তে পারছেন না; খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে, প্রশ্নের পর ক'রে-ক'রে, যুধিষ্ঠিরের মর্মকথাটা টেনে বের করছেন। যে-গহনচারী মৎস্যের জন্য এই বকপক্ষীর অপেক্ষা, তা হ'লো যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিগত স্বীকৃতি; ধর্ম যেন ঈষৎ সহাস্যে মনে-মনে বলছেন: 'ও-সব পুঁথির কথা থাক, তুমি সত্যি কী বিশ্বাস করো, তা-ই বলো!' আর সেই উদ্দেশ্যেই, পরীক্ষার প্রায় শেষ মুহূর্তে, তিনি চারটি গূঢ়ান্বেষী প্রশ্নে বিদ্ধ করলেন তাঁর পুত্রকে: — 'সুখী কে? আশ্চর্য কী? পথ কী? বার্তা কী?' যুধিষ্ঠিরের উত্তর ভাঙিয়ে কয়েকটি সিকি-দুয়ানি আজ লোকের হাতে-হাতে ঘুরছে, কিন্তু সম্পূর্ণটি এখানে স্মরণযোগ্য।

পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে ॥
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥

(বন : ৩১৩ : ১৫৫)

—হে জলচর। অঋণী ও অপ্রবাসী হ'য়ে, দিনের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে, যিনি স্বগৃহে শাকান্ন রন্ধন করেন, তিনিই সুখী[২৯]।

অঋণী? অপ্রবাসী? একবেলা শাকান্ন খেয়ে বাঁচা? আমাদের মন যেন কুঁকড়ে যায় কথাগুলো শুনে, আমরা যারা উচ্চাশাসম্পন্ন ও চেষ্টাপরায়ণ। কিন্তু আমাদের পক্ষে — বা অন্যান্য পাণ্ডবদের পক্ষে — গ্রাহ্য হোক বা না-ই হোক, যুধিষ্ঠিরের নিজের দিক

থেকে এটা সত্য। কেননা পরবর্তী বৎসরটি তাঁকে সপরিবারে অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হবে, অতি শঙ্কিলভাবে প্রবাসী বা উদ্বাস্তু—কোথায়, তা এখনো জানেন না। এবং তাঁর পত্নী ও ভ্রাতাদের কাছে আকণ্ঠ ঋণে ডুবে আছেন তিনি, যেহেতু তাঁদের প্রাপ্য ও কাঙ্ক্ষিত রাজত্ব থেকে তিনিই তাঁদের বঞ্চিত করেছেন। আর শাকান্নভোজনে সেই মানুষের কেন আপত্তি থাকবে, পরে যিনি পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি মাত্র গ্রাম চাইবেন — যুদ্ধনিবারণের জন্য, বিরোধভঞ্জনের চেষ্টায়? এ-পর্যন্ত তাঁর উক্তিগুলিকে তাৎকালিক বলা যায়, কিন্তু এর পরের উত্তর দুটি আরো দূরস্পর্শী।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্।
শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণং।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥
(বন : ৩১৩ : ১১৬-১৭)

—প্রত্যহই প্রাণীগণের মৃত্যু হচ্ছে, তবু অবশিষ্টেরা চিরকাল বাঁচতে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হ'তে পারে?

তর্ক অপ্রতিষ্ঠ (মীমাংসাহীন), শ্রুতি (বেদ) বিভিন্ন, এমন কোনো ঋষি নেই যাঁর মত প্রামাণিক, মহাপুরুষেরা যে পথে গিয়েছেন সেটাই পথ[৩০]।

যুধিষ্ঠিরের মনের ছবিটি এবার আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি শাস্ত্রবিশ্বাসী নন, কোনো নির্দিষ্ট মতবাদে তাঁর আস্থা নেই। তিনি জানতে চান তাঁর নিজের মন দিয়ে সত্যকে, জ্ঞানকে তাঁর অনুভূতির দ্বারা অন্তরঙ্গ ক'রে নিতে চান। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও আমরা

কেউ নিজের মৃত্যু ধারণা করতে পারি না, এই কথাটা অবশ্য খুবই পুরোনো ; কিন্তু আশ্চয এই যে যুধিষ্ঠির এটাকে সবচেয়ে আশ্চর্য ব'লে ভাবলেন। কেননা আমাদের কাছে ব্যাপারটা কিছু আশ্চর্য নয়, স্বাভাবিকমাত্র — আমরা যে বেঁচে আছি সে-বিষয়ে আমরা সচেতন হ'তেও পারি না, এতই আমরা ভালোবাসি জীবনকে ; কিন্তু যুধিষ্ঠির যেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছেন সেই অনেক বড়ো জীবনকে, মৃত্যু যেখানে উপস্থিত ও স্বীকৃত, আর জীবনলিপ্সারই উল্টো পিঠে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি যেখানে দৃষ্ট হয়। তত্ত্বজ্ঞান পরস্পব-বিরোধী, কোনো জ্ঞানী ধ্রুবসত্য জানেন না — অতএব ? এখানে হঠাৎ থমকে চাই আমবা ; মনে প্রশ্ন জাগে : মহাজ্ঞানীও এক নন, অনেক, আর তাঁরাও ভিন্ন-ভিন্ন পথে যাত্রী হয়েছেন — কার পদাঙ্ক আমরা অনুসরণ করবো ? আর যদি 'মহাজন' শব্দেব সর্বজন অর্থ ধরি তাহ'লে আরো বেশি ধাঁধায় পড়ে যেতে হয়[৩১]। সর্বজন ? লোকসমবায় ? কিন্তু তারা তো কোনো পথ বেছে নেয় না, শুধু চালিত হয় দৈবের বা অন্ধ প্রকৃতির তাড়নায় ; তারা জন্ম নেয়, জন্ম দেয়, কিছু প্রয়োজনীয় প্রাকৃত কর্ম করে ; মানববংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ব'লেই তারা মল্যবান। এই 'বহুজনসম্মত' মার্গ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে শ্লাঘ্য বা ধমবকের উদ্দিষ্ট ছিলো, নীলকণ্ঠের নির্দেশ সত্ত্বেও আমার তা বিশ্বাস্য ব'লে মনে হয় না ; কেননা যুধিষ্ঠির তাঁর জীবনের আরম্ভ থেকেই ব্যতিক্রম — ক্ষত্রকুলে ও রাজবংশে ব্যতিক্রম, তাঁর সব ভালো-মন্দ নিয়ে নিঃসংশয়ে এক অ-সাধারণ মানুষ তিনি—এবং আমাদের ধর্মবকটিও এ-যাবৎ কোনো সহজ উত্তরে সন্তুষ্ট হননি। 'সর্বজন যে-পথে গিয়েছে সেটাই পথ' — এতে যেন প্রশ্নটিকেই সমূলে উৎপাটিত করা হয় ; আর পক্ষান্তরে, মহাপুরুষদের মধ্যে কোনজন অনুসরণযোগ্য তাও নিশ্চিতভাবে ব'লে দেবার কেউ নেই, কেননা ভারতবর্ষীয় ধমবোধ কখনো কোনো অনন্য মতবাদকে স্বীকার

করেনি। যুধিষ্ঠিরের মনের ভাবটি তাহ'লে কী? কী বলতে চেয়েছিলেন তিনি এখানে?

এই প্রশ্নের উত্তর আমরা মহাভারতের পুঁথির মধ্যে পাই না, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী সমস্ত জীবনই এর উত্তর। তিনি, অনবরত নির্দেশ-প্রার্থী ও নির্দেশপ্রাপ্ত, বহু প্রখ্যাত মুনির সাক্ষাৎ পেয়েছেন জীবন ভ'রে, ছিলেন তাঁদের সকলেরই প্রতি মনোযোগী ও সশ্রদ্ধ, কিন্তু কাউকেই গুরু কিংবা অমোঘ সত্যদ্রষ্টা ব'লে বরণ করেননি। এবং যে-পথ বহুজনের জীবনসংগ্রামে খরধ্বনিত, সেখানেও যাত্রী নন যুধিষ্ঠির — আমরা সকলেই জানি এই অদ্ভুত মানুষটি তাঁর 'নিজের মুদ্রাদোষে আলাদা'। ভীষ্ম দ্রোণ ভীম অর্জুন দুর্যোধনাদি বীরবৃন্দের পথ প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট ছিলো — রাম লক্ষ্মণ ভরত এবং রাবণেরও তা-ই; লোভ, মদ, শৌর্য, প্রতিহিংসা, সত্যরক্ষা, ভ্রাতৃভক্তি—এমনি এক-একটি খোপের মধ্যে তাঁদের আটকে দেয়া যায়; কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে নিজেই নিজের পথ তৈরি ক'রে নিতে হয়েছে—বহু সংশয় পেরিয়ে, বহু ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছে অতি ধীরে একটি উপলব্ধির স্থির বিন্দু পর্যন্ত! সেই উপলব্ধিরই আমরা আভাস পাই যখন 'বার্তা কী?' প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন:

সূর্যের আগুনে, দিন-রাত্রির ইন্ধনে, মাস ও ঋতুর হাতা দিয়ে নেড়ে-নেড়ে, কাল এই মহামোহময় কটাহে প্রাণীবৃন্দকে রন্ধন করছে: এ-ই বার্তা।

এক মুহূর্তে, বিদ্যুৎঝলকে উদ্ভাসিত কোনো বিশাল ভূদৃশ্যের মতো, আমরা দেখতে পেলাম জীবন-মৃত্যুর সম্পূর্ণ বৃত্তটিকে, বংশপরম্পর জনন ও জন্মের স্বরূপ, বৃদ্ধি-ক্ষয়ে ঘূর্ণমান সর্বজীবের জীবনের রূপচিত্র। দেখলাম এক দ্রষ্টার চোখে, আতঙ্ক ও আনন্দে কেঁপে উঠলাম। কে থাকতে পারেন পরীক্ষক যিনি এই উত্তর শুনে প্রীত হবেন না?

দেবধর্মজাতকের সঙ্গে তুলনা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, সেখান থেকে দূরে চ'লে এসেছি। কিন্তু প্রসঙ্গটিতে মুহূর্তের জন্য ফিরে যেতে হবে ; এই দুই কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো তফাৎটা এখনো বলা হয়নি।

২৮। মূলে আছে ত্রয়ীধর্মঃ সদাফলঃ'। ত্রয়ীধর্ম—ঋক্, যজুঃ- ও সামবেদ।

২৯। আমার অনুবাদ বঙ্গবাসী ও আর্যশাস্ত্র অনুযায়ী। সিদ্ধান্তবাগীশ ও রা-বসুতে প্রথম চরণের পাঠান্তর আছে :

দিবসস্যাষ্টমভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।

দিনের অষ্টম ভাগ — সন্ধ্যাবেলা। এই শ্লোকে 'স্বগৃহ' কথাটা নেই।

৩০। এখানেও সিদ্ধান্তবাগীশ ও রা-বসু প্রথম চরণের ভিন্ন পাঠ দিয়েছেন :

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

শাস্ত্রজ্ঞান নিষ্ফল — এই কথাটা কঠোপনিষদে আরো জোরালোভাবে বলা হয়েছে (১ : ২ : ২৪) — 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

প্রশ্নোত্তরের পারম্পর্য সব সংস্করণে এক নয়; আমি কালীপ্রসন্ন অনুসরণ করেছি।

৩১। 'মহাজন' শব্দের লোকসমবায় বা সর্বজন অর্থের উল্লেখ ক'রে 'দেশ' পত্রিকার এক পত্র-লেখক আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। আমি কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান ক'রে দেখলাম যে 'মহাজন' বিষয়েও 'শ্রুতয়ো বিভিন্না'। 'বহুজনসম্মতমেব মার্গমনুসরেৎ'— এই হ'লো নীলকণ্ঠের টীকা; কালীপ্রসন্ন, বর্ধমান ও রা-বসু অনুবাদে 'মহাজন'ই রেখেছেন— সংস্কৃতের মতোই একবচনে, কিন্তু কথাটার কোনো ব্যাখ্যা না-দিয়ে। সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর

'ভারতকৌমুদী' টীকায় অর্থ দিয়েছেন : 'রামযধাত্যাদির্যেন পথা গতঃ, স পন্থা আশ্রয়ণীয়ঃ' ; বঙ্গানুবাদ করেছেন 'প্রধান প্রধান লোক'। আর্যশাস্ত্রে 'মহাজনগণ' ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে মনে হয় মহাপুরুষ অর্থই অভিপ্রেত। রা-বসু পাদটীকায় বিকল্প দিয়েছেন, 'বিখ্যাত সাধুজন বা বহুজন', কিন্তু কোনটা তাঁর নিজের মনোমতো তা বলেননি। এমনও হতে পারে যে যুধিষ্ঠির এখানে সর্বজনেরই জন্য পথনির্দেশ করেছেন — তাহ'লে দুয়ের মধ্যে যে-কোনো অর্থই গ্রাহ্য হয় — তাঁর স্বীয় পথ উল্লেখ করেননি, কেননা সেটি এখনো তাঁর অজ্ঞাত।

৯ : পিতৃপরিচয়

দেবধর্মজাতকের রাক্ষস কোনো জলার্থীকে সাবধান ক'রে দেয় না, জলে নামতে বারণ করে না কাউকে — চতুরভাবে শিকারের অপেক্ষায় ব'সে থাকে। কিন্তু পর-পর পাঁচ ভাইয়ের কাছে ধর্মবকের প্রথম ঘোষণাই নিষেধাজ্ঞা : 'সাহস কোরো না! — মা সাহসং কার্ষীম্।' চন্দ্রকুমার ও সূর্যকুমার নির্জিত হলেন শুধু এইজন্যে যে তাঁরা প্রশ্নের ঠিক উত্তর জানতেন না, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অনুজগণ প্রশ্ন শোনারও সুযোগ পেলেন না, নেপথ্যবাণী অমান্য করামাত্র হতচেতন হ'য়ে পড়লেন। স্পষ্টত, তাঁদের মৃত্যুর কারণ আদেশ-লঙ্ঘন — অবাধ্যতা — অন্য কিছু নয় ; যে বাধ্য নয় সে জিজ্ঞাসিত হবার যোগ্য নয়, ধর্মবকের মনের কথাটা হ'লো এই। উদকরাক্ষস দোষীদ্বয়কে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেলো, অজগররূপী মহাত্মা নহুষও দৈহিক বলেই পরাস্ত করলেন ভীমসেনকে ; কিন্তু নিপাতিত চার ভাইয়ের কাছে বক-যক্ষের শারীরিক আবির্ভাবেরও প্রয়োজন হ'লো না — অবাধ্যতা নিজেই নিজের শাস্তি ডেকে আনলো।

ধরনটি সেই সনাতন রূপকথার, অথচ এটি আদিম মানুষের অন্ধ কোনো 'ট্যাবু' নয় — এর মধ্যে গভীর একটি নৈতিক অভিপ্রায় নিহিত আছে। আমরা বুঝতে পারি, যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা শুধু জ্ঞানের নয়, বিদ্যাবত্তার নয় — তা প্রথমত ও প্রধানত চারিত্রিক। তিনি যে আদেশলঙ্ঘন করলেন না, বকের পূর্বাধিকার সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার ক'রে নিলেন, এতেই বোঝা গেলো তাঁর পিতার অযোগ্য পুত্র তিনি নন।

কিন্তু এই ছদ্মবেশী পিতা, এই স্নেহশীল অথচ কঠিন-বিচারক দেবতা : তিনি কে? এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা প্রয়োজন, কেননা তাঁর সঠিক কোন পরিচয় আমাদের জানা নেই, ব্যাসদেব যেন ইচ্ছে ক'রেই তাঁকে নানাবিধ সংশয়ের ছায়ায় আবৃত রেখেছেন, মহাভারতের বিরাট কর্মকাণ্ডে তাকে প্রত্যক্ষ কোনো অংশ নিতেও আমরা দেখি না[৩২]। কুন্তী-কর্তৃক আহূত অন্য তিন দেবতা, এমনকি মাদ্রীর অশ্বিনীকুমারদ্বয় — এঁরা বহুকাল ধ'রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু 'ধর্ম' নামক পুরুষটিকে তেমন উচ্চপদস্থ ব'লে মনে হয় না। লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠির যদিও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, তবু তাঁর জন্মকথা অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে (আদি : ১২৩); মূল সংস্কৃতে আটটি মাত্র শ্লোকে তা সমাপ্ত, আর তা থেকে ধর্ম বিষয়ে শুধু এই তথ্যটি জানা যায় যে তিনি এক জ্যোতির্ময় বিমানে চ'ড়ে কুন্তীর কাছে এসেছিলেন। ভীমের জন্মদাতা বায়ু বিষয়েও বেশি উচ্চবাচ্য নেই; কিন্তু অর্জুনের জন্ম নিয়ে বেশ কিছু ঘটাপটা হ'লো — ইন্দ্রের তুষ্টিকামনায় পাণ্ডু-কুন্তী একবৎসরব্যাপী ব্রত করলেন; জাতকোৎসবে যোগ দিতে এলেন দেবতা নাগ ঋষি গন্ধর্ব অপ্সরাদি ত্রিলোকবাসীরা, আর অবশ্য পুষ্পবৃষ্টি নৃত্যগীত ইত্যাদি গতানুগতিক মঙ্গলাচরণের কিছু বাদ পড়লো না। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সবই ইন্দ্রের কারণে। ততদিনে তাঁর বৈদিক মহিমা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে থাকলেও, অন্তত পাণ্ডুর কাছে তখনও তিনি প্রধান দেবতা[৩৩], 'অমিতদ্যুতি ও অপ্রমেয় বলবীর্যসম্পন্ন'। তাঁর

ঔরসজাত পুত্রের 'পিতা' হবার মতো সৌভাগ্য শাপগ্রস্ত পাণ্ডুর পক্ষে আর কী হ'তে পারে? এমনকি আমাদের চোখেও ইন্দ্র এখনো কথঞ্চিৎ উজ্জ্বলতা নিয়ে প্রতিভাত — এই যজ্ঞহীন যুগেও আমরা ভুলতে পারিনি তিনি বৃত্রঘ্ন ও বন্দী জলের মুক্তিদাতা। কিন্তু ধর্ম, যিনি কুন্তীকে তাঁর প্রথম 'বৈধ' পুত্র দান ক'রে গেলেন — তাঁর কোনো মূর্তি আমরা ভাবতে পারি না, কোন ইতিহাস স্মরণে আসে না আমাদের। যে ধর্মদেবতা বুদ্ধের প্রচ্ছদরূপে মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর কোনো দূর পূর্বাভাসরূপে এঁকে কল্পনা করা অসম্ভব, কেননা বক-যক্ষ আর যা-ই হোন, শূন্যবাদী নন। অথচ কোনো প্রাচীন পুরাণে 'ধর্ম' নামে কোনো পূর্ণাঙ্গ দেবতা নেই— বড়োজোর তিনি ভগবানের একটি ভগ বা অংশমাত্র, কখনো বা অষ্ট-বসুর পিতা, এবং কখনো বিস্ময়করভাবে স্বয়ম্ভু কামদেবের জনক[৩৪]। ভাগবত-পুরাণের সৃষ্টিবর্ণন অনুসারে (৩ : ১২) ব্রহ্মার যে-দক্ষিণ স্তনে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজ করেন, তা থেকে ধর্মের, এবং পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্মের উদ্ভব হয় — স্পষ্টত, এখানে ধর্ম কোনো মূর্ত দেবতা নন, তিনি নির্বস্তুক সদাচার। বলা বাহুল্য, এই সব অস্পষ্ট ভগ্নাংশ থেকে আমাদের পুষ্করবর্তী বলীয়ান প্রশ্নকারীটি শতযোজন দূরে অবস্থিত। অন্য অনুষঙ্গের অভাবে এমনও বলা যেতে পারে যে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রচিত্রণের একটি উপায়স্বরূপ ব্যাসদেব এই ধর্মকে রচনা ক'রে নিয়েছিলেন।

কিন্তু অন্য এক দেবতা আছেন—তিনিও সুপ্রাচীন ও সোমপায়ী— যাঁকে বহুকাল ধ'রে কালান্তর ব'লে আমরা জেনে এসেছি, অথচ যিনি এক দূরযাত্রিণী তরুণীকে পতির প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন, জপেছেন এক অনিবারণীয় বালকের কানে পরাবিদ্যা :— সেই মহান ও মূর্ত দেবতাকে কি যুধিষ্ঠিরের জনকরূপে ধ'রে নিতে পারি না আমরা? পারি নিশ্চয়ই — অনেকে তা নিয়েও থাকেন, কেননা

সংস্কৃতে 'ধর্ম' শব্দের এক অর্থ যম, এবং মানুষের মধ্যে যেমন যুধিষ্ঠিরকে, তেমনি দেবগণের মধ্যে একমাত্র যমকেই বলা হয়েছে ধর্মরাজ। কালীপ্রসন্নে দেখি, পাণ্ডবগণের জন্মদাতারা একবার 'যমরাজ প্রভৃতি দেবগণ' ব'লে উল্লিখিত হয়েছেন (উদ্যোগ : ৫৯) ; আর্যশাস্ত্র সংস্করণের বঙ্গানুবাদেও বন্ধনীর মধ্যে 'যম' শব্দটি পাওয়া যায় — 'আমি তোমার পিতা অমিতপরাক্রমী ধর্মরাজ (যম)।' ঈষৎ সংশয় জাগে, যখন মূল সংস্কৃতে উভয় স্থলেই পাই 'ধর্ম' — 'যম' নয় — তবে ও-দুটি শব্দকে সমার্থক ব'লে ধ'রে নিলে সমস্যার সমাধান হ'য়ে যায়। কিন্তু ব্যাকরণগত সমাধানে আমাদের রসবোধ তৃপ্ত হ'তে পারে না ; মনে প্রশ্ন জাগে : যাঁকে দেখেছি ঋগ্বেদে ও কঠোপনিষদে ও সাবিত্রী-উপাখ্যানে ভীষণ গম্ভীর সকরুণ এক দেবতা, আর এখন যাঁকে দেখছি এক-পায়-দাঁড়ানো মৎস্যভুক ছলনাপ্রিয় বকপক্ষী — এঁরা দুজন কি অবিকল অভিন্ন হ'তে পারেন ? যুধিষ্ঠির-পিতাকে আকারে-প্রকারে এত বিসদৃশ কেন হ'তে হলো ? আত্মপরিচয়ে 'অমৃদুপরাক্রম' বিশেষণ সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কৃতান্তের কোনো লক্ষণ কেন দেখি না ?

অহং তে জনকস্তাত ধর্মোঽমৃদুপরাক্রম।
ত্বাং দিদৃক্ষুরনুপ্রাপ্তো বিদ্ধি মাং ভরতর্ষভ ॥

(বন : ৩:৪ : ৬)

— বৎস, আমি তোমার পিতা অমৃদুপরাক্রম ধর্ম। আমি তোমারই দর্শনেচ্ছায় এখানে এসেছি। ভরতশ্রেষ্ঠ, আমাকে জ্ঞাত হও।

সিদ্ধান্তবাগীশে প্রথম চরণের পাঠান্তর পাই :

অহং তে জনকস্তাত ধর্মো বীরঃ। সনাতনঃ।

— বৎস বীর, আমি তোমার পিতা, আমি ধর্ম ; আমি সনাতন।

এখানে মনে হয় ধর্মবকের একটি স্বতন্ত্র সত্তা অনুভূত হচ্ছে ; তাঁর সঙ্গে যম-ধর্মের যেন ততটাই তফাৎ, যতটা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে

নচিকেতার। 'আমি ধর্ম, আমি সনাতন —' এখানেও কি ধর্ম' বলতে যমদেবতাকে বুঝতে হবে? কিন্তু সোজাসুজি 'যম' শব্দটি কেন প্রযুক্ত হ'লো না একবারও, সর্বদাই কেন 'ধর্ম' বলা হচ্ছে — আর এই প্রসঙ্গে ধর্মের অন্য ব্যাপকতর এবং যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় অর্থটিকে বর্জন করতেই বা বাধ্য হবো কেন আমরা? আরো প্রশ্ন: কুন্তীর প্রথম ও চতুর্থ পুত্রের জন্মদাতাকে তাঁদের আদিম মহিমায় প্রকাশিত ক'রে, তাঁদেরই সমকক্ষ দক্ষিণ-পতিকে কবি কেন প্রচ্ছন্ন রাখলেন; যমই যদি যুধিষ্ঠিরের জনক, তাহ'লে সেই মহৎ জন্ম এমন সংক্ষেপ ও অনুজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হ'লো কেন?

এ-সব প্রশ্নের ঔচিত্য অস্বীকার করা যায় না, তবু যমের সঙ্গে ধর্মবকের, এবং যুধিষ্ঠিরের, কোনো-এক ধরনের সম্বন্ধ আমরা দেখতে পাই না তাও নয়। অন্তত এটুকু যে যম ও ধর্মবক দু-জনেই আলাপচারী, দু-জনেই পরীক্ষক ও বিচারক। আরো — আর এটা 'অন্তত'র চাইতে অনেকটা বেশী: যে যম ঠিক ধ্বংসের দেবতারূপে কল্পিত হননি, নটরাজ শিবের কোনো বিকল্প তিনি নন:— তিনি নিয়ামক ও ভারসাম্যসাধক, তিনি মানববংশকে সংযত করেন ও শান্ত হ'তে শেখান — তাঁর যম ও শমন নামের মধ্যেই তার পরিচয় আছে। আর সংযম ও শান্তি — তা-ই কি নয় যুধিষ্ঠিরের জীবনব্যাপী সন্ধান, আর তাঁর পিতার কাছে প্রদত্ত উত্তর-সমূহের মধ্যেও তাঁর সেই মর্মাভিলাষ কি বার-বার ব্যক্ত হচ্ছে না? সত্য, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে সুদীর্ঘ সময় লেগেছিলো তাঁর, কিন্তু এখানে অন্তত তাঁর ব্যবহারে আমরা দেখতে পেয়েছি একটি বিশ্বাসপরায়ণ বিনয় — যে-গুণ তাঁর মধ্যে আগে ছিলো না, কিংবা ঠিক এইভাবে ছিলো না। সভাপর্বে আমরা তাঁকে দেখেছি কিছুটা দীনভাবাপন্ন, জরাসন্ধের প্রস্তাব শুনে তিনি ভীত হলেন পাছে

ভীম-অর্জুনের প্রাণহানি ঘটে; কিন্তু এখানে এই হ্রদের প্রান্তে ভ্রাতাদের মৃত ব'লে জেনেও তিনি যে সম্ভ্রমের সুরে ও মেধাবীভাবে প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারলেন আমি এটাকেই বলতে চাই তাঁর বিনয় — ভীরুতা নয়, আত্মস্থতা, সেই বিশেষ চরিত্রশক্তি যা নিয়মের বশ্যতা মেনে নিয়ে আনন্দ পায়, আর তাই সব সত্তার অধিকার বিষয়ে যা শ্রদ্ধাপরায়ণ। যমদেব এক অলঙ্ঘ্য নিয়মের প্রতিমূর্তি, তিনিই পারেন অতর্কিতভাবে দুঃসাহসীকে নিবৃত্ত করতে, এবং কিছুটা তাঁরই ধরনে ধর্মবকও চার অবাধ্য পাণ্ডবকে সংযত করেছিলেন। এ-দিক থেকে ভেবে দেখলে মনে হ'তে পারে যে 'রাজ'-উপাধিহীন যুধিষ্ঠিরজনক ধর্ম — যাঁকে আমরা অন্য কোনোভাবে শনাক্ত করতে পারছি না — তিনি সেই সনাতন বন্ধনকারী ও মুক্তিদাতারই একটি ভিন্নরূপধারী ভাবচ্ছবি[৩৫]।

মহারাষ্ট্রীয় লেখিকা ইরাবতী কার্ভে এ-বিষয়ে একটি বিকল্প প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, এখানে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি[৩৬]। যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত পিতা বিদুর — এ-ই হ'লো তাঁর অনুমান; এবং এটি শোনামাত্র আমাদেরও চমক লাগে, মনে হয় এটা সত্য হ'লেও হ'তে পারতো: কেননা বিদুর-যুধিষ্ঠিরের চরিত্রগত সাদৃশ্য বিষয়ে আমরা সকলেই অবহিত আছি এবং এ-দুজনের মধ্যে একটি স্বল্পোচ্চারিত কিন্তু গভীর সংযোগ মহাভারতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে। শ্রীমতী কার্ভের যুক্তিগুলিও ভেবে দেখবার মতো: প্রথম, বিদুর কুন্তীর দেবর, অতএব নিয়োগের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী; দ্বিতীয়, অণীমাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্মরাজ (যম?) শূদ্রযোনিতে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন[৩৭] (আদি: ১০৮); তৃতীয়, মৃত্যুর পূর্বে বিদুর তাঁর সমস্ত প্রাণশক্তি ও আত্মাকে যুধিষ্ঠিরের দেহে সঞ্চালিত ক'রে দেন (আশ্রমবাসিক: ২৬) — আর এটা হ'লো (শ্রীমতী কার্ভে আমাদের জানিয়েছেন) মুমূর্ষু পিতার পক্ষে পুত্রের প্রতি

আচরণীয় একটি উপনিষদুক্ত সংস্কার (কোন উপনিষদে, লেখিকা তা বলেননি[৩৮]); এবং চতুর্থ — আর এটাই লেখিকার সপক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি — বিদুরের তিরোধানের অব্যবহিত পরে ব্যাসদেব এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন যে বিদুর ধর্ম নামে 'কবিদের দ্বারা কথিত, এবং ঐ শম-দমাদি গুণসম্পন্ন মহাত্মাই যোগবলে' যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করেছিলেন। শ্রীমতী কার্ভের অনুমিতিটি মনোরম তাতে সন্দেহ নেই, আমাদের কল্পনা কিছুক্ষণ খেলা করতে পারে তা নিয়ে, এমনকি বিদুর-কুন্তীর গোপন প্রণয় অবলম্বন ক'রে একটি সুন্দর নাট্যরচনার সম্ভাবনাও আমাদের মনে প্রতিভাত হয়; পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের তেরো বছর কুন্তী যে হস্তিনাপুরে বিদুরের গৃহে কাটিয়েছিলেন, এর মধ্যে প্রণয়স্মৃতির অনুরঞ্জন দেখাও কোনো আধুনিক কবির পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু কল্পনাবিলাসের প্রথম কয়েকটি সুখকর মুহূর্ত কেটে যাবার পরেই বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের আক্রমণ করে। কুন্তীর অন্য তিন পুত্র দেববীজোদ্ভূত — নগণ্য মাদ্রীতনয়েরাও তা-ই — এই অবস্থায় যিনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যুধিষ্ঠির যদি মনুষ্যপুত্র হতেন, তাহ'লে সেটা হ'তো সমগ্র মহাভারতের পক্ষে একটি দূরপ্রসারী-ইঙ্গিতপূর্ণ প্রধান ঘটনা — কাহিনীবিন্যাসের দিক থেকে সেটাকে গোপন রাখা কোনমতেই সম্ভব হ'তো না, ধ'রে নেয়া যায় কর্ণের জন্মকথার মতোই সেটা উল্লিখিত ও বর্ণিত হ'তো বহুবার, একবার হয়তো কুন্তীর মুখেই আমরা তার বিবরণ শুনতাম। ব্যাসদেবের প্রতি অম্বিকা অম্বালিকার তীব্র অরতির কথা মনে রাখলে এও অসম্ভব ব'লে মনে হয় যে শুদ্ধশোণিতা ক্ষত্ররমণী কুন্তী — যিনি চাইলেই যে-কোনো দেবতার অঙ্কশায়িনী হ'তে পারেন — তিনি পুত্রোৎপাদনের জন্য (এবং শুধুমাত্র সেই কারণে) আহ্বান করবেন তাঁর শূদ্রযোনিজাত 'ক্ষত্তা' দেবরকে, যিনি পদমর্যাদায় সূত সঞ্জয়ের মতোই অবনত। যুধিষ্ঠিরকে বিদুর

'যোগবলে' উৎপন্ন করেছিলেন — এই উক্তির পরেই ব্যস আবার বলেন, 'যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর, যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির' ('যো হি ধর্মঃ স বিদুরো বিদুরো যঃ স পাণ্ডবঃ'); এবং এই দুটো উক্তি মিলিয়ে দেখলে এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। পরাশর ও ব্যাসদেবের মতো মহর্ষিরা, এমনকি সূর্যাদি দেবগণও যখন প্রকৃতিসম্মত যৌন উপায়েই নারীর গর্ভে সন্তানের সঞ্চার করেছিলেন, তখন হঠাৎ বিদুর কেন যোগবল ব্যবহার করবেন তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, পিতা ও পুত্র এক ব্যক্তি হ'তে পারেন না, এ কথাও স্পষ্ট। ব্যাসের এই কথাগুলো আমাদের কানে হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে; কিন্তু আসলে তিনি হয়তো বিদুর-যুধিষ্ঠিরের মধ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধের ইঙ্গিত করেননি — শুধু বলতে চেয়েছেন যে উভয়েই ধর্মাত্মা, উভয়েই মূর্তিমান সাধুতা ও সদাচার — এবং এটা তথ্য হিসেবে আমরা অনেক আগে থেকেই জেনে আসছি। ধর্মাচরণই এ দু'জনের মধ্যে সংযোগসূত্র; স্বর্গারোহণপর্বে এ-কথাও বলা আছে যে এঁরা দু-জনে—এবং সমস্ত কৌরবপাণ্ডবের মধ্যে শুধু এঁরাই — ধর্মের শরীরে লীন হ'য়ে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে লৌকিক সম্পর্ক যদিও খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের, আত্মিক অর্থে এঁদের দুই ভ্রাতা বললে ভুল হয় না।

কিন্তু পুঁথি খুঁড়ে-খুঁড়ে অনুপুঙ্খ-উদ্ধারের কোন প্রয়োজন নেই, অন্য এক জাজ্বল্যমান কারণে বিদুর-যুধিষ্ঠিরকে পিতা-পুত্ররূপে গ্রহণ করতে আমরা কিছুতেই পারি না। কেননা যুধিষ্ঠিরের পিতৃপদ থেকে ধর্মকে বিচ্যুত করলে মহাভারতের একটি ভিত্তি-প্রস্তর সরিয়ে নেয়া হয়, ধ্বসে পড়ে সেই বিরাট অট্টালিকা, যা ধর্মবকের ঘটনা থেকে — সত্যি বলতে, নহুষ-যুধিষ্ঠির সংলাপ থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে-ধীরে গ'ড়ে তুলেছেন কবিরা, এবং যার উচ্চতম

শিখরদেশে যুধিষ্ঠিরের কুক্কুরচিহ্নিত জয়ধ্বজাটি উড্ডীন। যুধিষ্ঠির বিদুরের পুত্র হ'লে সমগ্র মহাভারতকে হ'তে হ'তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গ্রন্থ — এমন বহু অংশ স্থান পেতে পারতো না যার উপর আমাদের পরিচিত মহাভারতের মহনীয়তা নির্ভর ক'রে আছে। আমাদের মেনে নিতে হবে যে যুধিষ্ঠিরের পিতা এক দেবতা, এবং তাঁর নাম ধর্ম — হ'তে পাবে তিনি সংশয়াচ্ছন্ন ও রহস্যময়, যমদেব ও মানবিক ধর্মনীতির মিশ্রণে রচিত এক অনির্দেশ্য সত্তা — তবু দেবতা তাতে সন্দেহ নেই, পুত্র বিষয়ে সস্নেহ ও পরীক্ষণশীল, তাতে সন্দেহ নেই। 'অহং তে জনকস্তাত —' তাঁর মুখের এই কথাটি অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

এখানে মনে প'ড়ে যায় অন্য এক দেবতাও একবার তাঁর পুত্রকে পরীক্ষা করেছিলেন, অথবা বলা যাক পুত্রকে তাঁর নেপথ্যচারী পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হয়েছিলো। ইন্দ্র অবিরল বারিবর্ষণ করলেন, তবু অর্জুনের বাণে দগ্ধ হ'লো খাণ্ডববন, এবং পুত্রের হাতে এই পরাজয়ে বজ্রদেবতা হৃষ্ট হলেন। লক্ষণীয়, বনপর্বের শেষ ঘটনা যেমন বক-যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তর, তেমনি আদিপর্বেও খাণ্ডবদাহন অন্তিম। এই সংস্থাপনা আশ্চর্যভাবে যথোচিত, কেননা এই দুটি ঘটনার মায়াদর্পণে মহাভারতের পরবর্তী সব পরিণতি বিম্বিত হচ্ছে। খাণ্ডবদাহন উপলক্ষেই অর্জুন প্রদত্ত হলেন তাঁর গাণ্ডীবধনু, ধর্মবকের সঙ্গে সংলাপকালেই যুধিষ্ঠির প্রথম নিজেকে চিনতে পারলেন। বিভিন্নভাবে প্রণোদিত এই দুই ভ্রাতার মধ্যে মানুষের দুটি মৌলিক বৃত্তি বিধৃত হ'য়ে আছে: একদিকে সে জিগীষামত্ত আক্রমণকারী, অন্যদিকে সে মিলনপ্রয়াসী, স্বীকরণসাধক।

৩২। যদি না আমরা ধ'রে নিই যে সভাপর্বে ধর্মই স্নেহবশত পুত্রবধূকে দুঃশাসনের ব্যভিচার থেকে ত্রাণ করেছিলেন (অ: ৬৬)। মূলে আছে:

'ততস্তু ধর্মোঽন্তরিতো মহাত্মা সমাবৃণোদ্ বৈ বিবিধৈঃ সুবস্ত্রৈঃ — মহাত্মা ধর্ম অন্তরাল থেকে [দ্রৌপদীকে] বহু প্রকার সুন্দর বসনে আবৃত করতে লাগলেন।' 'মহাত্মা' বিশেষণ দিয়ে বোঝানো হ'লো যে ধর্ম এখানে নির্বস্তুক সুনীতি নয়, কোনো রূপগ্রাহী দেবতা, কিন্তু দ্রৌপদী তখন স্মরণ করেছেন কৃষ্ণকে আর কৃষ্ণ মনে-মনে তাঁর কাতরোক্তি শুনতে পেয়ে চঞ্চল হ'য়েছেন — অতএব 'মহাত্মা ধর্ম' বলতে এখানে কৃষ্ণকে বোঝাবারও বাধা নেই।

৩৩। পাণ্ডু কুন্তীকে বলছেন : 'ইন্দ্রো হি রাজা দেবানাং প্রধান ইতি নঃ শ্রুতম — আমরা শুনেছি ইন্দ্রই দেবগণের রাজা ও তাঁদের মধ্যে প্রধান।' এই 'শুনেছি' থেকেই বোঝা যায় বেদ ততদিনে হিন্দুর জীবন থেকে কত দূরে স'রে গিয়েছে।

৩৪। *Hindu Polytheism*: Alain Daniélou, Pantheon Books, Bollingen Series, New York, সং ১৯৬৪, পৃ ৩৬, ৮৬, ৩১২ দ্র।

৩৫। লক্ষণীয়, যম-সাবিত্রী সংলাপ ও বক-যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তরে কোনো-কোনো অংশে সাদৃশ্য আছে। বকের প্রথম প্রশ্নটি ধরা যাক :

—'কে সূর্যকে উন্নত করেন, তাঁর চারদিকে বিচরণশীল কারা, কে তাঁকে অস্তমিত করেন, এবং তাঁর প্রতিষ্ঠাই বা কোথায়?'

যুধিষ্ঠিরের উত্তর :

—'ব্রহ্ম সূর্যকে উদিত করেন, তাঁর চারদিকে দেবগণ বিচরণশীল, ধর্ম তাঁকে অস্তমিত করেন, সত্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠা।'

যমের প্রতি সাবিত্রীর একটি উক্তি :

সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্যং
সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।

'সাধুজনেরাই সত্যের দ্বারা সূর্যকে চালিত করেন, সাধুজনেরাই তপস্যাদ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করেন।'

সূর্যের উদয়াস্তের মধ্যে যে-নিয়ম দৃষ্ট হয়, যুধিষ্ঠির তাকেই বলছেন ব্রহ্ম বা ধর্ম, কিন্তু শুধু সেটুকুই তাঁর বক্তব্য নয় — তাঁর 'সত্য' শব্দের ব্যবহারে

ধ্বনিত হচ্ছে যে প্রাকৃতিক নিয়মকে মানুষের জীবনে প্রয়োগ করাও তাঁর অভিপ্রায়। এই কথাটাই সাবিত্রী আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, তাঁর বিচারে যুধিষ্ঠির-কথিত 'সত্য' মানুষের সাধুতা ছাড়া আর-কিছু নয়; যদি সত্য বা সাধুতাই হয় মানবিক নিয়ম, আর মানবিক নিয়মের অধীশ্বর হন ধর্মদেব — তাঁর 'ধর্মবাজ' অভিধায় সেটাই সূচিত হচ্ছে — তাহ'লে এখানেও সাবিত্রীর বরদাতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষকের একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাবিত্রী ও যুধিষ্ঠির দু জনেই কঠোপনিষদের প্রতিধ্বনি করছেন :

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ (২ : ১ : ৯)

—'যা থেকে সূর্য উদিত হন এবং যাঁর মধ্যে তিনি অস্ত যান, তাঁরই অন্তরে সব দেবতা প্রবিষ্ট হ'য়ে আছেন। তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। ইনিই তিনি (ব্রহ্ম)।' ধারণাটির উৎস আরো পুরাতন; ঋগ্বেদ ১০ : ৮৫তে বলা হয়েছে : 'সত্যই পৃথিবীকে উত্তোলিত ক'রে রেখেছেন, সূর্য স্বর্গকে উত্তোলিত ক'রে রেখেছেন, সত্যনিয়মে ("ঋতপ্রভাবে") আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত ও সোমদেব সেই স্থানে আশ্রিত আছেন।'

৩৬। *Yuganta : The End of an Epoch* · Irawati Karve, দেশমুখ প্রকাশন, পুনা, ১৯৬৯, পৃ ১০০-১০৩ দ্র। বলা দরকার, যুধিষ্ঠির-বিদুর সম্পর্কে তাঁর আলোচনার জন্য শ্রীমতী কার্ভে কোনো প্রামাণিকতা দাবি করেননি; গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠায় যমদেবকেই বলেছেন যুধিষ্ঠির-জনক।

৩৭। বিদুরের জন্মকথাও মহাভারতে অনিশ্চিত। কালীপ্রসন্নে বিদুর একবার অত্রিমুনির পুত্ররূপে কথিত হয়েছেন (আদি : ৬৭), কিন্তু নীলকণ্ঠের মতে 'অত্রিশব্দেন সূর্যো গৃহ্যতে, তস্য পুত্রং ধর্মং বিদুরং বিদ্ধি — "অত্রি" শব্দের অর্থ [এখানে] সূর্য, ধর্ম [-রূপী] বিদুর তাঁরই পুত্র।' আর্যশাস্ত্রের পাদটীকায় বৈকল্পিক পাঠ 'বিদুরং বিদ্ধি লোকেঽস্মিন্ ধর্মং ধর্মভৃতাং বরম্ — বিদুরকে এই জগতে ধর্মধারক ধর্ম ব'লে জানবে।' বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আরো

৬

বাড়িয়ে দিয়ে আর্যশাস্ত্রের অনুবাদে বিদুরকে আবার বলা হয়েছে 'সূর্যের পুত্র ধর্ম (যম)।' যিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র সেই অত্রি কেমন ক'রে সূর্যের সঙ্গে শনাক্ত হ'তে পারেন, বা সূর্যের পুত্রকে ধর্ম বলা হ'লো কোন পুরাণ বা প্রবচন অনুসারে, এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাইনি, তার প্রয়োজনও তেমন জরুরি নয়। এই রকম গোলযোগের স্থলে বিদুরকে ব্যাসের ঔরসজাত দাসীপুত্র ব'লে ধরে নেয়াই সমীচীন, এবং মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে সেই ভূমিকাতেই তিনি অবতীর্ণ। যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই তাঁকে 'ক্ষত্তা' (বর্ণসংকর) ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকেন, আর ভীষ্ম বিদুরের বিবাহ দেন একটি সুনির্বাচিত পারশবী কন্যার সঙ্গে (আদি: ১৪৪)। ('পারশবা' অর্থ শূদ্রাণীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণপুত্রী।)

৩৮। এই অধুনাবিস্মৃত অনুষ্ঠানটির নাম পিতাপুত্রীয় সম্প্রত্তি বা সম্প্রদান; বৃহদারণ্যক ১ : ৫ : ১৭তে এর উল্লেখ আছে, আর কৌষীতকির দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণনা। কৌষীতকি অনুসারে ব্যাপারটা এই রকম :

পিতার মৃত্যুকাল আসন্ন হ'লে তিনি পুত্রকে ডেকে পাঠান; মাল্যে ও নববস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে পুত্র এসে পিতার উপরে শুয়ে পড়ে (অথবা তাঁর মুখোমুখি উপবিষ্ট হয়)। 'ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় স্পর্শ ক'রে' পিতা বলেন: 'বাচং মে ত্বয়ি দধানি চক্ষুর্মে ত্বয়ি দধানি শ্রোত্রং মে ত্বয়ি দধানি ··· তোমাতেই ধারণ করি আমার বাক, চক্ষু, শ্রুতি ···' এমনি পর্যায়ক্রমে কাম কর্ম সুখ দুঃখ অন্ন প্রজ্ঞা পর্যন্ত; আর পুত্র উত্তরে ব'লে যায়, 'তোমার বাক, চক্ষু, শ্রুতি,··· প্রজ্ঞা আমি ধারণ করি।' অথবা, পিতা যদি অধিক বাক্যব্যয়ে অসমর্থ হন তাহ'লে শুধু 'প্রাণান্মে ত্বয়ি দধানি' বলাই যথেষ্ট। 'তোমার প্রাণ (প্রাণবায়ুসমূহ) আমি ধারণ করি', ব'লে পুত্র প্রদক্ষিণ করবে পিতাকে, তাঁকে জানাবে পরলোকের জন্য শুভেচ্ছা। এই অনুষ্ঠান সমাপনের পর পিতা আরোগ্যলাভ করলেও সংসারজীবনে আর ফিরতে পারবেন না — তিনি প্রব্রজ্যায় যাবেন, অথবা তাঁকে পুত্রের আশ্রয়ে নিষ্ক্রিয় অতিথির মতো থাকতে হবে।

১০ : আগুন-জলের গল্প

খাণ্ডবদাহনের উপরিস্তরগত অর্থটি খুব স্পষ্ট। নগরনির্মাণের জন্য অরণ্য ধ্বংস করা হ'লো, বৃক্ষ ও পক্ষীনাগাদির শ্মশানভূমির উপর সগর্বে উঠলো নতুন রাজধানী — একে বলা যায় মানবেতিহাসের একটি প্রধান পদক্ষেপ, বলা যায় বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার অভিযান। নতুন রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন খাণ্ডববাসী দানব-স্থপতি ময়, অর্জুন ও কৃষ্ণ যাঁকে দয়া ক'রে প্রাণভিক্ষা দেন — এই ঘটনাটিও বিজয়ী যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের অনুবর্তী। কিন্তু খাণ্ডবদাহন শুধু একটি সাময়িক বা রাজনৈতিক কীর্তি নয়, এর স্তরে-স্তরে আরো অনেক অর্থ লুকিয়ে আছে, একটি বৈশ্বিক পটভূমির উপর এর প্রতিষ্ঠা। তা বোঝার জন্য পুরো ইতিহাসটি মনে আনা দরকার।

এক বছর আগে সুভদ্রাহরণ ঘ'টে গেছে, অভিমন্যুর জন্ম হয়েছে সম্প্রতি : নববধূ সুভদ্রাকে নিয়ে সেই যে কৃষ্ণ ও অন্যান্য বার্ষ্ণেয়রা খাণ্ডবপ্রস্থে এসেছিলেন, তাঁরা এখনো ফিরে যাননি। একদিন গ্রীষ্মতাপ প্রখর হ'লো, কৃষ্ণ ও অর্জুন এলেন সপরিবারে ও সবান্ধবে যমুনার তটে — যুধিষ্ঠির তাঁদের সঙ্গ নিলেন না। সেখানে রাজকীয় উৎসব হ'লো দিনমানব্যাপী ; দ্রৌপদী ও সুভদ্রা 'মদোৎকট' অবস্থায় (আর হয়তো পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে) বিস্তর বস্ত্রালংকার দান করলেন ; মদবিহ্বলা নিতম্বিনী স্তনবতীরা মেতে উঠলেন যথেচ্ছভাবে নৃত্যে গীতে হাস্যে পরিহাসে জলক্রীড়ায়[৩৯], বেণু বীণা মৃদঙ্গের রবে উপবন মুখর হ'য়ে উঠলো। এরই মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জুন যখন নিভৃতে ব'সে বিশ্রম্ভালাপ করছেন, তখন তাঁদের সামনে — মূর্তিমান তিরস্কারের মতো — আবির্ভূত হ'লো নিদাঘরৌদ্রের চেয়েও প্রখরতর এক উত্তাপ, পৃথিবীর সব উত্তাপের উৎস — তেজঃপুঞ্জ এক

ব্রাহ্মণের রূপে স্বয়ং অগ্নিদেব এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখামাত্র দুই বন্ধুর তন্দ্রা ছুটে গেলো।

অগ্নি একটি কৌতুকজনক কাহিনী শোনালেন। রাজা শ্বেতকির যজ্ঞে বারো বছর ধ'রে ঘৃতপান ক'রে তিনি রুগ্ন হ'য়ে পড়েছেন; ব্রহ্মা বলেছেন প্রচুর পশুমেদভোজনই তাঁর আরোগ্যের উপায় এবং সেই পথ্য খাণ্ডববনে প্রাপ্তব্য। কিন্তু খাণ্ডববন ইন্দ্রের দ্বারা রক্ষিত, তাঁর সখা তক্ষকের সেটি বাসভূমি; অগ্নির সব চেষ্টা তাই ব্যর্থ হ'লো। সাতবার সেখানে প্রজ্বলিত হলেন হুতাশন, বজ্রধর বৃষ্টি নামিয়ে তাঁকে সাতবারই নির্বাপিত করলেন। অগত্যা, এবারেও পিতামহের নির্দেশ-মতো, তিনি অভীষ্টলাভের জন্য অর্জুন ও কৃষ্ণের সাহায্য চাইতে এসেছেন।

পরবর্তী অংশে তিনটি স্তর দেখা যায়: পুত্রের সঙ্গে পিতার প্রতিযোগিতা, মানুষের হাতে প্রকৃতির পরাজয়, আর — সর্বোপরি বা সকলের তলায় — জল এবং আগুনের যুদ্ধ।

এই যুদ্ধ ইলিয়াডেও বর্ণিত হয়েছে — নদীর সঙ্গে আকিলেউসের সংগ্রাম ঐ কাব্যের একটি স্মরণীয় ঘটনা (সর্গ : ২১)। হেক্তোরের হাতে পাত্রোক্লস তখন হত; বন্ধুকে হারাবার পর আকিলেউস তাঁর অভিমান ভুলে যুদ্ধলালসায় উন্মাদ হ'য়ে উঠেছেন, তাঁর জন্য নতুন রণসজ্জা তৈরি ক'রে দিয়েছেন স্বয়ং খঞ্জ দেবতা হেফাইস্তস — আমাদের ভাষায় যাঁর নাম বিশ্বকর্মা। সেই বিশাল ঢাল, সেই উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ও পাদুকা, যা রচনার জন্য হেফাইস্তসকে দশটি চুল্লি জ্বালাতে হয়েছিলো এবং যা ধারণ ক'রে আকিলেউস হ'য়ে উঠলেন অগ্নির মতোই জ্বলন্ত ও দুর্দম — সেই দেবদত্ত সম্পন্নতা সত্ত্বেও নদীর কাছে তাঁর প্রায় ঘটেছিলো পরাজয়। কেননা নদীও দেবতা (গ্রীক মতে নদীরা পুরুষজাতীয়, তাঁরা মানবীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনও ক'রে থাকেন) — আর বিশেষত স্কামান্দ্রস নদী, যাঁর তীরবর্তী ট্রয় এক পুণ্যভূমি —

তিনি নিজেও জেয়ুস-পুত্র ব'লে কথিত, তাঁর উদ্দেশেও বৃষবলি অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আকিলেউসের ক্রোধ ছড়িয়ে পড়লো সেই ঘূর্ণিবহুল রজতবর্ণ নদী পর্যন্ত, তিনি তাঁকে তীক্ষ্ণ ভাষায় ব্যঙ্গ করতে লাগলেন বার-বার, এক নদী-পৌত্রকে নিধন ক'রে নিখিলসলিলের অসম্মান ঘটালেন। এমনিতেই অসন্তুষ্ট ছিলেন স্কামান্দ্রস, এই নির্বিচার যুবহত্যায় অসুখী — এদিকে নিক্ষিপ্ত শবরাশির চাপে তাঁর স্রোত রুদ্ধ হ'য়ে আসছে — এইবার নরমূর্তি নিয়ে তিনি বেদনাময় প্রতিবাদ জানালেন, প্রার্থনা পাঠালেন ট্রয়বান্ধব আপোলোর উদ্দেশে। সেই প্রার্থনা কানে শোনামাত্র আকিলেউস ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীর জলে : তাঁর প্রতিশোধ চাই। কিন্তু স্কামান্দ্রস আহ্বান করলেন তাঁর ভ্রাতা সিমোয়ীসকে; দুই নদীর সম্মিলিত ও পরিস্ফীত প্লাবনের মধ্যে, তাঁর সব দ্রুতি ও দক্ষতা নিয়েও, আকিলেউস বাঁচাতে পারলেন না নিজেকে, ব্যাদিতমুখ নদীদেবতা তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। এর পরেই যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে গেলো, রোষাগ্নি রূপান্তরিত হ'লো আক্ষরিক অর্থে অগ্নিকাণ্ডে, আকিলেউসের যুদ্ধ হেফাইস্তস তাঁর নিজের হাতে তুলে নিলেন। তাঁর ফুৎকারে জ্ব'লে উঠলো আগুন—লেলিহান, সুবিস্তীর্ণ — দগ্ধ হ'লো শবপুঞ্জ ও প্রান্তর, আর নদীতীরবর্তী সুন্দর বৃক্ষসমূহ, আর জলজ সব ফুল ও তৃণপল্লব। এমনকি, জলের তলায় যে-মাছেরা নিশ্চিন্তে খেলা করে তারাও বিদ্ধ হ'লো এই উত্তাপে, নদীর সর্বাঙ্গে বুদ্বুদ উঠতে লাগলো—যেমন ওঠে 'রন্ধনকালীন শূকরের চর্বিতে', ঠিক তেমনি। অর্থাৎ যা কখনো ঘটে না তা-ই ঘটলো সেদিন : আগুনে দগ্ধ হ'লো জল।

দুটি কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু এক, কিছু অনুপুঙ্খগত সাদৃশ্যও চোখে পড়ে[৪০] — তবু উপলক্ষে ও উদ্দেশ্যে এরা ভিন্ন, পরিপ্রেক্ষিতেও আলাদা। হোমারে দেখি, বীর আকিলেউসও দৈব দয়া বিনা অসহায়; কিন্তু খাণ্ডবদাহনের মানুষের ভূমিকা অনেক বড়ো, দেবতাই মানুষের

সাহায্যপ্রার্থী। হেফাইস্তসের আগুন যতক্ষণ জ্বলছে, ততক্ষণ আকিলেউস একবারও উল্লিখিত হলেন না; যুদ্ধ চললো নিছক দুই দেবতার মধ্যে — এক পক্ষ এত বেশি প্রবল যে দৃশ্যটি আমরা নির্লিপ্তভাবে দেখতে পারি, জয়-পরাজয়সংক্রান্ত কোনো উৎকণ্ঠা অনুভব করি না। কিন্তু খাণ্ডবদাহনে প্রতিদ্বন্দ্বীরা সমকক্ষ, এবং যুদ্ধ আরো নিদারুণ ও আমাদের পক্ষে অনেক বেশি ব্যঞ্জনাময়। অগ্নি তাঁর সপ্তশিখা মেলে খাণ্ডববন বেষ্টন ক'রে আছেন, পনেরো দিন ধরে ভোজন করছেন/জ্বলদর্চি-জিহ্বায় অবিরাম তাঁর বাঞ্ছিত পশুমেদ — এদিকে রথে ঘুরে-ঘুরে নিরন্তর শরবর্ষণ করছেন অর্জুন — ধাবমান বা উড্ডীন প্রাণীরা কোনোমতেই পালাতে পারছে না, লুটিয়ে পড়ছে দগ্ধ অথবা বাণবিদ্ধ, জলাশয়গুলি শুকিয়ে যাবার জন্য মৎস্য কূর্মেরাও প্রাণত্যাগ করছে, চারদিকে উঠছে আর্তনাদ ও ক্রন্দনরোল : এই দৃশ্য — যেহেতু এখানে কর্তা শুধু দেবতা নন, মানুষও — এই দৃশ্যে আমরা মানুষিক শক্তিমত্তারই একটি চরম রূপ যেন দেখতে পাই। তারপর ক্রমশ আরো দৃপ্ত হ'য়ে ওঠে মানুষ; অগ্নি যেমন ইন্দ্রের বৃষ্টিকে মধ্য-পথেই শুকিয়ে দিচ্ছেন, তেমনি অর্জুনের বাণে পুঞ্জমেঘ ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে; আর অবশেষে যখন ইন্দ্রের সপক্ষে যোগ দিলেন অন্য দেবতারা, এদিকে কৃষ্ণের হাতে সুদর্শনচক্র প্রখর হ'য়ে উঠলো — তখন যে কৃষ্ণ ও অর্জুন মিলে সব দেবতার যৌথ চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিলেন — দিতে পারলেন — তাতেও মানুষের জন্য অভিনন্দন ধ্বনিত হ'লো। আমি ভুলে যাচ্ছি না যে কৃষ্ণার্জুন এখানে 'নরনারায়ণ' ব'লে উল্লিখিত হয়েছেন, কৃষ্ণের দেবত্ব বিষয়েও ইঙ্গিত আছে; কিন্তু রঙ্গভূমিতে তাঁরা মর্ত্য মানুষ ছাড়া আর-কিছু নন — মহাযোদ্ধা, অক্লান্তকর্মা — উগ্র, উদ্ধত, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় : এর বেশি কার্যত এঁদের পরিচয় নেই। আর সেই পরিচয়ের প্রবক্তারূপে অগ্নি এখানে প্রথম থেকে উপস্থিত। তাঁরা গিয়েছিলেন গ্রীষ্মতাপ এড়াবার জন্য জলবিহারে, স্থানীয়

আর্দ্রতার স্পর্শে হয়তো কিছুটা ঝিমিয়েও পড়েছিলেন ; কিন্তু অগ্নি এসে জ্বলন্ত ক'রে তুললেন তাঁদের, তাঁদের চিরসঞ্চিত বারুদগন্ধকে নিক্ষেপ করলেন স্ফুলিঙ্গ, জলের বিরুদ্ধে আগুনের যুদ্ধ সেখানেই ঘোষিত হ'য়ে গেলো। বৃষ্টির বিরুদ্ধে দাবানল, শান্তিজলের বিরুদ্ধে রণাগ্নি, নিম্নগামী স্নিগ্ধতার বিরুদ্ধে উত্তপ্ত ও আরোহমাণ উচ্চাভিলাষ, বিভেদহীন স্রোতের বিরুদ্ধে বিচ্ছেদপ্রবণ সংগ্রামলিপ্সা : যা প্রাকৃত, এবং যা মানুষের চিত্তবৃত্তিগত — এই আগুন-জলের দ্বন্দ্বের মধ্যে সেই সবই সংগৃহীত হয়েছে। হোমারেও তা-ই ; এবং উভয় কাব্যেই রণরক্তিম অগ্নিদেবতা জয়ী হলেন — সেটা তখনকার মতো অনিবার্য ছিলো, কেননা হোমারে মহাযুদ্ধ চলছে, আর খাণ্ডবদাহন এক মহাযুদ্ধের মুখবন্ধ[৪১]।

কিন্তু একটি প্রশ্ন এখনো বাকি র'য়ে গেলো। যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা : প্রকৃতির এক শক্তির সঙ্গে অন্য শক্তির, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে দেবতার — যেদিক থেকেই আমরা দেখি না কেন, খাণ্ডবদাহন কি তারই একটি চিত্রকল্প শুধু? কথাটা আরো সরল ক'রে বলা যাক : ইন্দ্র ও অগ্নির বিরোধ কি সনাতন? সত্যি কি জল ও আগুন ক্ষমাহীনভাবে স্বভাবশত্রু? হোমারে দেখছি তাঁরা শেষ পর্যন্ত এক ধরনের আপোশে পৌঁছলেন : নির্যাতন সইতে না-পেরে স্কামান্দ্রস নদী কথা দিলেন যে ভবিষ্যতে আর কখনো তিনি ট্রয়-পক্ষপাতী কোনো কাজ করবেন না ; আর বজ্রধর, তাঁর বন্ধু তক্ষকের প্রাণ বাঁচিয়ে, সর্বভুক অগ্নির জিহ্বায় সমর্পণ করলেন খাণ্ডববন। যাকে বলে রাজনৈতিক চুক্তি, এগুলো হ'লো তা-ই — এর দ্বারা যুদ্ধবিরতি ঘটানো যায় মাঝে-মাঝে, কিন্তু বিরোধভঞ্জন কখনোই সম্ভব হয় না। মহাভারতের কবির দৃষ্টি আরো দূরে প্রসারিত হয়েছিলো ; আগুন ও' জলের এই বৈরিতার মধ্যে একটি মৌলিক মৈত্রীও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

খাণ্ডবদাহনের প্রস্তুতিস্বরূপ অর্জুন দত্ত হলেন তাঁর গাণ্ডীবধনু, এই কথাটা সর্বজনবিদিত; কিন্তু কেমন ক'রে সেটি সংগৃহীত হ'লো, তা আমাদের সব সময় মনে থাকে না। আশা করা যেতো, আকিলেউসের ঢালনির্মাতা হেফাইস্তসের মতো অগ্নি তাঁর নিজেরই তেজে তা উৎপন্ন করবেন, কিন্তু তাঁকে সাহায্য নিতে হ'লো অন্য এক দেবতার — এবার আর ব্রহ্মার নয়, 'চতুর্থ লোকপাল' বরুণের। আর বরুণ, অগ্নির অনুরোধ শোনামাত্র, তাঁর ভাণ্ডার থেকে এনে দিলেন যা-কিছু ছিলো অগ্নি অথবা অর্জুনের প্রার্থনীয়। শুধু গাণ্ডীব নয়, সেইসঙ্গে দুটি অক্ষয়তূণ, উপরন্তু বিশ্বকর্মা-রচিত দিব্যরথ — জয়সিদ্ধ আশ্চর্য সব যুদ্ধোপকরণ, কুরুক্ষেত্রে যাদের বিরাট ভূমিকা আমরা দেখতে পাবো: সেই সবই বরুণের দান অর্জুনকে, অথবা অগ্নি-বরুণের যৌথ উপহার — কেননা অগ্নির মধ্যস্থতা ছাড়া অর্জুনের তা পাবার কোনো উপায় ছিলো না। এবং বরুণ এখানে ঋগ্বেদোক্ত দ্যুলোক-পৃথিবীর সম্রাট নন, নন গ্রীক আকাশ-দেবতা উরানস-এর আত্মীয় — তিনি এখানে সেই শক্তিরই প্রতিভূ, যার বিরুদ্ধে অগ্নি-অর্জুনের অভিযান[৪২]। জলের সঙ্গে আগুনের যুদ্ধে জলেশ্বরই সহকারী, এটা কৌতুকের মতো শোনাতে পারে, কিন্তু এই একটি ইঙ্গিতেই এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়া হ'লো। যারা বিরুদ্ধাচারী তারাই আবার নিগূঢ়ভাবে সংযুক্ত; যেখানে প্রতিযোগিতা তীব্রতম, সেখানেই সহযোগিতা সবচেয়ে গভীর — খাণ্ডবদাহনের সব ভীষণতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির এই রহস্যটিও উদঘাটিত হয়েছে। অর্জুন তা বোঝেননি, কৃষ্ণ হয়তো বুঝেও বোঝেননি; তাঁরা ময়দানবকে গ্রেপ্তার ক'রে তাঁদের বিজয়পতাকা আরো ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছিলেন — তাঁদের পক্ষে সেটাই ছিলো সময়োচিত যোগ্য আচরণ। যুধিষ্ঠির ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাঁর স্বজ্ঞার দ্বারাই এই দ্বন্দ্বনিহিত মিলনের কথাটি বুঝে নিয়েছিলেন।

বনপর্বে ক্রোধ ও অক্রোধ বিষয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের একটি দীর্ঘ বিতর্ক আছে। বলি-প্রহ্লাদের নজির দেখিয়ে দ্রৌপদী প্রমাণ করলেন যে বিরতিহীন ক্রোধ যেমন অশুভ, নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমাও তেমনি অনিষ্টসাধক (অ: ২৮)। উত্তরে যুধিষ্ঠির, তাত্ত্বিক দিক থেকে দ্রৌপদীর কথা মেনে নিয়েও (অ: ২৯), আস্তে-আস্তে ক্ষমার দিকে পাল্লা ভারি ক'রে তুললেন, কেননা 'হিংসার উত্তরে সর্বদা হিংসা করলে জগৎ বিনষ্ট হ'য়ে যায়।' স্বমতের সমর্থনে একটি অসাধারণ যুক্তি দিলেন তিনি: 'ভেবে দ্যাখো — প্রজাদের জন্মের কারণই সন্ধি।' কথাটা শুনতে খুব সহজ ও সরল হ'লেও প্রসঙ্গের পক্ষে গভীরভাবে অর্থবহ। সন্ধি, যোজনা, মিলন — এবং দুই বিরুদ্ধ শক্তিব মিলন: খাণ্ডবদাহনের বরুণ-অগ্নির ঘটনাটিকেই একটি সূত্রের আকারে বাঁধা হ'লো যেন। নারীর গর্ভে জল, পুরুষের বীর্যে আগুন — এদেরই সহকর্মিতার ফলে জন্ম নেয় প্রাণীরা, সৃষ্টি ও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়[৪৩]। এবং বিপরীতের এই সন্ধির উপরেই নির্ভর ক'রে আছে অন্য সব জন্ম ও উৎপাদন: বৃষ্টি ও রৌদ্রের সমবায়ে শস্য ফল সঞ্জাত ও পরিপুষ্ট হয়, আগুন জলের সংযোগে আমাদের অন্ন স্বাদু ও সুপাচ্য হ'য়ে ওঠে। এমনকি বৃষ্টিদাতা মেঘের মধ্যেও লুকিয়ে আছে দেবরাজের বজ্র — বিদ্যুৎরূপী সেই অগ্নি, যার আঘাতে দানবের অস্থি বিদীর্ণ হ'য়ে যায়। জড় প্রকৃতির এই মিলনধর্মিতা থেকে যুধিষ্ঠির একটি মানবিক নীতি আহরণ করেছিলেন[৪৪] — কিন্তু যে-নিয়ম নিতান্তই জড় প্রকৃতির, তা প্রকৃতিচ্যুত মানুষের জীবনে প্রয়োজ্য হ'তে পারে কিনা, এই প্রশ্ন আমাদের মনে অনিবার্য। এ নিয়ে দ্রৌপদী বহু তর্ক করেছেন — আর আমরাই বা কী ক'রে যুধিষ্ঠিরের পক্ষ নিতে পারি, যখন যুধিষ্ঠির নিজেই তাঁর ব্যবহারিক জীবনে বার-বার এই বিশ্বাস থেকে স্খলিত হন, যখন তাঁকে দেখা যায় জগতের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনে উৎসুক হ'য়েও নিজেরই মধ্যে বিভক্ত? বনপর্বের পর থেকে তিনি

যা-কিছু করেন এবং করেন না, তা লক্ষ করলে অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে তাঁর চিন্তাপীড়িত অস্থৈর্যের চেয়ে, তাঁর মীমাংসাহীন আত্মজিজ্ঞাসার চেয়ে অনেক ভালো অর্জুনের নিঃসংশয় যুদ্ধনীতি — বা নীতিহীনতা — অন্তত অনেক বেশি ফলপ্রদ ও প্রগতিশীল। মনে হয়, যুধিষ্ঠির যেন ইতিহাসের একটি সম্ভাবনা শুধু, আর অর্জুন ইতিহাসের স্রষ্টা।

৩৯। মূলে আছে: 'স্ত্রিয়শ্চ বিপুলশ্রোণ্যশ্চারুপীনপয়োধরাঃ/মদস্খলিত-গামিন্যঃ···।' এখানে মদ মানে অবশ্য যৌবনসুলভ গর্ব বা চাপল্য, কিন্তু বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এই কামিনীরা সংস্কৃত বাংলা উভয় অর্থেই মদের বশবর্তী হয়েছিলেন। একটি শ্লোকের পাঠভেদ উল্লেখ্য:

কাশ্চিৎ প্রহৃষ্টা ননৃতুশ্চুক্রুশুশ্চ তথাপরাঃ।
জহসুশ্চাপরা নার্যো জগুশ্চান্যা বরস্ত্রিয়ঃ॥

(আর্যশাস্ত্র: আদি: ২২১: ২৪)

— 'সুন্দরীরা কেউ-কেউ আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন, কেউ কোলাহলে, কেউ বা হাস্যে অথবা সংগীতে মেতে উঠলেন।'

বঙ্গবাসী ও সিদ্ধান্তবাগীশে দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর:

জহসুশ্চাপরা নার্যঃ পপুশ্চান্যা বরাসবম্॥

— 'কেউ-কেউ হাসতে লাগলেন, কেউ-কেউ মদ্যপানে রত হলেন।' ('বরাসব' — উত্তম সুরা।)

কালীপ্রসন্নেও 'অত্যুৎকৃষ্ট সুরা'র উল্লেখ আছে। বস্তুত, মহিলাদের ব্যবহার সুরাপায়ীদেরই উপযোগী — তাঁরা পরস্পরকে ধ'রে কৃত্রিম প্রহারও করছেন।

সেদিনকার ব্যসনে কৃষ্ণ অর্জুন নিজেরাও যোগ দিয়েছিলেন ব'লে উল্লিখিত নেই, তবে সঞ্জয় একবার তাঁদের ভোগী মূর্তি চোখে দেখেছিলেন (উদ্যোগ: ৫৮)। দ্রৌপদী ও সত্যভামাকে নিয়ে অন্তঃপুরে ব'সে আছেন তাঁরা, উভয়েই চন্দনলিপ্ত ও মাল্যধারী, আসব এবং মধুপানে উৎফুল্ল। কৃষ্ণ তাঁর দু-পা অর্জুনের কোলে এবং অর্জুন এক পা দ্রৌপদীর ও অন্য পা সত্যভামার কোলে রেখেছেন — এই অনুপুঙ্খযোগে ছবিটি একেবারে স্পষ্ট

হ'য়ে ওঠে। লক্ষণীয়, এই দুই দম্পতির সম্মিলিত বিহারস্থলে নকুল সহদেব অভিমন্যুর প্রবেশাধিকার ছিলো না, আর সঞ্জয় সেখানে ঢুকেছিলেন পদাঙ্গুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে।

যদুবংশীয়েরা একটু অধিকমাত্রায় সুরাসক্ত ও সম্ভোগপরায়ণ ছিলেন— রৈবতক-উৎসবের বিবরণ থেকে তা বোঝা যায় (আদি : ২১৯); তাঁদের ধ্বংসের দিনেও সুরার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

৪০। এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে ইলিয়াডে ও মহাভারতে কোনো ঐতিহাসিক সংযোগ আছে।

৪১। সিদ্ধান্তবাগীশে একটি অনুপুঙ্খ আছে, যা বঙ্গবাসী, আর্যশাস্ত্র, বা কালীপ্রসন্নে পাওয়া যায় না।

বিহরন্ খাণ্ডবপ্রস্থে কাননেষু চ মাধবঃ।
পুষ্পিতোপবনাং দিব্যাং দদর্শ যমুনাং নদীম্ ॥
তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং সর্বর্তুসুমনোহরম্।
আলয়ং সর্বভূতানাং খাণ্ডবং খড়্গচর্মভৃৎ ॥
দদর্শ কৃৎস্নং তং দেশং সহিতঃ সব্যসাচিনা।
ঋক্ষগোমায়ুশার্দূল-বৃককৃষ্ণমৃগান্বিতম্ ॥
(আদি : ২১৫ ; ১৮-২০)

—'কৃষ্ণ [ইতিপূর্বেই] খাণ্ডবপ্রস্থের কাননসমূহে বিচরণ করেছিলেন ; এবারে দেখলেন মনোহর নদী যমুনা, যার তীরে পুষ্পিত বন বিরাজমান।

'খড়্গ-ও চর্ম-(ঢাল)ধারী কৃষ্ণ, অর্জুনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে দেখলেন যমুনার তীরে খাণ্ডববন, সর্বপ্রাণীর বাসস্থান ও সর্বঋতুতে মনোহর— যেখানে ঘুরে বেড়ায় ব্যাঘ্র ও ভল্লুক, নেকড়ে ও শৃগাল, আর [সেইসঙ্গে] কৃষ্ণসার হরিণ।'

এই তিনটি শ্লোকে আমরা জানতে পারি যে অর্জুন ও কৃষ্ণ যেখানে জলবিহারে গিয়েছিলেন তারই সংলগ্ন ছিলো খাণ্ডববন। অজস্র ফুল ফুটে আছে সেখানে, পশুরা তখনও নিশ্চিন্ত অধিবাসী, প্রান্ত ছুঁয়ে ব'য়ে যাচ্ছে যমুনা— সবই রমণীয়, হিংস্র জন্তুর উপস্থিতি সত্ত্বেও সংঘর্ষের কোনো চিহ্ন নেই।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এই স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও প্রাণপূর্ণতা যে-ভাবে বিধ্বস্ত

হ'লো তাতে মনে হয় ঘটনাটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তুলনায় ছোট মাপের হ'লেও নিষ্ঠুরতায় কিছু কম নয়।

৪২। মূলে 'জলেশ্বর' কথাটাই আছে। 'আদিত্যমুদকে দেবং নিবসন্তং জলেশ্বরম্—উদকবাসী জলেশ্বর আদিত্যদেব [বরুণ]।' আমরা আজকের দিনে 'আদিত্য' বলতে সাধারণত সূর্য বুঝি, তাই বলা দরকার যে আদিত্যের সংখ্যা বারো—তাঁদের মধ্যে বরুণের স্থান চতুর্থ—তাঁরা সকলেই অদিতির পুত্র, আদিমতমা দেবমাতার সন্তান। বেদে বরুণের জলেশ্বরতা তাঁর একটি গৌণ লক্ষণমাত্র, কিন্তু মহাভারতে সেটাই তাঁর অনন্য পরিচয়; প্রসঙ্গান্তরেও তিনি জলেশ্বররূপে বর্ণিত হয়েছেন (সভা : ৯, বন : ৪১।)

৪৩। এই ধারণাটিও ঔপনিষদিক। বৃহদারণ্যক ৬ : ২ : ১৩তে বলা হয়েছে: 'যোনিরূপ অগ্নিতে দেবতারা রেতঃকে আহুতি দেন, তা-ই থেকে পুরুষ উৎপন্ন হয়।' শ্বেতাশ্বতর ৬: ১৫তে ব্রহ্মের একটি উপমা হ'লো : 'জলের মধ্যে আগুনের মতো — স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।'

খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতকের গ্রীক মনীষী হেরাক্লেইতসও বিরোধী শক্তির মিলনের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তাঁর কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। 'আর্দ্র বস্তু শুষ্ক হ'য়ে যায়, শুষ্ক হয় সজল, ··· সারঙ্গ ও দণ্ডের মতোই সব বিপরীতের মধ্যে সৌষম্য বিরাজমান। ··· দ্বন্দ্ব থেকে উৎপন্ন হয় নিখিল, বিরোধের মধ্যেই মধুরতম সুরের উদ্ভব।'

৪৪। পরে, ধর্মবকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যুধিষ্ঠির আরো একবার জড় ও মানবপ্রকৃতিতে অন্বিত করবেন — পুস্তকের ৩৫নং পাদটীকা দ্র।

১১ : অর্জুন ও যুধিষ্ঠির

হ্রদের প্রান্তে এসে যুধিষ্ঠিরের চার ভ্রাতাই নেপথ্য-বাণী অমান্য করেছিলেন, কিন্তু সেই অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করেছিলেন শুধু অর্জুন। 'এসো না, দৃশ্যমান হও, তারপর দেখি আমার বাণে বিদীর্ণ হ'য়ে কেমন আমাকে নিবৃত্ত করতে পারো!'— এই আহ্বান,

এই তাৎক্ষণিক যুদ্ধঘোষণা অর্জুনের কণ্ঠে অনবরত শুনতে পাই আমরা — পর্বের পর পর্বে, ঘটনার পর উত্তেজনাময় ঘটনায়। হনুমান-কর্তৃক প্রতিহত ও পরাস্ত হ'য়ে উগ্র ভীমসেনও ক্ষমা চেয়েছিলেন একবার (বন : ১৪৭), কিন্তু অর্জুন কখনো অস্ত্র ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলেন না। 'মা সাহসং কার্ষীম্' — এই নিষেধের জীবন্ত এক উত্তর যেন অর্জুন: তিনি ব'য়ে যান সব বাধা ডিঙিয়ে উচ্ছল স্রোতে, চারদিকে বিস্তার করেন প্রভুত্ব ; তাঁর মতো বিচিত্র ও ঘটনাবহুল জীবন সমগ্র মহাভারত-রামায়ণে অন্য কারোরই নয়। দু-বার জুটলো তাঁর ভাগ্যে বারো-বছরব্যাপী বনবাস (আদি ও বন), দু-বার তিনি দিগ্বিজয় করলেন (সভা ও আশ্বমেধিক), 'মৃত্যু'র পরে পুনর্জীবিত হলেন তিনবার[৪৫]। বনবাসের চব্বিশ বছর ধ'রে তাঁকে দেখা যায় প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে ভ্রাম্যমাণ — যুধিষ্ঠিরের মতো শুধু আর্যাবর্তের পরিধির মধ্যে নয় — দূরে-দূরান্তে, কিরাতবাসিত হিমালয়তট থেকে দক্ষিণসমুদ্র পর্যন্ত। তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অনুসরণ করলে মনে হয় তিনি ভারতভূমির সব পর্বত দেখেছেন, অবগাহন করেছেন সব নদীতে, সব তীর্থস্থান তাঁর পরিচিত ছিলো। তাঁর জিত দেশের মধ্যে উল্লিখিত আছে কাশ্মীর ও সিন্ধু ও চেদিরাজ্য (মধ্যভারত), আছে গান্ধার ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুর — এমনকি কিম্পুরুষবর্ষ ও উত্তরকুরুবর্ষও সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। আধুনিক ভাষায় তর্জমা করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় তিনি আফগানিস্তান থেকে আসাম পর্যন্ত তৎকালীন নিখিলভারত এবং তার উপর তিব্বত ও মধ্য-এশিয়াও জয় করেছিলেন। এত — তবু তাঁর পক্ষে এও পর্যাপ্ত নয় : তিনি নামলেন গঙ্গাগর্ভস্থ উলূপীনন্দিত নাগলোকে বা পাতালে, ইন্দ্রের স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হ'লো তাঁর অভিযান। কুরুক্ষেত্রে যাঁরা কৌরবপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তাঁরা অধিকাংশই তাঁর হাতে নিপাতিত হলেন — প্রথমে ভীষ্ম, তারপর ভূরিশ্রবা,

জয়দ্রথ ও কর্ণ। তিনি শূরশ্রেষ্ঠ, তিনি শত্রুদহন — কিন্তু সেটাই অর্জুন বিষয়ে সব কথা নয়; স্বর্গবাসকালে গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে নৃত্য-গীতও শিখেছিলেন তিনি, তাঁর ব্যক্তিত্বে কোনো ভীষণতা নেই, অন্য কয়েকজন লোকশ্রুত ক্ষত্রিয়ের মতো 'মহাক্রোধন' মানুষ তিনি নন। আমরা দেখেছি ভীমসেনকে, যখন দ্যূতসভায় চণ্ডমূর্তি ধারণ করেছেন তিনি, চাইছেন যুধিষ্ঠিরের বাহু দগ্ধ করতে, যখন তাঁর ক্রোধ তাঁর প্রতিটি রোমকূপ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে — যেন জ্বলন্ত কোনো গাছের গা থেকে 'সধূমস্ফুলিঙ্গ হুতাশন' (সভা : ৬৬, ৬৯, ৭০); দেখেছি সেই সব সহনাতীত দৃশ্য, যখন ছিন্নবাহু যোগমগ্ন মৃতপ্রায় ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করলেন বীর সাত্যকি (দ্রোণ : ১৪৩); আর বলবান ভীম প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হ'য়ে, নিপাতিত ও নিঃসহায় দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করলেন (শল্য : ৬০); ছিন্নমুণ্ড দুঃশাসনের রক্তপান ক'রে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে বললেন (কর্ণ : ৮৪), 'এমন সুস্বাদু পানীয় আর-কিছু নেই [৪৬] !' এবং দেখেছি আকিলেউসকেও, হেক্তোর যখন ভূলুণ্ঠিত ও করুণাপ্রার্থী, ভীমের মতোই নরভুকবৃত্তির পরিচয় দিয়ে যিনি গ'র্জে উঠেছিলেন [৪৭] — 'কুকুর! তুই দয়ামায়ার কথা তুলিস না, তোর গা থেকে কাঁচা মাংস কেটে ভোজন করার মতো ক্ষুধা থাকলে তবে আমার সুখ হ'তো আজ।'— কিন্তু অর্জুন, যদিও তিনি বহুযুদ্ধজয়ী ও বহুশত্রুহন্তা, তবু তাঁর মধ্যে ক্ষাত্রতেজের বিস্ফোরণ কখনোই এমন ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে না; মুহূর্তের জন্যও তিনি বিতৃষ্ণা উদ্রেক করেন না আমাদের; তাঁর বিরাট কর্মকাণ্ডে এমন একটি ঘটনাও নেই, যাকে বলা যায় বীভৎস অথবা পৈশাচিক। একদিকে তিনি অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা, অন্যদিকে এক পরমরমণীয় যুবাপুরুষ; তাঁর কীর্তিফলকে এই কথাটাও উজ্জ্বল অক্ষরে ক্ষোদিত আছে যে তিনি ললনাপ্রিয়, এবং মহিলারা তাঁকে ভালোবাসেন। প্রথম বনবাসের সময় পথে-পথে তাঁর তিনটি প্রণয়িনী পত্নী জুটলো;

স্বর্গে তাঁর জন্য বিলোল হলেন স্বয়ং উর্বশী; অজ্ঞাতবাসের পুরো বছরটি তিনি যাপন করলেন নারী সেজে নারীসংসর্গে, পুরস্ত্রীদের গল্প শুনিয়ে, নৃত্যগীত শিখিয়ে; পঞ্চস্বামীর মধ্যে শুধু তাঁকেই শুনতে হ'লো দ্রৌপদীর মুখে প্রণয়গঞ্জনা;[৪৮] এবং তাঁর তৃতীয় 'মৃত্যু'র পর তিনি প্রায়বিস্মৃতা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার প্রণয়প্রভাবেই প্রাণ ফিরে পেলেন (আশ্বমেধিক : ৮০)। এ-সব ঘটনাও কারণ, যেজন্যে অর্জুন হ'য়ে ওঠেন আমাদের চোখে ক্রমশ আরো প্রীতিপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী। হয় যুদ্ধ, নয় ভ্রমণ, আর মাঝে-মাঝে ক্ষণকালীন বাসরশয্যা — ক্ষণকালীন, কেননা কোথাও তিনি থামেন না, বাঁধা পড়েন না — এমনি ক'রে অর্জুন তাঁর জীবনকে সম্প্রসারিত ক'রে চলেছেন, বছরের পর বছর, অফুরন্ত উদ্যম ও তৃপ্তিহীন জিগীষা নিয়ে। আমাদের যৌবনের যা চরম অভীপ্সা, আমাদের পৌরুষের যা দুঃসাহসিক দাবি, আমাদের ঋদ্ধিকামী প্রবৃত্তির যত প্রণোদনা — সব যেন সুন্দরভাবে মূর্ত হয়েছে অর্জুনের মধ্যে : তাঁকে অবলোকন করতে-করতে, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদারই মতো, আমরাও কতবার বিস্ময়মুগ্ধ গাঢ় স্বরে ব'লে উঠেছি[৪৯], 'অর্জুন! তুমি অর্জুন!'

এ-রকম উদার অভ্যর্থনা যুধিষ্ঠিরের জন্যে কে কবে উচ্চারণ করেছেন?

যদি মুহূর্তের জন্য মহাভারতকে একটি বীরকাব্যরূপে বিবেচনা করি, তাহ'লে তার নায়ক-পদবিতে অর্জুন ছাড়া অন্য কারোরই দাবি থাকে না। কিংবা যদি ভাবি কাব্যকাহিনী — জীবনানন্দর ভাষায় 'কল্পনার গল্প' — তাহ'লে এক স্থলচর অদিসেয়ুসরূপে অর্জুনকে আমরা দেখতে পাবো হয়তো — অন্য কোনো দিক থেকে না হোক, অন্তত এক গতিবেগসম্পন্ন অভিযাত্রী হিশেবে, অন্তত বাধালঙ্ঘনের ক্ষমতায়। আর যদি শুধু প্রণয়যোগ্যতাকেই নিরিখ ব'লে মানি, তাহ'লেও অর্জুনের অধিকার হয় সর্বাগ্রগণ্য। এই আমাদের বিশ্বপ্রিয়

দেবরাজপুত্র, বহুবিচিত্র শিখায় যিনি দেদীপ্যমান, তাঁর পাশে দাঁড় করালে যুধিষ্ঠিরকে বড়ো নিষ্প্রভ কি মনে হয় না, বড়ো সীমাবদ্ধ ও অনগ্রসর? তাঁর সান্নিধ্যে যেন উত্তাপ নেই, সাহচর্যে নেই সরসতা বা উদ্দীপনা, আমাদের চলাফেরার পক্ষে যথেষ্ট পরিসর নেই তাঁর মধ্যে — এমনি কি মনে হয় না আমাদের? নিশ্চয়ই তা-ই — অন্তত প্রথম দর্শনে, বহুদূর পর্যন্ত তা-ই। এবং যে-কোনো সময়ে এও ধরা পড়ে যে এই দুই সহোদর ভ্রাতা তাঁদের পিতৃভেদের দ্বারা পৃথক্‌কৃত; অস্পষ্ট অনভিজাত ধর্মের সঙ্গে বৈভবশালী বাসবের যেমন ব্যবধান, তাঁদের পুত্রদের মধ্যেও দূরত্ব তেমনি দুরতিক্রম্য।

কিন্তু সত্যি কি আমরা এই দু-জনের মধ্যে পরিষ্কার একটি বৈপরীত্য স্থাপন করতে পারি? যদি পারতাম — যদি অর্জুনকে বলা যেতো ভোগলিপ্সু ও যুধিষ্ঠিরকে বৈরাগ্যসাধক, সরল ভাষায় একজনকে প্রাণোচ্ছল ও কর্মিষ্ঠ আর অন্যজনকে শান্ত ও ধ্যানতন্ময়, অদ্ব্যর্থভাবে একজনকে পার্থিবের ও অনিত্যের প্রেমিক আর অন্যজনকে শাশ্বতের জন্য সতৃষ্ণ — তাহ'লে কত না সমস্যা মিটিয়ে দেয়া যেতো একসঙ্গে, বর্তমান লেখকের কাজ কতই না সহজ হ'য়ে যেতো! সমস্যা অর্জুনকে নিয়ে নয়, তাঁকে আমরা যে-কোনো অবস্থায় চিনতে পারি ও বুঝতে পারি, তাঁর চরিত্রে অখণ্ডতা আছে; কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে কোনো বিশেষণে বা অভিজ্ঞানে বিদ্ধ করা যেন অসম্ভব। কিছুটা নৈরাশ্যের সঙ্গে আমরা লক্ষ করি তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চাশা পর্যন্ত নেই; তাঁর ছদ্মবেশী পিতা যখন বর দিতে চাইলেন, তিনি নচিকেতার মতো ব্রহ্মের স্বরূপ জানতে চাইলেন না; মৈত্রেয়ীর মতো ব'লে উঠলেন না, 'যা আমাকে অমর করবে না তা নিয়ে আমি কী করবো?' — কোনো আনন্তিক বা আত্যন্তিক জিজ্ঞাসা বেরোলো না তাঁর মুখ দিয়ে। তিনি প্রথমে চাইলেন ব্রাহ্মণ যেন তাঁর হৃত অরণিকাষ্ঠ ফিরে পান (আশ্চর্য, সেই ব্রাহ্মণকে

এখনো তিনি ভোলেননি!) : তারপর বললেন, 'আমরা যেন অজ্ঞাতবাসকালে প্রকাশিত না হই —' ক্ষুদ্র প্রার্থনা, যেন সেই মুহূর্তের অব্যবহিত জাগতিক প্রয়োজন ছাড়া আর-কিছু ভাবছেন না তিনি, দু-এক মুহূর্ত জ্যোতির্লোকে সঞ্চরণের পর আবার সেই 'মহামোহময় কটাহে'র মধ্যেই নেমে এসেছেন। স্মর্তব্য, ধর্ম যখন তৃতীয় বর দিতে চাইলেন, তখনও যুধিষ্ঠির, যেন আর-কিছু ভেবে না-পেয়ে শুধু বললেন, 'আমার যেন ধর্মে মতি থাকে, এই আশীর্বাদ করুন।' আমাদের কানে, এবং বরদাতার কানেও, বাহুল্য শোনালো এই প্রার্থনা, কেননা যুধিষ্ঠির স্বভাবতই ধর্মপরায়ণ — কিন্তু যুধিষ্ঠির জানেন ঐ আশীর্বাদে তাঁর প্রয়োজন আছে, এবং আমরা জানি তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে ঐ তৃতীয় বর কেমন খেদজনকভাবে বিফল হয়েছিলো। বনপর্বের পর যুধিষ্ঠিরকে দেখি আগের চেয়েও অনেক বেশি অব্যবস্থিত; যেমন নিজে তিনি মনস্থির করতে পারেন না, তেমনি আমাদেরও মনস্থির করতে দেন না তাঁর বিষয়ে; কোনো-এক মুহূর্তে যে-ভাবে আমরা ধারণা করি তাঁকে, কিছুক্ষণ পরে তাঁরই কোনো বিরুদ্ধাচরণে তার বিপর্যয় ঘটে। এমনি বার-বার — তিনি যা ভাবেন তা ক'রে উঠতে পারেন না, যা করেন তাতে অনুতপ্ত হন। এইজন্যে, আমরা যারা তাঁর সহজাত সাধুতায় বিশ্বাস রাখি, স্বীকার করি তাঁর জীবনজিজ্ঞাসাকে মূল্যবান ব'লে — এক-এক সময়ে আমরাও যেন ভেবে পাই না কী করবো তাঁকে নিয়ে, হৃদয়ের কোন অংশটিতে তাঁকে স্থান দেবো, তাঁর সঙ্গে আমাদের সমানুভূতি অক্ষুণ্ণ রাখবো কেমন ক'রে।

অজ্ঞাতবাসের আরম্ভেই এ-রকম একটি মুহূর্ত আছে। 'আমি কঙ্কনামধারী অক্ষবিদ ব্রাহ্মণ সেজে বিরাটরাজার সভাসদ হবো —' যুধিষ্ঠিরের এই ঘোষণা শুনে চমকে উঠি আমরা, মনে-মনে প্রায় ভীত স্বরে ব'লে উঠি: 'আবার জুয়াড়ি!' তিনি কি ভুলে

৭

গেলেন তাঁর দ্যূতজনিত মর্মপীড়া, কেমন কাতরস্বরে তিনি বৃহদশ্ব মুনিকে বলেছিলেন (বন: ৫২) — 'আমার দ্যূতক্রীড়ার জন্যই এত দুঃখ আজ আমাদের!' দময়ন্তী-কথা শোনাবার পর বৃহদশ্ব তাঁকে নিখিল-অক্ষবিদ্যা দান করেছিলেন (বন: ৭৯) — বনবাসের সমস্ত ঘটনার মধ্যে সে-মুহূর্তে শুধু সেটাই কি মনে পড়লো তাঁর? আশ্চর্য নয় কি, যে 'কাঞ্চন ও হস্তীদন্ত ও বৈদূর্যময় শ্বেত কৃষ্ণ পীত ও লোহিতবর্ণ অক্ষগুটিকা'[৫০] বিষয়ে এখনো তিনি প্রণয়ের সুরে কথা বলতে পারেন! এবং এটা শুধু কথার কথা নয়, সত্যি তিনি জুয়ো খেলছেন বিরাটের সভায় — মনে হয় প্রতিদিন — এবং সেই উপায়ে ধনার্জন করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না (বিরাট: ১৩)। বনপর্বে আমরা তাঁকে দেখেছি জ্ঞানার্থী ও বিনয়বিদ্বান, কিন্তু এখানে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে, অরণ্য ছেড়ে রাজসংসর্গে আসামাত্র, তাঁর ক্ষত্রশোণিত যেন কথা ব'লে উঠলো। সভাপর্বের অরুন্তুদ ঘটনায় তিনি নিঃশব্দ ছিলেন, কিন্তু কীচক যখন দ্বিতীয় দুঃশাসনের মতো সর্বসমক্ষে পদাঘাত করলো দ্রৌপদীকে (বিরাট: ১৬), তখন অপ্রকাশ্য ক্রোধে বিক্ষোভে যুধিষ্ঠিরের ললাটে ফুটলো স্বেদবিন্দু, বচন হ'য়ে উঠলো সুতীক্ষ্ণ। 'সৈরিন্ধ্রী, তুমি নটীর মতো ক্রন্দন ক'রে দ্যূতক্রীড়ারত সভাসদবর্গের বিঘ্ন ঘটিয়ো না — তুমি চ'লে যাও!' — এ-রকম কোনো অসহিষ্ণু উক্তি যুধিষ্ঠিরের মুখে আগে কখনো শুনিনি আমরা, ভাবতে পারিনি এমন রূঢ় বাক্য তিনি বলতে পারেন — আর কাউকে নয়, তাঁর রক্ষণীয়া ও মাননীয়া পত্নী দ্রৌপদীকে[৫১]। বিরাটের সঙ্গে পাশাখেলার দৃশ্যেও আবার আমরা তাঁর ভঙ্গিতে দেখলাম হঠকারিতা (বিরাট: ৬৮), যা সইতে না-পেরে বিরাট তাঁর প্রিয় পারিষদকঙ্কের কপালে পাশা ছুঁড়ে মারলেন। দু-বারই অবশ্য যুধিষ্ঠির নিজেকে সামলে নিলেন শেষ মুহূর্তে, দ্যূতোন্মাদ হ'য়ে এমন কিছু ক'রে ফেললেন না যাতে ছদ্মবেশ ধরা প'ড়ে

যায় — সেটুকুই তাঁর সুবুদ্ধির পরিচয়। তবু, তিনি যুধিষ্ঠির ব'লেই, তাঁর ঐ ক্ষণকালীন অসংযমও ব্যথিত করে আমাদের : মনে হয় তাঁর উত্তেজনার কারণ শুধু দ্রৌপদীর জন্য বেদনা ও ভ্রাতাদের প্রতি স্নেহ নয় — হঠাৎ যেন তাঁর রাজগৌরব বিষয়ে সচেতন হ'য়ে উঠেছেন তিনি, আশ্রয়দাতা বিরাটের প্রভুত্ব মেনে নিতে পারছেন না। অন্য কারো পক্ষে এটাই হ'তো স্বাভাবিক ও যথোচিত; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কাছে আমরা অন্য রকম আশা করেছিলাম। আমাদের ইচ্ছে করে তাঁকে জিজ্ঞেসা করি : বিনয় কি শুধু দেবতার প্রাপ্য, মানুষের নয়?

বিরাটপর্বের পরে কাহিনী যত এগিয়ে চলে ততই যেন আরো বেশি দুর্বোধ হ'য়ে ওঠেন যুধিষ্ঠির। বনপর্বে তার মুখে ক্রোধের নিন্দা ও ক্ষমার গুণগান শুনে[৫২] আমরা তাঁকে সামনীতির প্রবক্তা ব'লে ধ'রে নিয়েছিলাম, কিন্তু যুদ্ধের মন্ত্রণা শুরু হওয়ামাত্র হাওয়াটা বড়ো উল্টোপাল্টা বইতে লাগলো। আমাদের মনে প্রথমেই ধাক্কা লাগে যখন ধৃতরাষ্ট্রকে দেখি যুধিষ্ঠির বিষয়ে দারুণ ভীত (উদ্যোগ : ২১); 'আমি ভীম, অর্জুন বা এমনকি কৃষ্ণকেও তত ভয় করি না, যত করি ক্রোধোদ্দীপ্ত যুধিষ্ঠিরকে' — ধৃতরাষ্ট্রের এই কথাটার কোনো ভিত্তি আমরা খুঁজে পাই না। তিনি কি বলতে চাচ্ছেন ধর্মাত্মা ব্যক্তি একবার ক্রুদ্ধ হ'লে আর রক্ষা থাকে না—বা সাধুতাই এক অজেয় শক্তি? কিন্তু সঞ্জয় যখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলেন তখন দেখা গেলো যুধিষ্ঠির যে-শক্তির উপর নির্ভর করছেন সেটা নিছক সাধুতা নয় (উদ্যোগ : ২৫-৩০)। যুধিষ্ঠিরের প্রথম কথা : 'যুদ্ধে আমার অভিলাষ নেই' — কিন্তু তারপর ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন বিষয়ে কিছু কটূক্তি ক'রে পরিশেষে তিনি বললেন : 'তুমি জেনো, সঞ্জয়, ধার্তরাষ্ট্রগণ শুধু ততদিনই জীবিত থাকবে যতদিন কানে না-শুনবে অর্জুনের জ্যানির্ঘোষ, দুর্যোধন সুখের আশা করতে পারবে শুধু ততদিন, যতদিন সে ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে চোখে না-দেখবে। ভীম,

অর্জুন ও তুই মাদ্রীপুত্রকে জয় ক'রে ইন্দ্রও আমাদের রাজ্য নিতে পারবেন না। ··· যদি তুর্যোধন আমাদের অর্ধেক রাজ্য ফিরিয়ে দেয় তবেই আমি সন্ধিতে সম্মত আছি, নচেৎ নয়।' এর উত্তরে সঞ্জয়ের নিবেদন প্রণিধানযোগ্য :— 'অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির! কৌরবেরা আপনাকে বিনা যুদ্ধে রাজ্য দেবেন না, কিন্তু আমি বলি — যুদ্ধে রাজ্যজয় করার চাইতে ভিক্ষাবৃত্তিও ভালো। বিশেষত আপনি, যাঁর তুল্য ধার্মিক ও বুদ্ধিমান আর-কেউ নেই, আপনিও যদি এই জ্ঞাতিহত্যার পাপে লিপ্ত হবেন তা'হলে এতকাল বনবাসতুঃখ ভোগ করলেন কেন? আপনি তো ক্রোধান্ধ হ'য়ে কোনো পাপাচরণ করেননি কখনো, তাহ'লে কেন এই ঘোর তুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে চান? মহারাজ, সর্বদোষাকর তিক্ত ক্রোধ শুধু সজ্জনেরাই পান করতে পারেন[৫৩], আপনিও তা-ই করুন, আপনি শান্ত হোন। আর যদি অমাত্যদের কথায় আপনি যুদ্ধে ইচ্ছুক হ'য়ে থাকেন; তাহ'লে তাঁদেরই উপর সব ভার ছেড়ে দিন—নিজে আপনার দেবযান থেকে ভ্রষ্ট হবেন না।' এক অদ্ভুত ব্যাপার: যুধিষ্ঠির বলছেন যুদ্ধ, আর সঞ্জয় তাঁকে ক্ষমাধর্ম শেখাচ্ছেন! সঞ্জয়ের সম্পূর্ণ ভাষাণটিতে আমরা দেখতে পাই সুযুক্তি ও ন্যায়ধর্ম ও কূটনীতির এক অসাধারণ মিশ্রণ: কিন্তু এই কয়েকটি কথার পিছনে কোনো কূটবুদ্ধি নেই — স্পষ্ট বোঝা যায় এটা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যক্তিগত আবেদন তাঁর। নয়তো কেন বলবেন, 'যুদ্ধ হবার হয় তো হোক, কিন্তু আপনি তাতে কোনো অংশ নেবেন না।' আসলে, সঞ্জয় পারেন না কোনো হিংসাপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে কল্পনা করতে, যেমন পারি না আমরাও। আমরা অনুভব করি সঞ্জয়ের কথায় যুধিষ্ঠির বিচলিত হয়েছেন, সন্ধিপ্রস্তাবে তাঁর সম্মতি নিয়েই সঞ্জয় হয়তো ফিরতে পারতেন সেদিন, যদি না তার্কিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ মধ্যবর্তী হ'য়ে উত্তেজিত করতেন যুধিষ্ঠিরকে। তবু শেষ পর্যন্ত — 'যুদ্ধের চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ভালো', মনে-মনে যেন এই নীতিকেই মেনে

নিয়ে যুধিষ্ঠির পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি মাত্র গ্রাম চাইলেন — কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথা বলতেও ভুললেন না যে মৃদু ও দারুণ উভয় সম্ভাবনাতেই তাঁরা প্রস্তুত। এই শেষ কথাটা আবার কৃষ্ণের প্রতিধ্বনি।

মন্ত্রণা-সভা নিষ্ফল হ'লো : 'বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমিও নয়', এই পণ থেকে দুর্যোধনকে কেউ টলাতে পারলেন না ; অবশেষে যুধিষ্ঠিরকে নিজের মুখে যুদ্ধের আজ্ঞা দিতে হ'লো (উদ্যোগ : ১৫২)। পুঁথিতে লেখা আছে, সেই রাত্রিটি পাণ্ডবেরা পরম সুখে কাটিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের সন্দেহ, যুধিষ্ঠির সেই আনন্দে যোগ দিতে পারেননি।

৪৫। অর্জুনের তৃতীয় 'মৃত্যু' ঘটেছিলো তাঁরই তনয়, চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত বভ্রুবাহনের হাতে (আশ্বমেধিক : ৭৯)।

৪৬। ভীমের সম্পূর্ণ উক্তিটি উদ্ধৃতিযোগ্য : 'মাতার স্তনদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, মাধ্বীক মদ্য, দিব্য জল, মথিত দুগ্ধ ও দধি এবং অন্যান্য অমৃততুল্য যত পানীয় পৃথিবীতে আছে, সে-সমস্তের চেয়ে আজ এই শত্রুরক্ত অধিক সুস্বাদু ব'লে মনে হচ্ছে।' (অনু : রা-ব)

৪৭। ইলিয়াড : সর্গ ২২। আমার অনুলিখন পেঙ্গুইন অনুবাদ অনুসারে। অর্জুন যুদ্ধে কখনো বীভৎস কর্ম করেন না, তাই তাঁর এক নাম বীভৎসু (বিরাট : ৪৪)।

৪৮। নববধূ সুভদ্রাকে নিয়ে অর্জুন যখন খাণ্ডবপ্রস্থে এলেন, প্রথম সাক্ষাতে দ্রৌপদী তাঁকে বললেন (আদি : ২২১), 'এখানে কেন, অর্জুন? যেখানে যাদবকন্যা আছেন সেখানেই যাও। কিন্তু তোমারই বা দোষ কী — গুরুভার বস্তুকে বেঁধে রাখলেও কালক্রমে সেই বন্ধন শিথিল হ'য়ে যায়।' আর-একবার, কীচকবধের পরে, স্ত্রীবেশী অর্জুনকে (বিরাট : ২৪) : 'তুমি কন্যাদের সঙ্গে আনন্দে আছো, তা-ই থাকো। সৈরিন্ধ্রীর দুঃখের কথা শুনে তোমার লাভ কী?' উত্তরে অর্জুন : 'সৈরিন্ধ্রী, বৃহন্নলা তোমার

দুঃখে দুঃখ পাচ্ছে। কেউ কারো মনের ভাব বোঝে না, তাই তুমি ও-রকম কথা বললে।'

৪৯। 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' দ্র। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যে অনুরূপ কোনো উক্তি নেই।

৫০। ঋগ্বেদের পূর্বোক্ত কবিতাটি এখানেও মনে প'ড়ে যায় (১০ : ৩৪) :— 'আমি ভাবি আর পাশা খেলবো না, ··· কিন্তু সুন্দর পিঙ্গল পাশাগুলিকে ছকের উপর উপবিষ্ট দেখলে আমি আর স্থির থাকতে পারি না। ··· এই যে তিপ্পান্নটি পাশার গুটিকা দেখছো, এঁরা মিলিত হ'য়ে ছকের উপর বিহার করেন, যেন বিশ্বভুবনে সত্যস্বরূপ সূর্যদেব। ··· এঁরা কারো বশীভূত নন, রাজা পর্যন্ত এঁদের নমস্কার করেন।'

আর্যবংশীয় প্রাচীনেরা পাশাকে কী-রকম রহস্যমিশ্রিত সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন, অথর্ববেদের একটি বিয়ের মন্ত্রেও তার নিদর্শন আছে (১৪ : ১ : ৩৬): 'যে-দীপ্তি মহানগ্নীর (গণিকার) নিতম্বে, আর তীব্র সুরায়, আর অক্ষগুটিকা যার দ্বারা অভিসিঞ্চিত — হে অশ্বিনীদ্বয়, সেই দীপ্তি দান করো এই নারীকে।' স্মর্তব্য, কৃষ্ণ নিজেকে 'প্রবঞ্চকদের মধ্য দ্যূত — দ্যূতং ছলয়তাং' ব'লে ঘোষণা করেছিলেন (গী : ১০ : ৩৬)।

৫১। কীচক-সংক্রান্ত ব্যাপারটা সভাপর্বের শেষ অংশেরই একটি ক্ষুদ্রতর প্রকরণভেদ : দুটোতেই যুধিষ্ঠিরকে দেখি দ্যূতাসক্ত, আর দ্রৌপদী দুর্বিষহভাবে অবমানিত। এই পুনরুক্তি অর্থহীন নয়, এর ফলে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতব্যাধি আরো প্রকট হ'য়ে উঠলো। পাচকবেশী ভীমসেনকে জড়িয়ে ধ'রে দ্রৌপদী যত বিলাপ করেছিলেন (বিরাট : ১৮), তার একটি অংশ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 'যুধিষ্ঠির যার স্বামী তার দুঃখের অভাব কোথায়? ··· ওঠো, ভীমসেন, সেই দুর্দ্যূতাসক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তিরস্কার করো, যাঁর কর্মফলে আমি অশেষ কষ্ট পাচ্ছি। একবার সর্বস্ব হারিয়ে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রেও, তিনি ছাড়া আর কোন পুরুষ [আবার] দ্যূতক্রীড়ায় মেতে ওঠেন, তার দ্বারা অর্জন করেন জীবিকা?'

এই কথাগুলো যুধিষ্ঠির শুনতে পাননি, কিন্তু বিরাটপর্বের পরে তাঁকে আর পাশা খেলতে দেখা যায় না।

৫২। তফাৎটা স্পষ্ট করার জন্য যুধিষ্ঠিরের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত

করছি। বনপর্বে, দ্রৌপদীকে প্রবোধ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন (অ: ২৯): 'ক্রুদ্ধ ব্যক্তির যথার্থ তেজোগুণ নেই, মূর্খেরাই ক্রোধকে ভাবে তেজ, যিনি ক্রোধীর প্রতি ক্রুদ্ধ হন না তিনি আত্মপর উভয়কেই মহাভয় থেকে ত্রাণ করেন।… ক্ষমাই ব্রহ্ম ও সত্য, ক্ষমাই ধর্ম, শাস্ত্র ও বেদ, ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ ক'রে আছে।'

৫৩। একটি সুন্দর উৎপ্রেক্ষা উপস্থিত করার জন্য আমার অনুবাদ এখানে আক্ষরিক করেছি। মূলে আছে: 'সতাং পেয়ং যন্ন পিবন্ত্যসন্তো মন্যুং মহারাজ পিব প্রশাম্য।— যা পান করতে পারেন শুধু সাধুরা, অসাধুরা পারে না—মহারাজ, আপনি সেই ক্রোধ পান ক'রে শান্ত হোন।' প্রাকৃত বাংলায় আমরা যাকে বলি 'রাগ গিলে ফেলা,' তাতে ঈষৎ পরাজয় ও দীনতার ভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু এখানে সংযমের দিকটাই বড়ো হ'য়ে উঠেছে।

১২ : যুধিষ্ঠির ও অর্জুন

কত সুখ হ'তো আমাদের, যদি সঞ্জয়ের শেষ পরামর্শটি মেনে নিয়ে, এবং নিজের ইচ্ছার নির্দেশ অনুসারে, যুধিষ্ঠির যুদ্ধের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতেন — যদি সেই শোণিতস্রাবী আঠারো দিন ধ'রে আমরা তাঁকে চোখে না-দেখতাম — অথবা দেখতাম বলরামের মতো কোনো স্নিগ্ধ তীর্থে, কোনো নির্জন নদীতীরে বিশ্রান্ত[৫৪]। কিন্তু তিনি যে শুধু শারীরিকভাবে দূরে গেলেন না তা নয়, পারলেন না মনের দিক থেকেও স'রে যেতে: আমরা দেখছি জুয়োর মতোই জয়ের নেশাতেও মেতে উঠেছেন তিনি, আর সেজন্যে অন্যায় কাজও একের পর এক ক'রে যাচ্ছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই তিনি এক অসাধু প্রস্তাব জানালেন মাতুল শল্যকে[৫৫]; যুদ্ধের নবম দিনে, কৌরবপক্ষের অগোচরে, কোনো গুপ্তচরের মতো ভীষ্মের কাছেই ভীষ্মবধের উপায় জেনে নিলেন (ভীষ্ম: ১০৮); আর তারপর

কৃষ্ণের প্ররোচনায়, দ্রোণবধের উদ্দেশ্য নিয়ে উচ্চারণ করলেন অস্পষ্ট স্বরে সেই অর্ধ-সত্য, মর্মঘাতী মিথ্যা, সেই ইতিহাস-কুখ্যাত 'ইতি কুঞ্জরঃ' (দ্রোণ : ১৯১), যার ফলে তাঁর রথের চাকা — যা এতদিন চলতো মাটির উপর দিয়ে — তা তৎক্ষণাৎ নমিত হ'লো ভূমিতে; তাঁর 'দেবযান'-চ্যুতি চাক্ষুষভাবে ঘোষিত হ'লো। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এতটা পাপাচরণই যথেষ্ট ব'লে মনে করা যেতো, কিন্তু আমরা তাঁকে দেখছি হননমত্ত রণক্ষেত্রেও অবতীর্ণ — ভীষ্মের দিকে, দ্রোণের দিকে, এমনকি কর্ণের দিকেও অস্ত্র হাতে নিয়ে ধাবমান—সেই যুধিষ্ঠির, যিনি 'ধীর মৃদু লজ্জাশীল বদান্য' ব'লে কথিত ছিলেন এতদিন। তাঁকে যে প্রতিবার রণে ভঙ্গ দিতে হয়, প্রাণ বাঁচাতে হয় ভাইয়েদের সাহায্যে, কৃষ্ণের কাছে সান্ত্বনা নিতে হয় বার-বার — এগুলো অবশ্য তাঁর চরিত্রের সঙ্গে ঠিক মিলেঃযায়; এবং কর্ণ যে তাঁকে 'বেদ পাঠরত ব্রাহ্মণ' ব'লে বিদ্রূপ করলেন (কর্ণ : ৫০) তাতেও আমরা ঔচিত্য ছাড়া কিছু দেখতে পাই না। কিন্তু যুদ্ধের শেষ দু-দিনে যুধিষ্ঠির যেন শতকরা-একশো পরিমাণে ক্ষত্রিয় হ'য়ে ওঠেন; আমরা স্তম্ভিত হ'য়ে যাই কর্ণের প্রতি তাঁর জিঘাংসা দেখে, কর্ণের মৃত্যুতে তাঁর প্রগল্ভ উল্লাস যেন চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারি না (কর্ণ : ৬৪, ৯৭)। এবং এখানেই শেষ নয় — মাদ্রীভ্রাতা শল্যকে তিনি নিধন কবলেন স্বহস্তে — স্বহস্তে এবং প্রমত্তভাবে — সেই শল্যকে, যিনি মাত্র দু-দিন আগে চতুর কৌশলে কর্ণের হাতে প্রায় নিশ্চত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে (কর্ণ : ৬৪), এবং সেই যুধিষ্ঠির, যিনি একবার মৃতা বিমাতার একটি পুত্রকে জীবিত রাখার জন্য ভীম-অর্জুনকে বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন, আর দুর্যোধন-দূত উলূককে যিনি বলেছিলেন একটি পিঁপড়েকেও আঘাত করার তাঁর ইচ্ছে নেই (উদ্যোগ : ১৬১)! আর তারপর, যুদ্ধের উপর যবনিকাপাতের পূর্বমুহূর্তে, যখন ক্লান্ত, পরাজিত, হ্রদাশ্রিত দুর্যোধনের হতাশ্বাস খেদোক্তি শুনে যুধিষ্ঠির এক অতি

কঠিন হৃদয়হীন উত্তর দেন (শল্য : ৩২) : 'থামো ! ভেবো না করুণ কথা ব'লে আমার মনে দয়া জাগাতে পারবে তুমি — উঠে এসো — আমাদের হাতে যুদ্ধে প্রাণ দাও !' — তখন আর সহ্য করতে পারি না আমরা, কষ্ট জানাবার ভাষা খুঁজে পাই না, আমাদের গলা ছিঁড়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুধু বেরিয়ে আসে : 'যুধিষ্ঠির, তুমি !'

দুঃসহ নিশ্চয়ই, আমাদের পক্ষে প্রায় অভাবনীয় — এই যুদ্ধকালীন 'ধর্মরাজ' যুধিষ্ঠির। যদি যুদ্ধবিরতির সঙ্গে-সঙ্গেই মহাভারত সমাপ্ত হ'তো তাহ'লে, সন্দেহ নেই, যুধিষ্ঠির এক ভণ্ডচূড়ামণি ব'লে চিরকালের মতো চিহ্নিত হ'য়ে থাকতেন। কিন্তু দুর্যোধনের মৃত্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র-নিধনের পরেও আরো আট পর্ব ধ'রে চলে এই কাহিনী, কোনো মহাদেশব্যাপী নদীর মতো বিশাল থেকে বিশালতর হ'তে-হ'তে অবশেষে বিলীন হ'য়ে যায় সমুদ্রে : সেই দিগন্তকে স্মরণে আনলে অন্য এক ছবি আমরা দেখতে পাই। তখন বুঝি, যুধিষ্ঠিরের এই সব দুষ্কৃতিও যথোচিত ও সুসংগত, তাঁর 'দুর্দ্যূত'রূপ পাপের মতো[৫৬] এগুলিরও প্রয়োজন ছিলো তাঁর জীবনে। মধ্যপথে ধৈর্য হারালে চলবে না আমাদের, হৃদয়বৃত্তিকে অত্যধিক প্রশ্রয় দিলে চলবে না — ভেবে দেখতে হবে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে কী করতে চেয়েছেন ব্যাসদেব, মহাভারতের মহান পরিকল্পনা কী-ভাবে এবং কী-পরিমাণে যুধিষ্ঠিরের উপর নির্ভর করছে।

প্রথম কথা : আর কী করতে পারতেন যুধিষ্ঠির, আর কী উপায় ছিলো তাঁর ? সত্যি তো তিনি সুরাপায়ী নীলাম্বরধারী হলধর কোনো বলরাম নন, নন কোনো সূতবংশীয় রথচালক, তাঁরই খুল্লতাত এক দাসীপুত্রের মতো ক্ষত্রপদবি থেকেও বঞ্চিত হননি : — কেমন ক'রে তিনি ঘটনাজালের বাইরে থাকতে পারেন — সঞ্জয়ের মতো, বিদুরের মতো, বা গ্রীক নাটকের কোরাসের মতো শুধু দর্শক হ'য়ে, শুধু আখ্যাতা বা মন্তব্যকার হ'য়ে ? কার্যত

না হোক নামত তিনি রাজা, তাঁরই দোষে রাজত্ব নষ্ট হয়েছে, তাঁর পত্নী মাতা ভ্রাতারা আজ তেরো বছর ধ'রে তাঁরই দোষে কষ্ট পাচ্ছেন: তাঁরই রাজ্যের পুনরুদ্ধার-চেষ্টায় প্রাণান্ত পরিশ্রম করছেন তাঁর বন্ধুরা — এই অবস্থায় তিনি যদি দূরে চ'লে যান, বা যুদ্ধ বিষয়ে উদাসীন থেকে নিজে চান একা সুখী হ'তে, তা-ই কি হয় না নৈতিক অর্থে কাপুরুষোচিত আচরণ? এবং সেটা সম্ভবও নয় তাঁর পক্ষে, কেননা আত্মীয়দের প্রতি আসক্তি তাঁর গভীর। অতএব তাঁর শুভ্র হাত তাঁকে ডুবিয়ে দিতে হ'লো রক্তে, মেনে নিতে হ'লো অঙ্গুলিতে এক কলঙ্কচিহ্ন, যা তাঁর চিত্তকলুষেরই এক বাহ্যরূপ মাত্র[৫৭]। অথচ — আমরা জানি — যুদ্ধকে তিন সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেন, তাঁর মতো সহজাতভাবে হিংসাবিমুখ আর-কেউ নেই, 'আমি একটি পিঁপড়েকেও আঘাত করতে চাই না' — এ-কথা বলার সত্য অধিকার শুধু তাঁরই আছে। একদিকে তাঁর অন্তরাত্মার নির্দেশ, অন্যদিকে ঘটনাচক্রের অনতিক্রম্য দাবি ;- একদিকে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ, অন্যদিকে গোষ্ঠীর প্রতি, সমাজের প্রতি সুস্পষ্ট কর্তব্য :— অরণ্য থেকে বেরোনোমাত্র এই দ্বন্দ্বে ধৃত হয়েছেন যুধিষ্ঠির — অতি কঠিন ও সমাধানহীন দ্বন্দ্ব —কেননা সামরিক বৃত্তি তাঁর পক্ষে আত্মদ্রোহ ছাড়া আর-কিছু নয়, তাঁকে পীড়ন করতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি নিজেকেই, নিজেরই সঙ্গে বৈরিতায় তিনি লিপ্ত। যেমন সভাপর্বে, তেমনি কুরুক্ষেত্রেও তিনি নিরুপায় ; যেমন সেবারে তাঁকে অনীপ্সিত সিংহাসনে বসতে হয়েছিলো, তেমনি এখানেও তিনি অস্ত্রধারণে বাধ্য ; এখানেও তাঁর চারদিকে আছে শুভানুধ্যায়ী রক্ষক ও প্রহরীর দল — আরো তীক্ষ্ণ চোখে, আরো অনলসভাবে জাগ্রত — তাঁর আপনজনেরা, তাঁর প্রণয়াস্পদ চার ভাই, আর ভার্যা দ্রৌপদী ও মন্ত্রণাদাতা কৃষ্ণ — সবার উপর কৃষ্ণ, যিনি তাঁর দুশ্চেদ্য যুক্তি ও ব্যক্তিত্বের সম্মোহন দিয়ে

তাঁকে ক্ষমহীনভাবে বন্দী ক'রে রেখেছেন। এমনি চলে যুধিষ্ঠিরের জীবন — তাঁর অভিলাষ ও অবস্থার মধ্যে দ্বিখণ্ডিত, নিজের প্রতি ও অন্যদের প্রতি বিপরীত দায়িত্বে সংকটাপন্ন — উদ্যোগপর্ব থেকে আশ্বমেধিক পর্যন্ত অনবরত দোলায়মান। আর সেইজন্যেই — যেহেতু তিনি এত বেশি অস্থির ও অনিশ্চিত, যেহেতু বাধা তাকে জড়িয়ে আছে পায়ে-পায়ে, যেহেতু সংশয় তাঁকে নিস্তার দেয় না কখনো — তাই আমাদের মনের মধ্যে তিনি বড়ো হ'য়ে ওঠেন ক্রমশ, তাঁর সব স্খলন পতন মনস্তাপ ও স্ববিরোধের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই তাঁর মধ্যে একটি বিবর্তনরেখা, কোনো দুর্নিরীক্ষ্য নির্জন পথে যেন অতি ধীরে এগিয়ে চলেছেন তিনি। এই যুধিষ্ঠির, আর আমাদের পূর্বপরিচিত অর্জুন — এদের দু-জনকে তুলনা করলে এখন মনে হয় অর্জুন যেন সর্বদাই যেমন আছেন তেমনি, তাঁর বহির্জীবনে অসাধারণ জঙ্গমতা থাকলেও তাঁর মন যেন নিশ্চল। ঘটনার বাহুল্যে ও বৈচিত্র্যে তিনি তুলনাহীন, কিন্তু তার ফলে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তাঁর মনে অথবা জীবনধারায়; তিনি বোঝেননি যা ঘটছে তার অর্থ কী, পারেননি একটি ঘটনাকেও সত্যিকার অর্থে অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করতে। এক পরিণতিহীন চিরপ্রফুল্ল বালক যেন অর্জুন, যিনি শত্রু বলতে বোঝেন বধ্য, আর বধ্য বলতে বোঝেন যে-কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে, ভোগ্য বলতে বোঝেন বসুন্ধরা ও নারী, আর কৃত্য বলতে বোঝেন অধিকারবিস্তার — যাঁর সংকল্প ও সম্পাদনায় কোনো ব্যবধান নেই, যাঁর সুন্দর আননে চিন্তার ছায়া পড়ে না কখনো, উদ্যত বাহু দ্বিধার ভারে কখনো নেমে আসে না — যদিও একবার, মানবেতিহাসের এক তুঙ্গতম মুহূর্তে, এর ব্যতিক্রম ঘটেছিলো।

৫৪। মেঘদূত : পূর্বমেঘ : ৫০ দ্র।

বন্ধুপ্রীতিবশে যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ছিলেন যিনি, সেই বলরাম
সরিয়ে মনোমতো মদিরা, যাতে আঁকা রেবতীনয়নের বিম্ব,
নিতেন যার স্বাদ — সৌম্য, তুমি সেই সরস্বতী-বারি ভুলো না—
সেবন ক'রে হবে হৃদয়ে নির্মল, বর্ণে র'বে শুধু কৃষ্ণ।

(অনু : বুদ্ধদেব বসু)

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছে — ওদিকে বলরাম সরস্বতীর তীরে ব'সে আছেন, তাঁর সুপ্রিয় স্বচ্ছ মদিরায় পত্নী রেবতীর চোখের ছায়া পড়েছে, কিন্তু সেই সুরার বদলে তিনি পান করছেন সরস্বতীর জল — কালিদাসের এই ছবিটি বড়ো মনোরম। মহাভারতে আছে, বলরাম কোনো পক্ষেই যোগ দেননি, যুদ্ধের সময়টা তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণ ক'রে কাটিয়েছিলেন।

৫৫। শল্য কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছেন শুনে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, 'আপনি আমাকে কথা দিন কর্ণ-অর্জুনের যুদ্ধের সময় আপনি কর্ণের সারথি হ'য়ে তার তেজোহ্রাস করবেন। আমার মুখ চেয়ে এই কুকর্মটি আপনাকে করতেই হবে।' (উদ্যোগ : ৭)

৫৬। ভীম-দুর্যোধনে গদাযুদ্ধের উদ্যোগ যখন চলছে, তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন (শল্য : ৩৪) : 'আপনার সঙ্গে যেমন শকুনির একবার হয়েছিলো, তেমনি অন্য এক দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হ'লো এখন।' কথাটার সরল অর্থ এই যে সমকক্ষ বীর ভীম-দুর্যোধনের যুদ্ধের ফলাফল জুয়াখেলার মতোই অনিশ্চিত, কিন্তু কৃষ্ণ বোধহয় এও বলতে চান যে ভীমসেন শকুনির মতোই কাপট্যের দ্বারা জয়ী হবেন।

৫৭। যুদ্ধের পরে, গান্ধারীর কণিকামাত্র দৃষ্টিপাতে যুধিষ্ঠিরের নখগুলি কুৎসিত হ'য়ে যায় (স্ত্রী : ১৫)।

১৩ : গীতার পটভূমি

গীতা বলতে আমরা সাধারণত স্বতন্ত্র একটি পুস্তক বুঝি — নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও নিজেরই কারণে বরণীয় এক ধর্মকাব্য। এটি যে

মহাভারতের অন্তর্ভূত তা পৃথিবীতে কারো জানতে বাকি নেই, কোন সময়ে কোন উপলক্ষে এটি উদগীত হয়েছিলো তাও সর্বজন-বিদিত (যেহেতু পুঁথির আরম্ভেই তা উল্লিখিত হয়েছে):— কিন্তু মহাভারতের মূল দেহের মধ্যে এর প্রবর্তনা ঠিক কোন উপায়ে ঘটলো, এবং সেই মূল দেহের একটি অচ্ছেদ্য অংশ ব'লে এটি বিবেচিত হ'তে পারে কিনা — এ-সব প্রশ্ন, গীতার স্বীয় সারগর্ভতার জন্য অধিকাংশ পাঠক উত্থাপন করতে ভুলে যান, অথবা সেই সম্বন্ধটিকে আলোচনার যোগ্য ব'লে ভাবেন না। তত্রাচ, গীতা কোনো স্বনির্ভর গ্রন্থ নয়, মহাভারতের সামগ্রিক পরিকল্পনার অন্তরঙ্গ, এবং সেই পটভূমিকায় স্থাপন করলে গীতার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো — শুধু দুরবগাহ চিন্তা ও তিমিরবিদারক প্রজ্ঞা নয় — এক তীব্র নাটক, বিগত ও পরবর্তী ঘটনাবলির সঙ্গে যা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সেই সম্পর্কটি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে অর্জুনবিষাদের পূর্ববর্তী কয়েকটি অনুপুঙ্খ এখানে উপস্থিত করছি।

প্রথমেই স্মর্তব্য, মহাভারতের মধ্যে গীতা ঠিক 'আকাশ থেকে' পড়েনি, তারও দুটি পূর্বাভাস আমরা পেরিয়ে এসেছি। সঞ্জয়ের সন্ধিপ্রস্তাব শুনে যুধিষ্ঠির যখন টলমান, কৃষ্ণ তখন কর্মের পথে উদ্বোধিত করলেন যুধিষ্ঠিরকে (উদ্যোগ : ২৮) — সেই দৃপ্ত ভাষণটিকে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের একটি ভ্রূণরূপ বললে ভুল হয় না। আর-একবার, ভীমের মুখে অভূতপূর্ব শান্তির বাণী শুনে কৃষ্ণ তাঁকে যে-তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করলেন (উদ্যোগ : ৭৩–৭৪) তারও কোনো-কোনো অংশ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেতে পারতো[৫৮]। প্রথমে এই সব গুরুগুরু ধ্বনি, তারপর ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে, মানব-ভাগ্যের এক সংকটের সময় কৃষ্ণের কণ্ঠে বজ্রের বাঁশি বেজে উঠলো। — কিন্তু সেই বিখ্যাত 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' পর্যন্ত পৌঁছবার আগে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

দৃশ্যটিকে কল্পনা করা যাক। যার জন্য বহুকাল ধ'রে প্রস্তুতি চলছে, সেই যুদ্ধ এখন ঘোষিত ও উপস্থিত। উদ্যোগপর্বে আমরা শুনেছি উভয় পক্ষের সামরিক শক্তির বিবরণ, জেনেছি প্রধান যোদ্ধারা কে কত রণতুর্মদ; — আর দেখেছি ভীষ্মপর্বের আরম্ভেই গণনাতীত দুই সেনাবাহিনীকে মুখোমুখি— কৌরবেরা পশ্চিমদিকে আর পাণ্ডবেরা পূর্বদিকে মুখ ক'রে — হেমন্তের এক অসাধারণ প্রভাতে, সূর্য যেদিন উদয়কালে ছিলো দ্বিখণ্ডিত আর আকাশে ছিলো সাতটি গ্রহের সমাবেশ। আমরা উৎসুক হ'য়ে উঠেছি যুদ্ধঘটনা দেখার জন্য, অবস্থিত আছি উৎকণ্ঠিত সেই কয়েকটি মুহূর্তে, যখন প্রেক্ষাগৃহে আলো নিবে গেছে আর কম্পমান যবনিকা শুধু উদ্ভাসিত, আর দূর থেকে ভেসে আসছে তূরী ভেরী দুন্দুভির ধ্বনি — আপাতত ক্ষীণ ও অর্ধশ্রুত, কিন্তু একটু পরেই যা প্রচণ্ড হ'য়ে উঠবে অশ্বের খুরে রথের চাকায় অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায়। বহুক্ষণ ধ'রে সজ্জিত এই মঞ্চের উপর অবশেষে যবনিকা উঠলো, কিন্তু আমাদের আশা পূরণ হ'লো না; আমাদের কৌতূহলকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে মহাভারতের কবি একটি গর্ভাঙ্কের অবতারণা করলেন; ভীষ্ম ভীম অর্জুন দুর্যোধন ইত্যাদিকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন ধৃতরাষ্ট্র ও ব্যাসদেবকে — দু-জনেই অযোদ্ধা, একজন প্রাচীন আর অন্যজন প্রাচীনতর, একজন অন্ধ আর অন্যজন ত্রিকালদর্শী (ভীষ্ম: ২)। 'পুত্র, এই যুদ্ধে তোমার পুত্রেরা ও অন্যান্য রাজগণ বিনষ্ট হবে; তুমি শোক কোরো না, কালবিপর্যয় লক্ষ করো। যদি যুদ্ধঘটনা প্রত্যক্ষ করতে চাও আমি তোমাকে দৃষ্টি দিতে পারি।' উত্তরে কুরুরাজ বললেন, 'আমি জ্ঞাতিনিধন চোখে দেখতে চাই না, কিন্তু বিবরণ শুনতে চাই।' পুত্রের এই আকাঙ্ক্ষা তৎক্ষণাৎ পূরণ করলেন ব্যাসদেব; যুদ্ধের ধারাবিবরণীর কথক হিশেবে সঞ্জয়কে নিযুক্ত করলেন। আর এমনি ক'রে সূত সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে, ব্যাসদেব রচনা করলেন কুরুক্ষেত্র-

কথা[৫৯] — তখনকার মতো ধৃতরাষ্ট্রকে এবং চিরকালের মতো জগৎবাসীকে শোনাবার জন্য। অর্থাৎ যুদ্ধ ও আমাদের মধ্যে একটি ব্যবধান রচিত হ'লো, এমন একটি ভান করা হ'লো যেন যুদ্ধ আমরা 'দেখছি' না, শুধু 'শুনছি' ; — যেন গ্রীক নাটকের ধরনেই ভীষণ ঘটনাগুলি অনুষ্ঠিত হ'লো নেপথ্যে, আমরা দূতের মুখে তার বিবরণ শুনলাম।

কিন্তু গ্রীক নাটকের দ্রুতি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মহাভারতের অত্বরতাও অপরিসীম; এত বেশী পার্শ্বকথন অন্য কোনো এপিককাব্যে আমরা দেখিনি। ব্যাসদেব চ'লে যাওয়ামাত্র যুদ্ধঘটনা আরম্ভ হবার কোনো বাধা ছিলো না — কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র, যেন যুদ্ধ ব্যাপারটিকে ভালোভাবে বুঝে নেবার জন্য, একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করলেন। 'রাজারা ভূমিলিপ্সু ব'লে পরস্পরকে সহ্য করতে পারেন না, যুদ্ধে অস্ত্রাঘাত করেন পরস্পবকে — কিন্তু কেন, সঞ্জয়, কী-গুণ এই ভূমির, যেজন্য এঁদের মারতে অথবা মরতে কোনো দ্বিধা নেই?' এর পর চলে সুদীর্ঘ বিশ্ববিবরণ (ভীষ্ম : ৪-১২)— ভূগোল ও ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা ও নক্ষত্রবিজ্ঞান পরিক্রম ক'রে সঞ্জয় সুন্দরভাবে উপস্থিত মুহূর্তে ফিরে এলেন: 'মহারাজ, এই সেই দেশ ভারতবর্ষ, যেখানে এখন আছি আমরা, আর অতীতে যেখানে অনেক পুণ্য প্রচারিত হয়েছিলো—' এবং (সঞ্জয়ের এই অনুক্ত কথাটা আমরা যোগ না-করে পারি না)— এবং যেখানে বর্তমানে এক মহাযুদ্ধ আরব্ধপ্রায়[৬০]।

এতক্ষণে অবশ্য আমাদের ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে গেছে, আমরা মনে-মনে বলছি—'যবনিকা উত্তোলিত হ'য়েও হ'লো না কেন, আর কতক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের, নাটক কখন আরম্ভ হবে?' আর সঞ্জয়, যেন আমাদের অধৈর্য বুঝে নিয়ে, অকস্মাৎ এক চমকপদ বার্তা শোনালেন, 'মহারাজ, ভীষ্ম নিহত হয়েছেন। আশ্চর্য, যে ভারতবর্ষ-বর্ণনের পরে সঞ্জয়ের মুখে এ-ই হ'লো প্রথম উক্তি ; আশ্চর্য,

যে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সামনে 'সহসা উপস্থিত' হলেন এই দুঃসংবাদ নিয়ে। পুঁথিতে আছে, 'ভূতভব্যভবিষ্যবিৎ' সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে এই বার্তা জানিয়েছিলেন, কিন্তু উক্তিটির চমৎকারিত্ব তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না; কেননা যুদ্ধ কখন আরম্ভ হ'য়ে একেবারে ভীষ্মের পতন ও শরশয্যা পর্যন্ত এগিয়ে গেলো, সেই সবই অগোচর রইলো আমাদের — হঠাৎ শুধু ঘোষণা শুনলাম, 'ভীষ্ম হত!' যাঁকে আমরা ধারণা করেছি সরল ও আত্ম-অচেতন ব'লে, যাঁর রচনায় কোনো যত্নসাধিত করুকর্ম আমরা আশা করি না, সেই অতি-মন্থরগামী অতিকথনপ্রিয় কবির মধ্যে আমরা এখানে দেখতে পাই প্রায় একটি শিল্পচেতন চাতুরী, প্রায় একটি নাট্যকারশোভন কৌশল; — প্রথমেই এই প্রবল অভিঘাত দিয়ে, আমাদের শিথিলীকৃত অভিনিবেশকে সংহত ক'রে, আমাদের অসাড়-হয়ে-যাওয়া কৌতূহলকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে, তিনি আবার চাকা ঘুরিয়ে আনলেন[৬১] আমাদের সামনে উদঘাটন করলেন রণাঙ্গন — আবার সেই অগ্রহায়ণের প্রাতঃকাল, মুখোমুখি দুই সৈনিকসংঘ অপেক্ষমাণ। 'কী করলো আমার পুত্রেরা ও পাণ্ডবেরা মিলে কুরুক্ষেত্রে?' — ধৃতরাষ্ট্রের এই অতি সরল প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ হ'লো সংলাপ, উত্তরে নয় শ্লোক জুড়ে সঞ্জয় শোনালেন দ্রোণের কাছে দুর্যোধনের আবেদন — যেন ভীষ্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা হয় (যে-ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদ আমরা আগেই শুনেছি)—ভাবটা যেন যুদ্ধের দৃশ্য এখনই উন্মোচিত হবে। আর বস্তুত, সময়সূচনার সংকেত জানিয়ে ভীষ্ম তখনই শঙ্খনাদ করলেন, আকাশে-আকাশে প্রতিধ্বনিত হ'লো আরো অনেক শঙ্খ, ঢাক, তূরী, মৃদঙ্গ; আর অর্জুন — দুই সেনানীর মধ্যস্থলে তাঁর কৃষ্ণচালিত কপিধ্বজ রথে আরূঢ় — বীর বাহু তুলে ধনুঃশর যোজিত করলেন। কিন্তু ঠিক সেই চরম মুহূর্তেই ঘটনাস্রোত বিঘ্নিত হ'লো আরো একবার: হন্তব্য শত্রুর রূপে নিকটতম আত্মীয়দের দেখে অর্জুনের চোখে অবিশ্রান্ত অশ্রু উদ্গত হ'লো,

পাপের ভয়ে কেঁপে উঠলো তাঁর স্নায়ুতন্ত্র, তাঁর হাত থেকে খ'সে পড়লো গাণ্ডীব, তাঁর কণ্ঠ থেকে — এই প্রথমবার বাষ্পজড়িত তাঁর কণ্ঠ থেকে অকল্পনীয় এক উক্তি বেরোলো : 'ন যোৎস্যে — আমি যুদ্ধ ক র বো না।' আর এই অবসাদের উত্তরে, বীরের পক্ষে অতি অযোগ্য এই 'হৃদয়দৌর্বল্যে'র উত্তরে উত্থিত হ'লো মহান এক প্রতিবাদ : 'মা সাহসং কার্ষীম্'-এর বিরুদ্ধে এক ওজস্বী নির্ঘোষ, যুধিষ্ঠির-কথিত 'ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা তপঃ ক্ষমা সত্যম্'-এর বিরুদ্ধে এক নিষ্করুণ নির্দেশ — 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ! ··· স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ!' আর তারপর আর-কিছু নেই, মঞ্চে শুধু কৃষ্ণ আর অর্জুন, আর সেই মঞ্চ নিখিলবিশ্বে পরিব্যাপ্ত ; আর আছি আমরা — সর্বকালীন সর্বমানবিক শ্রোতৃমণ্ডলী — শুনছি 'তিন বছরের শিশুর মতো' মুগ্ধ — কোনো বৃদ্ধ নাবিকের মুখে নিশ্বাসহারক আশ্চর্য কোনো কাহিনী নয়, নয় ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে যুদ্ধ-ঘটনা — সে-বিষয়ে আমাদের কৌতূহলও এখন নির্বাপিত — শুনছি ধর্মের কথা, ধর্মের আহ্বান, ধর্মের প্রত্যাদেশ।

৫৮। যেমন এই তিনটি শ্লোক (উদ্যোগ : ৭৫ ; ১৭-১৮, ২২, আর্যশাস্ত্র সং) :

অহো নাশংসসে কিঞ্চিৎ পুংস্ত্বং ক্লীব ইবাত্মনি।
কশ্মলেনাভিপন্নোঽসি তেন তে বিকৃতং মনঃ॥
উদ্বেপতে তে হৃদয়ং মনস্তে প্রতিসীদতি।
উরুস্তম্ভগৃহীতোঽসি তস্মাৎ প্রশমমিচ্ছসি॥
··· ··· ···
স দৃষ্ট্বা স্বানি কর্মাণি কুলে জন্ম চ ভারত।
উত্তিষ্ঠস্ব বিষাদং মা কৃথা বীর স্থিরো ভব॥

—'তুমি মোহাচ্ছন্ন হয়েছো, ক্লীবের মতো নিজেকে ভাবছো পুরুষত্বহীন, তোমার মন এখন বিকারগ্রস্ত।

'তোমার হৃদয় কাঁপছে, মন অবসন্ন হয়েছে, তুমি উরুস্তম্ভে অভিভূত

হয়েছো (শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারছো না)। তাই তুমি শান্তির জন্য ইচ্ছুক।

'দৃষ্টিপাত করো তোমার স্বীয় কর্মসমূহের দিকে, স্মরণ করো কোন কূলে তোমার জন্ম। উঠে দাঁড়াও, বিষাদ ত্যাগ করো — হে বীর, তুমি স্থির হও।'

'কশ্মল' (মোহ) ও 'ক্লৈব্য' শব্দ দুটি গীতায় কৃষ্ণের উক্তির আরম্ভেই পাওয়া যায়।

৫৯। সঞ্জয়কে বর দিতে গিয়ে ব্যাসদেব যা বলেছিলেন তার সারাংশ এই: 'ইনি সব ঘটনা দেখতে পাবেন, অন্যদের স্বগতোক্তিও শুনতে পাবেন, দিনে-রাত্রে কিছুই এঁর অজানা থাকবে না। ইনি তোমাকে বলবেন অবিকল যুদ্ধবৃত্তান্ত, আর আমি সর্বজগতে কুরুপাণ্ডবের কীর্তিকাহিনী প্রচার করবো।' — ভীষ্মপর্ব চতুর্থ থেকে সৌপ্তিক নবম অধ্যায় পর্যন্ত সমস্তটাই সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপ ; দুর্যোধনের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই সঞ্জয়ের ব্যাস-দত্ত দিব্যদৃষ্টি প্রত্যাহৃত হয়।

কথকতার জন্য ব্যাস কেন সঞ্জয়কে বেছে নিলেন তার কারণ, খুব স্পষ্ট। গবল্গন-পুত্র সঞ্জয় 'মুনিতুল্য' মানুষ (আদি : ৬৩ দ্র), অথচ তাঁর পৈতৃক ও স্বকীয় বৃত্তি সূতের, আর সূত বলতে বোঝায়—শুধু রথচালক নয়, প্রধানত চারণ ও বীরকাব্য-কথক। মূল ধারণাটি মনে হয় বাহকের : অর্থাৎ, তিনিই সূত, যিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যান — রথে চড়িয়ে লোকেদের, কাব্য আবৃত্তি ক'রে কীর্তিকাহিনীকে। সূতেরা যে-দৌত্যকর্ম ক'রে থাকেন, তাও শুধু দুই রাজার মধ্যবর্তী হ'য়ে নয় — পুরাণকথকের ভূমিকায় তাঁরা একের সঙ্গে অন্য বহু মনের সংযোগসাধক। স্মর্তব্য, আমরা যার মুখ থেকে মহাভারত শুনছি সেই সৌতির নামের আক্ষরিক অর্থ 'সূতপুত্র', তাঁর নিজস্ব নাম উগ্রশ্রবা।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায় অনুসারে ব্রাহ্মণ-বৈশ্যের মিশ্রণজাত সন্তানকে বলে 'অম্বষ্ঠ' আর 'সূত' বলে তাদের যারা বিপ্রকন্যা ও ক্ষত্রিয় পুরুষের সন্তান (শ্লোক : ৮, ১১)। সেখানে আরো অনেক সূক্ষ্ম ভেদ করা হয়েছে, কিন্তু কার্যত মনে হয়, অসবর্ণ-মিলনোদ্ভূত যে-কোনো ব্যক্তি 'সূত' আখ্যা প্রাপ্ত হতেন বা হ'তে পারতেন। বর্ণসাংকর্যের কারণে তাঁদের বেদপাঠে অধিকার ছিলো না, কিন্তু বেদবহির্ভূত নিখিলবিদ্যা তাঁদের অধিগম্য ছিলো। সূতেরাই আদি মহাভারত রামায়ণ ও প্রাচীনতর পুরাণসমূহের রচয়িতা ও

প্রচারক, এ রকম একটি মত পণ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে।

৬০। আমার মনে হয় সঞ্জয়-কথিত ভূবৃত্তান্তে যুদ্ধ বিষয়ে একটি মন্তব্য নিহিত আছে। ভূমি কেন লোভনীয় ধৃতরাষ্ট্র তা ভালোই জানেন, কিন্তু এতদিন শুধু সন্নিকটভাবে লোভনীয় ব'লে জেনেছেন তাকে; কত বৎসল ও বৃহৎ এই পৃথিবী, কত উদার ও সম্পদশালী এই ভারতবর্ষ — কত বিভিন্ন জীব ও জাতির প্রতিপালিকা এই পৃথিবী, প্রকৃতির কত সহস্র দানে শ্রীমণ্ডিত এই ভারতবর্ষ — তার সবিস্তার বর্ণনা শুনতে-শুনতে ধৃতরাষ্ট্র হয়তো বেদনাহত বিস্ময়ের সঙ্গে বুঝেছিলেন যে ধনলাভের জন্য কুলধ্বংসী যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু তখন একেবারে শেষ মুহূর্তে — কোনোরকম পুনর্বিবেচনার সময় নেই।

৬১। এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে উপস্থাপনার এই বিস্ময়টুকু দৈবাৎ ঘ'টে গেছে, বরং মনে হয় এই অংশের ঘটনাবিন্যাস সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। পূর্বেই বলেছি, মহাভারত প্রসঙ্গে প্রক্ষিপ্ত কথাটার আমি কোনো অর্থ পাই না, কেননা ধুরন্ধর পণ্ডিতেরা 'মৌলিক' মহাভারতের স্বরূপ বিষয়ে একমত নন। কিন্তু যদি ধ'রেও নেয়া যায় যে কোনো-এক আনুমানিক আদি গ্রন্থে গীতা-কাব্যটি সংযোজিত হয়েছিলো, তবু মানতেই হবে এই প্রক্ষেপের যিনি প্রণেতা ও সম্পাদক, তিনি শুধু এক জগৎবরেণ্য কবি নন, অসমান্য নাট্যবোধেরও অধিকারী। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে বপুষ্মান ভারত-কথার মধ্যে ভীষ্মপর্বের প্রারম্ভে ছাড়া অন্য কোথাও এই অর্জুন-কৃষ্ণ-সংলাপটি সন্নিবিষ্ট হতে পারতো না, এবং পূর্ববর্তী ঘটনাবলির সঙ্গেও এটি নানা সূত্রে সম্পৃক্ত; সভাপর্বে ও উদ্যোগপর্বে এই অগ্রিম প্রতিধ্বনি আমরা শুনেছিলাম, পরেও এর উল্লেখ আমরা দেখতে পাবো। সব স্বীয় মহিমা নিয়েও গীতা মহাভারতেই সংলগ্ন; যাঁরা মহাভারতের সমগ্র কাহিনী বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁরা গীতার সর্বায়তনিক রূপটি দেখতে পাবেন না। এও লক্ষণীয় যে গীতার কবি মাঝে-মাঝেই নেমে আসেন তাঁর ধ্যানের ঊর্ধ্বলোক থেকে উপস্থিত মুহূর্তে, আমাদের ভুলতে দেন না এটা কুরুক্ষেত্র, এক মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণ। এই সবই প্রমাণ করে, বা অন্তত আমাদের মনে প্রতীতি জন্মায়, যে পণ্ডিতবর্গের অনুমিত ও অনির্ধারিত 'আদি' মহাভারতেরই একটি অচ্ছেদ্য অংশ হ'লো গীতা। এই ধারণার সমর্থনে বালগঙ্গাধর টিলকের ভাষাতত্ত্ব-

ভিত্তিক যুক্তিসমূহ প্রণিধানযোগ্য ('গীতারহস্য' : বঙ্গানুবাদ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিশিষ্ট ১, "গীতা ও মহাভারত" প্রবন্ধ দ্র)।

পরে আরো একবার এই নাটকীয় পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায় : ধৃতরাষ্ট্রকে প্রথমেই কর্ণবধের বার্তা শুনিয়ে (কর্ণ : ৪) সঞ্জয় পরে বললেন সেনাপতি-পদে কর্ণের অভিষেক-বৃত্তান্ত (কর্ণ : ১১)। কিন্তু সেখানে অভিঘাত দুর্বল।

১৪ : ধর্ম : অধর্ম : স্বধর্ম

— ধর্ম ! ধর্ম ! ধর্ম ! কতবার আমাদের শুনতে হ'লো ধর্ম — ভীষ্মের মুখে, বিদুরের মুখে, ব্যাসের মুখে, নারদের মুখে — সবচেয়ে বেশি যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে — অবিরাম অফুরন্তভাবে পুনরুক্ত ! এবং শুধু তত্ত্বজ্ঞানীরাই নন — এই দ্বিমাত্রিক ভারবান শব্দটি মুখে না-এনে ভীম কর্ণ কুন্তী দ্রৌপদীও তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পারেন না : কুরুপাণ্ডবের বিরোধের আরম্ভ থেকে উদ্যোগপর্বের শেষ পর্যন্ত সহস্রবার আবৃত্ত হ'লো কথাটা, নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত, ব্যাখ্যাত ও বিমর্দিত হ'লো। আর সেই বিতণ্ডা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে পারলাম শুধু এই কথাটুকু যে 'ধর্মের গতি সূক্ষ্ম' ! সূক্ষ্ম — অনির্ণেয় — আমাদের পক্ষে প্রায়শই বিভ্রান্তিজনক। যা ঘটছে এবং যা মুখে বলা হচ্ছে, সে-দুটোর তুলনা ক'রে আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি যে ধর্ম এক বহুরূপী ধারণা : তা পারে অনেক বিপরীত আচরণকে সমর্থন জোগাতে, তার পতাকার তলায় যুধিষ্ঠিরের পাশেই আশ্রয় দিতে পারে ভীমসেনকে, ক্ষমাকে স্থান দিতে গিয়ে প্রতিহিংসাকে বর্জন করে না। কত অনিশ্চিত এই ধর্ম, সংকটকালে কত অনির্ভরযোগ্য, তা মর্মে-মর্মে আমরা অনুভব করলাম দ্যূতসভায়, যখন দ্রৌপদীর

আর্তিময় প্রশ্ন শুনে কুরুবৃদ্ধেরা নীরব রইলেন, যুধিষ্ঠির নিস্পন্দ, মহামতি ভীষ্মের মুখেও কোনো সদুত্তর জোগালো না[৬২] : তেমনি, উদ্যোগপর্বের যানসন্ধি ও ভগবদ্‌যান পর্বাধ্যায় দুটি জুড়ে যুদ্ধনীতি ও সামনীতি নিয়ে যে-দীর্ঘায়িত বাদানুবাদ চলে, সেখানেও আমরা যেন ধাঁধায় প'ড়ে গিয়েছিলাম, ভেবে পায়নি কাকে ছেড়ে কার পক্ষ নেবো, সকলের কথাই কোনো-না-কোনো দিক থেকে যুক্তিসংগত ব'লে মনে হয়েছে আমাদের, দুর্যোধনের দর্পিত রণহুংকারকেও সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করতে পারিনি। কিন্তু এইমাত্র, কৃষ্ণের ভাষণ আরম্ভ হওয়ামাত্র কেমন আশান্বিত হ'য়ে উঠেছি আমরা, মনে হচ্ছে আমাদের এতদিনের সব অবরুদ্ধ প্রশ্নের উত্তর তিনি জানেন; ধর্মের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ — যদি কেউ পারেন, তিনিই দিতে পারবেন আমাদের। আর সত্যিও, প্রথম কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই আমরা তাঁর মুখ থেকে উপহার পেলাম দুটি নতুন সূত্র, যেন মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরার মতো দুটি ধারণা : নিষ্কাম কর্ম, ও স্বধর্ম (গী : ২ : ৪৭, ৩ : ৩৫)।

কিন্তু কোনোটাই আনকোরা নতুন নয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা আছে (৪ : ৪ : ৬), এবং যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেক আগেই আমরা শুনেছিলাম তিনি ফলাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে কর্ম করেন না (বন : ৩১); আর 'স্বধর্ম', এবং প্রায় একই অর্থবহ 'স্বকর্ম' কথাটাও ইতিপূর্বে আমাদের শ্রুতিগোচর হয়েছে — অনেকবার — কখনো কৃষ্ণের, কখনো অন্যদের মুখ থেকেও। 'আমি স্বধর্ম পালন ক'রে থাকি, প্রজাদের পীড়ন করি না — আমার অপরাধ কোথায় ?'— নিজের সমর্থনে এই যুক্তি দিয়েছিলেন জরাসন্ধ, যখন ব্রাহ্মণবেশী কপট কৃষ্ণ তাঁর অভ্যর্থনায় অনাদর দেখালেন (সভা : ২১)। 'স্বকর্ম ত্যাগ করলে অধর্ম হয়' — এ-ই হ'লো বনপর্বের ধর্মব্যাধ-দত্ত উপদেশের চুম্বক (অ : ২০৭)। আর, যখন দুকুলহারা দুঃখিনী অম্বাকে

ভীষ্মের হাতে সঁপে দিতে চাইলেন পরশুরাম (উদ্যোগ : ১৭৮), তখন গুরুর আজ্ঞা উপেক্ষা ক'রে ভীষ্ম বলেছিলেন : 'আমি ইন্দ্রের ভয়েও স্বধর্ম ত্যাগ করবো না।' স্পষ্টত, প্রসঙ্গভেদে কথাটার অর্থেও তফাৎ হ'য়ে যাচ্ছে—'স্বধর্ম' ও 'স্বকর্ম' বলতে জরাসন্ধ ও ধর্মব্যাধ বুঝেছেন যথাক্রমে রাজার পক্ষে ও মাংসবিক্রেতার পক্ষে যোগ্য সদাচার, আর ভীষ্ম তাঁর চিরকৌমার্যের প্রতিজ্ঞাকেই নাম দিয়েছেন 'স্বধর্ম'। যুধিষ্ঠিরও তাঁর হ্রদপ্রান্তিক পরীক্ষার সময় দু-বার ব্যবহার করেছেন কথাটা : 'স্বধর্মে নিষ্ঠাই তপস্যা,' 'স্বধর্মে স্থিরতাই স্থৈর্য।' এখন প্রশ্ন এই—স্বধর্ম তাহ'লে কী? যুধিষ্ঠির ঐ শব্দের দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, আর গীতার উক্তিকেই বা কোন অর্থে আমরা গ্রহণ করবো?

যুধিষ্ঠিরের স্বধর্ম কী, এবং সেটি তাঁকে কতদূর পর্যন্ত আশ্রয় দিতে পেরেছিলো, তা আমরা কিছুক্ষণ পরে দেখতে পাবো; আপাতত গীতার কৃষ্ণকে অনুধাবন করা যাক। বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্মই স্বধর্ম — এ-ই হ'লো কৃষ্ণের কথার সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যা, এবং তাঁরই কোনো-কোনো উক্তির মধ্যে এই অর্থটি সংশ্লিষ্ট নেই তাও নয়। যেমন, ২ : ৩১-৩৪-এ, তিনি যখন অবসন্ন বীরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন তিনি ক্ষত্রিয়, তাঁর পক্ষে কীর্তিত্যাগ মানেই ধর্মনাশ, তখন মনে হ'তে পারে তিনি বর্ণানুযায়ী কর্মের কথাই ভাবছেন। 'বর্ণাশ্রম' শুনে আমরা অবশ্য প্রথম ধাক্কায় প্রতিহত হই — না-হ'য়ে পারি না, কেননা আমরা কালস্রোতে অনেক দূরে স'রে এসেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কৃষ্ণের কাছে — বা গীতার প্রণেতার কাছে — বর্ণাশ্রমের বাস্তব সংলগ্নতা খুব স্পষ্ট ও খুব সত্য ছিলো — ছিলো সেই সমাজশৃঙ্খলারই নামান্তর, যা মানবসভ্যতার প্রাথমিক শর্ত, যার বিহনে মানুষ কখনোই সৃষ্টিশীলভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। অর্থাৎ কৃষ্ণের ভাষায়, ও সমগ্র মহাভারতের ভাষায়, বর্ণাশ্রম ধর্ম ঠিক তা-ই, যাকে আজকাল আমরা

বলি সামাজিক কর্তব্য। যে যার নির্দিষ্ট কাজ ঠিকমতো না-করলে জীবনের স্রোত অবরুদ্ধ হয়, এই কথাটা চিরকালীন সত্য, এবং এর দিকে লক্ষ রেখেই মহাভারতে বারংবার বলা হয়েছে যে সেই রাজাই ধন্য, যাঁর রাজত্বে চতুর্বর্ণ স্ব-স্ব কর্মে নিষ্ঠাপরায়ণ।

এ পর্যন্ত কথাটা খুব সহজ। যিনি যে-বৃত্তি নিয়েছেন বা প্রাপ্ত হয়েছেন — হোক তা কৌলিক বা বৃত, আশৈশব অভ্যস্ত বা রুচির নির্দেশে অর্জিত, যে-কাজের যিনি যোগ্য অথবা যাঁর পক্ষে যোগ্য যে-কাজ, এবং যেটা তাঁর দৈনন্দিন জীবিকার উপায়, সেটাই তাঁর স্ব-ধর্ম। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় আরো একটি স্তর পাওয়া যায় : কাজের মধ্যে উচ্চ-নীচের যে-তারতম্যে আমরা অভ্যস্ত, এবং যেটা ব্রহ্মারই বিধান ব'লে শোনা যায়, কৃষ্ণের কাছে তার কোনো অস্তিত্ব নেই ; তিনি বলতে চান কোনো তথাকথিত হীন কর্ম ক'রেও আমরা হ'তে পারি পুণ্যলোকে উত্তীর্ণ, যদি শুধু সেই স্বকর্মে আমাদের একান্ত অভিনিবেশ থাকে। মহাভারতে এর মহৎ উদাহরণ আমাদের পূর্বোক্ত ধর্মব্যাধ, যিনি জাতিতে শূদ্র, জীবিকায় পশুমাংসবিক্রেতা, অথচ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৌশিক যাঁর কাছে ধর্মের তত্ত্ব শিখে নিয়েছিলেন। কিন্তু মহত্তর উদাহরণ পাই বৌদ্ধ সাহিত্যে, মিলিন্দপহ্নের সেই বিস্ময়কর কথিকায়[৬৩], যেখানে বিন্দুমতী, পাটলিপুত্রের প্রথিত এক বারাঙ্গনা, রাজা অশোকের ও বিপুল জনমণ্ডলীর চোখের সামনে গঙ্গার স্রোতকে উল্টো দিকে বইয়ে দিয়েছিলো। 'তুমি — নীতিজ্ঞানহীন কলঙ্কিনী পণ্যস্ত্রী — তুমি এই অসাধ্যসাধন করলে কী ক'রে?' অশোকের কাছে বিন্দুমতীর উত্তর : 'প্রভু, আমি জানি আমি ব্যভিচারিণী, কিন্তু আমার সৎক্রিয়া আমাকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছে।' 'সৎক্রিয়া? তার অর্থ?' এই প্রশ্নের বিন্দুমতী যে-উত্তর দিয়েছিলো তার একটি পরিহাসরঞ্জিত প্রকরণ পাই 'দশকুমারচরিত'-এ, কিন্তু এখানে কৌতুকের চিহ্নমাত্র নেই, দণ্ডীর নায়িকার মতো ধূর্ত নয়

বিন্দুমতী, তার নিজের ধরনে — তার গণিকাবৃত্তির ধর্ম অনুসারে — সে সাধ্বী। 'যারা আমাকে ধনদান করে — হোক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় — আমার চোখে তারা সকলেই নির্ভেদ। কেউ আমার পূজ্য নয়, কেউ আমার ঘৃণ্য নয় — আমি সমানভাবে যে-কোনো অর্থীর সেবা ক'রে থাকি। এ-ই আমার সৎক্রিয়া।' থেরী-গাথার অম্বপালী ও মহাভারতের পিঙ্গলা (শান্তি : ১৭৪) — আমাদের পরিচিত এই অন্য দুই গণিকার 'ধর্মান্তর' ঘটেছিলো; কিন্তু বিন্দুমতীকে মনে হয় কৃষ্ণের শিষ্যা ও ধর্মব্যাধের মানসভগিনী; স্বকর্মে অমনোযোগই তার কাছে পাপ, তার মতে ধর্মান্তরগ্রহণই অধর্ম।

মহাভারতের অনেক অংশে দেখি, বর্ণাশ্রমের কথা উঠলে বিদুর বা ভীষ্মের মতো জ্ঞানীরাও মনুসংহিতারই চর্বিতচর্বণ করেন[৬৪]। কিন্তু কৃষ্ণ শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নন, এক স্বজ্ঞাবান পুরুষ; তিনি জানেন যে বিধান-সমূহ নির্বিশেষ হ'লেও সব মানুষ এক ছাঁচে গঠিত হয় না; তাঁর চোখে সমাজ যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি মানুষের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য মূল্যবান। তাঁর গীতাকথন যত এগিয়ে চলে তত আমরা অনুভব করি যে তাঁর কাছে বর্ণাশ্রম কোনো আদিসত্য নয়, নয় সেই 'জাতিভেদে'র নামান্তর, যাকে অর্বাচীন হিন্দুরা এক যান্ত্রিক ও বুদ্ধিহীন প্রথায় পরিণত করেছিলো। আরো লক্ষণীয় : কৃষ্ণের মুখে ব্রাহ্মণের স্তব বা শূদ্রের নিন্দা শোনা যায় না কখনো; তিনি শুধু বলেন মানুষে-মানুষে ভেদ আছে। এই ভেদের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই 'ঋগ্বেদের বিখ্যাত পুরুষ-সূক্তে (১০ : ৯০), এবং সেখানেও ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদির মধ্যে মূল্য-বিচার করা হয়নি; কিন্তু কৃষ্ণ এর সঙ্গে নূতন একটি মানবিক সূত্র যোগ করলেন। 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' (গী ৪ : ১৩) — এখানে গুণ ও কর্মের উল্লেখের ফলে কৃষ্ণের বক্তব্য একদিকে বেদের ও অন্যদিকে মনুসংহিতার সীমা পেরিয়ে গেলো। এর পর

চতুর্দশ অধ্যায়ে তাঁর 'গুণত্রয়বিভাগে'র ব্যাখ্যা শুনে আমরা বুঝি যে কৃষ্ণ এখানে যা নিয়ে কথা বলছেন, আধুনিক ভাষায় তাকেই বলে মনস্তত্ত্ব। চতুর্বর্ণ, সত্ত্ব- রজো- ও তমোগুণ — তাঁর পক্ষে অধিগম্য সমাজবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান ও তার পরিভাষা, এ-সবের সাহায্যে কৃষ্ণ একটি সর্বমানবিক জৈবনিক নীতি গ'ড়ে তুলছেন; মেনে নিচ্ছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে এই সরল সত্য যে মানুষে-মানুষে প্রকৃতিগত বিভেদ আছে, আর সেই বিভেদের উপরে স্থাপন করছেন তাঁর স্বধর্ম ও পরধর্মের ধারণাকে। আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে, গীতা যখন সমাপ্তপ্রায়, তখন দেখি ধর্মের স্থান অধিকার করছে কর্ম, 'স্বভাব' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে বার-বার — 'স্বভাব', অথবা 'প্রকৃতি' — সাংখ্যের প্রকৃতি : কিন্তু কৃষ্ণ সেটিকে মিলিয়ে দিলেন সাধারণ অর্থে মানবস্বভাব ও ব্যক্তিস্বরূপগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে — অতি সুন্দরভাবে, বহু বিরোধী দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে।

এই সমন্বয়ে পৌঁছতে আঠারোটি অধ্যায়ের প্রয়োজন হয়েছিলো, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির মধ্যেই কৃষ্ণ কয়েকটি মূলসূত্র উত্থাপন করলেন। অর্জুনের বৈক্লব্য কাটাবার জন্য তাঁর প্রথম যুক্তি : 'আত্মা জন্মমৃত্যুরহিত — মারছেই বা কে, আর মরছেই বা কে!'— কিন্তু এই অতি সূক্ষ্ম বৈদান্তিক বাণ প্রপঞ্চমুগ্ধ অর্জুনকে হয়তো বিঁধবে না, যেন মনে-মনে তা বুঝে নিয়ে কৃষ্ণ তক্ষুনি চ'লে এলেন কর্মের প্রসঙ্গে — সেই কর্ম, যা পরিত্যাগের জন্য অর্জুন এখন ব্যাকুল, অথচ কখনোই কোনো প্রাণী যা না-ক'রে পারে না, এবং যার ফলাফল-সংক্রান্ত আশায় অথবা ভয়ে অধিকাংশ মানুষ অধিকাংশ সময় অস্থির হ'য়ে থাকে। কর্ম ভালো — এবং অনিবারণীয় — কিন্তু আনুষঙ্গিক উদ্বেগ ভালো নয়, আর যেহেতু এই উদ্বেগের কারণ আসক্তি, তাই আসক্তি বর্জনীয়। এমনি ক'রে নিষ্কাম কর্মের প্রবর্তনা হ'লো, আমরা কৃষ্ণের মুখে এমন কথাও শুনলাম যে

কর্মফলে আমাদের অধিকার নেই — 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' (গী : ২ : ৪৭)। অতি প্রবল, অতি প্রাঞ্জল এই ঘোষণা, কিন্তু এও যথেষ্ট নয় — কেননা নিষ্কামভাবে যে-কোনো কর্মই করা যেতে পারে, আর অর্জুনকে তাঁর স্বীয় ও বিশেষীকৃত কর্মে প্রবৃত্ত কবাই কৃষ্ণের অব্যবহিত উদ্দেশ্য। শুধু নৈষ্কাম্য নয়, কর্মের যথাযোগ্যতাও আবশ্যিক। তাই, ২ : ৩১-এ প্রবর্তিত স্বধর্মের সূত্রটি আবার তুলে নিলেন কৃষ্ণ; সেটি তাঁর কাছে আর আপ্তবাক্য হ'য়ে রইলো না — যজ্ঞ, কর্ম, প্রকৃতি ইত্যাদি অন্যান্য পূর্বপ্রচলিত ধারণার মতোই তিনি স্বধর্মেও সঞ্চার করলেন একটি নূতন দ্যোতনা, এক সংশ্লেষাত্মক উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন সেটিকে — শুধু উপস্থিত সংকটমোচনের জন্য নয়, ভাবীকালের ও চিরকালে উদ্দেশে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥
(গী : ৩ : ৩৫)

—'সম্যকভাবে পরধর্ম অনুষ্ঠানের চেয়ে আংশিকভাবে স্বধর্ম পালন করা ভালো; স্বধর্মপালনে মৃত্যুলাভও শ্রেয়, [কিন্তু] পরধর্ম ভয়ংকর।'

পরবর্তী চোদ্দটি সোপান পেরিয়ে, প্রায় শেষ মুহূর্তে প্রায় একই ভাষায়, আরো একবার :

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥
(গী : ১৮ : ৪৭)

—'সম্যকভাবে পরধর্ম অনুষ্ঠানের চেয়ে আংশিকভাবে স্বধর্ম পালন করা ভালো, [কেননা] স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম করলে পাপাক্ত হ'তে হয় না।'

এবং এর ঠিক পরের শ্লোকটিতেও একই কথা : 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ — দোষযুক্ত হ'লেও তোমার সহজাত কর্ম ত্যাগ

কোরো না, অর্জুন!' — এ কি সম্ভব যে এই প্রদীপ্ত ও পুনরুক্ত আদেশের লক্ষ্য শুধু কৌলিক বৃত্তি, অর্জুনের জন্মসূত্রে লব্ধ ক্ষাত্রধর্ম? তা যে নয়, তা গীতার পরিণতিরেখা লক্ষ করলেই বোঝা যায়, কিন্তু প্রসঙ্গত মনুসংহিতাও উল্লেখ্য।

মনুর একটি শ্লোক — জানি না সেটি গীতার পূর্বলেখ না প্রতিধ্বনি, জানবার কোনো প্রয়োজনও নেই আমাদের — কিন্তু আক্ষরিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও সেই বচনের ব্যঞ্জনা আলাদা, প্রয়োগের ক্ষেত্রও স্বতন্ত্র। 'বরং স্বধর্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ। পরধর্মেন জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥ (মনু : ১০ : ৯৭)—সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে আংশিকভাবে স্বধর্ম পালন করা ভালো, [কেননা] পরধর্মের দ্বারা জীবনধারণ করলে জাতিগতভাবে পতিত হ'তে হয়।' দ্বিতীয় চরণটি আমাদের হিশেবে খেদজনক, কেননা তার ভাষার দ্বারা সূচিত হয় যে মনুর আলোচ্য এখানে সীমিত অর্থে চাতুর্বর্ণ্যপ্রথা — প্রতিবেশী শ্লোকগুলিও এর সমর্থন করে — এবং সেই 'স্বভাব' শব্দটিও মনুতে আমরা পাই না, যা কৃষ্ণের ভাষণে চাবির মতো কাজ করছে। অবশ্য, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে, সহ-জ বা সহজাত কর্মেও বর্ণবিহিত কর্ম বোঝাতে পারে না তা নয় — যাকে চলতি বাংলায় বলে জাত-ব্যাবসা; কিন্তু স্বভাবের উপর বার-বার জোর দিয়ে কৃষ্ণ সংশয়াতীতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর 'স্বভাবনিয়ত' কর্ম ও বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম এক বস্তু নয়, বিশুদ্ধ প্রটেস্টান্ট অর্থে 'ডিউটি'ও তাকে বলা যায় না (যদিও অবস্থাবিশেষে তা ও-দুয়ের যে-কোনো একটির সঙ্গে বা উভয়ের সঙ্গে মিলে যেতে পারে — অর্জুনের বেলায় তা-ই হয়েছিলো); কৃষ্ণের ভাষায় স্বপ্রণোদিত কর্মের অর্থটি নির্ভুলভাবে ধ্বনিত হচ্ছে। গীতার নিকষে বিচার করলে ধরা পড়ে যে মিল্টন তাঁর স্ব-ভাব — অথবা 'ট্যালেণ্ট'-বিরোধী প্রচারকর্মে লিপ্ত হ'য়ে পাপ করেছিলেন; কিন্তু টোমাস মান্-এর বণিকবংশজাত

নায়কেরা তাঁদের 'জাত-ব্যাবসা' ছেড়ে দিয়ে পতিত হননি — কেননা হান্নো বুডেনব্রক বা টোনিও ক্রোগার-এর পক্ষে শিল্পরচনাই স্বকর্ম[৬৫]। 'কর্ম করো স্বভাবের প্রণোদনায়, যার যেমন সহজাত নিজস্ব বৃত্তি ও প্রবণতা, সেই অনুসারে নিষ্কামভাবে (বা অন্তত যথাসম্ভব নিষ্কাম-ভাবে) কর্ম করো —' গীতার এই মর্মার্থটুকু গ্রহণ ক'রে আমরা বলতে পারি যে প্রতি মানুষেব প্রতিদিনের জীবনযাপনের পক্ষে এমন উপযোগী ও এমন কার্যকর উপদেশ পৃথিবীতে আর উচ্চারিত হয়নি।

বাংলা ভাষার একটি আধুনিক কাব্যে এই কথাটা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'চার অধ্যায়ে'র সঙ্গে গীতার সম্বন্ধ খুব স্পষ্ট — পাত্রপাত্রীরা অনেকবার ঐ গ্রন্থের উল্লেখ ও প্রতিধ্বনি না-করলেও সেটা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধে হ'তো না। পরধর্ম সত্যি কত ভয়াবহ, স্বধর্মত্যাগ — বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জীবিকার্জনে'র দুঃখ কী-রকম মর্মান্তিক হ'তে পারে তা অন্তর জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি — বেদনাময় অনুকম্পার সঙ্গে। মানুষটা সে স্বভাব-সাহিত্যিক, কিন্তু এলাকে ভালোবেসে সে জড়িয়ে পড়লো সন্ত্রাসবাদের কুটিল চক্রান্তে — তার পক্ষে অসহ্য সেই পবিবেশ তাকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিলো। তবু: অন্ত বিশ-শতকের মানুষ ব'লে তার সমস্যাটি অনেক সহজ, তার সহজাত সাহিত্যিকবৃত্তি পালন করতে কোনো সামাজিক অর্থে সে বাধ্য ছিলো না — কিন্তু অর্জুন যুদ্ধ করতে বাধ্য, যুদ্ধ না করার কোনো অধিকার তাঁর নেই — যেহেতু তাঁর ক্ষত্রবংশে জন্ম, এবং যেহেতু মহাভারতের সংলগ্নতার মধ্যে — মনুসংহিতার সঙ্গে ভগবদ্গীতার দার্শনিক পার্থক্য সত্ত্বেও — বর্ণাশ্রমের ধারণাটি অনপসারণীয়। তাই প্রশ্ন ওঠে: বর্ণবিহিত ধর্মের সঙ্গে কারো স্বাভাবিক বৃত্তির যদি বিরোধ ঘটে, যদি কারো স্ব-ভাব হয় বংশবিরোধী, দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি কৌলিক প্রথার পরিপন্থী হয় — তাহ'লে তার কর্তব্য কী?

কৃষ্ণ এই প্রশ্নের কোনো ঋজু উত্তর দেননি — উত্তর জানতেন না ব'লে নয়, কোনো প্রয়োজন ঘটেনি ব'লে — অথবা বলা যায় গীতার নাটকীয় পরিলেখের মধ্যে প্রশ্নটি আদৌ উত্থাপিত হবার সুযোগ ছিলো না। মনে রাখতে হবে কথাগুলো অর্জুনকে বলা হচ্ছে — একটি বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ কারণে অর্জুনকে — এবং অর্জুন এক স্বভাবযোদ্ধা, এক সংশয়াতীত স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষত্রিয় — তিনি সেই ভাগ্যবানদের অন্যতম, যাঁদের প্রকৃতির সঙ্গে সমাজনির্দিষ্ট কর্তব্যের অণুপরিমাণ দ্বন্দ্ব নেই। অর্থাৎ, অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ শুধু বর্ণাশ্রমবিহিত 'স্বধর্ম' নয়, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভাষায় সেটাই তাঁর 'স্বকর্ম' — বা 'সহ-জ', 'স্বভাব-জ', 'প্রকৃতি-জ' কর্ম — অতএব তাঁর এই আকস্মিক যুদ্ধবিমুখতাকে বলা যায় আক্ষরিক অর্থে অ-প্রকৃতিস্থতা, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অস্ত্রধারণের চেয়েও অক্ষম্য এক আত্মবিদ্রোহ। আকৈশোর আস্ত্রিক প্রতিভার পরিচয় দেবার পর, 'গুড়াকেশ' (নিদ্রাজয়ী) ও 'পরন্তপ' (শত্রুদহনকারী) আখ্যা অর্জন করার পর তিনি যদি কুরুক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকতেন, তাহ'লে — 'চার অধ্যায়ে'র অন্তর ভাষায় — তাঁর 'স্বভাবকেই হত্যা' করতেন তিনি, আর সেটা হ'তো 'সব হত্যার চেয়ে বড়ো পাপ'।

এখানে একবার স্মরণ করা ভালো এ-যাবৎ অর্জুন কী করেছিলেন বা করেননি। প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে একলব্যকে — সেই মলিনবর্ণ নিষাদবালক, যে দ্রোণ-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হ'য়েও, মনে-মনে দ্রোণের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে, হ'য়ে উঠেছিলো নিজের সাধনায় প্রায় অর্জুনতুল্য ধনুর্বীর। এই স্বাধ্যায়বান ভক্ত বালকের কাছে — আশা করি কোনো পাঠক তা ভুলে যাননি — দ্রোণাচার্য এক অদ্ভুত গুরুদক্ষিণা আদায় ক'রে নিলেন — আর-কিছু নয়, অস্ত্রচালনায় বা যে-কোনো কর্মে যা অপরিহার্য, সেই ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি (আদি: ১৩২)। আর গুরুর এই ঘাতকতুল্য আচরণে 'অতিশয়

প্রীত ও প্রসন্ন' হলেন অর্জুন — কেননা দ্রোণ তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি হবেন সব যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, আর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'লে 'ধর্ম টেকে না। ধর্মকে এ-রকম আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা — সেটাও অর্জুনের স্বভাবেরই অঙ্গ, সেটাও তাঁর স্বকর্মসাধনের পক্ষে প্রয়োজন — কেননা ন্যায়-অন্যায় নিয়ে বেশি ভাবতে গেলে পূর্ণোদ্যমে কাজ করা যায় না। আদিপর্বে তাঁর বনগমন থেকে যুধিষ্ঠিরও তাঁকে ফেরাতে পারলেন না (প্রতিজ্ঞারক্ষার উপরে কথা নেই !), কিন্তু বনবাস-সংক্রান্ত প্রধান শর্তটি বিষয়ে তাঁকে দেখা গেলো অতি সহজে ভঙ্গুর (আদি : ২১৩-১৪) — উলূপীর সঙ্গে তাঁর মিলনের প্রাক্কালে আরো একবার যখন প্রতিজ্ঞার কথা উঠলো। অর্জুন বারো বছরের জন্য ব্রহ্মচর্যের পণ নিয়েছেন শুনে কামার্তা নাগকন্যা বললেন, 'তোমার ঐ প্রতিজ্ঞা শুধু দ্রৌপদীর বিষয়ে, আমাকে গ্রহণ করলে তোমার অধর্ম হবে না—আর যদি বা কিঞ্চিৎ ধর্মনাশ হয়, তাহ'লেও আমার প্রাণ বাঁচিয়ে তুমি আরো বেশি ধর্মলাভ করবে।' — যাকে বলে আইনের ফাঁকি, এ হ'লো তা-ই ; কিন্তু অর্জুন এটিকে তাঁর 'ধর্মবুদ্ধি'তে মেনে নিয়ে শুধু যে উলূপীর মদনজ্বালা জুড়োলেন তা নয়, এর অব্যবহিত পরে চিত্রাঙ্গদাকে দেখামাত্র নিজেই আনলেন বিবাহের প্রস্তাব[৬৬] — তাঁর ব্রহ্মচর্য-পণের উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না। যে-বারো বছর তাঁর নারীবর্জিত জীবন কাটাবার কথা ছিলো তারই মধ্যে — সুভদ্রাকে নিয়ে — তিনটি কামিনীর সংলগ্ন হলেন তিনি — এতে আমরা কৌতুক বোধ করলেও অর্জুন এটাকে সদাচার ব'লেই জানেন, কেননা তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিলো 'শুধু দ্রৌপদীর বিষয়ে'। তেমনি, যেখানে তিনি প্রার্থিনীকে ফিরিয়ে দেন সেখানেও তাঁর হিশেবে ধর্মাচরণই তাঁর উদ্দেশ্য। স্বয়মাগতা উর্বশীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, যেহেতু — এই কারণটা আমাদের পক্ষে কল্পনাতীত — যেহেতু তিনি অস্পষ্টভাবে শুনেছেন যে উর্বশী

তাঁর সুদূর এক প্রপিতামহী[৬৭]। এক ধূসর জনরবের উপর নির্ভর ক'রে তিনি যে অনন্তযৌবনা বিশ্বমোহিনীর জাজ্বল্যমান উপস্থিতিটাকে উপেক্ষা করলেন (বন : ৪৬), এতে আমরা কোনো অসামান্য ইন্দ্রিয়সংযমের পরিচয় পেলাম না — শুধু বুঝলাম অর্জুন শাস্ত্র জানেন ও মেনে চলেন। বিরাট চাইলেন অর্জুনের হাতে তাঁর কন্যাকে দান করতে, কিন্তু অর্জুন তাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলেন — তাও শুধু লোকনিন্দার ভয়ে, পাছে কেউ সন্দেহ করে যে তাঁর ও উত্তরার মধ্যে শিক্ষক-ছাত্রী ছাড়া অন্য কোনো সম্বন্ধ ছিলো (বিরাট : ৭১-৭২)। এই সবই প্রমাণ করে যে বহির্জীবনে অর্জুন যেমন দুঃসাহসী, তাঁর মানসতায় তেমনি তিনি গতানুগতিক ; তাঁর কাছে লোকাচার অবশ্যমান্য, প্রথা-পথের বাইরে তিনি পা বাড়ান না। আর এইজন্যেই তাঁর জীবনে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না, কর্তব্য বিষয়ে কোনো বিকল্পবোধ নেই তাঁর, আর তাই এমন অক্লিষ্টকর্মা বীর তিনি হ'তে পেরেছেন। লক্ষণীয়, মহাভারতের প্রধান চরিত্রের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কম কথা বলেন ; বনপর্বে ধর্মাধর্ম বিষয়ে যুধিষ্ঠির, ভীম ও দ্রৌপদীর মধ্যে যে বাদানুবাদ হ'লো (অ : ২৭-৩৬), তাতে কোনো অংশ তিনি নেননি : বিতর্কপূর্ণ উদ্যোগপর্বেও তাঁর ভূমিকা সবচেয়ে ছোটো, এবং তা এই কারণে যে তিনি চিরাচরিতভাবে যুদ্ধপন্থী, আর স্বপক্ষের জয় বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সংশয় নেই। পাণ্ডবশক্তির পরিমাণ বুঝে দুঃশাসনও একবার সন্ধির প্রস্তাব এনেছিলো (উদ্যোগ : ১২৭), ভীমের মুখেও মৃদু বচন আমরা শুনেছি, কিন্তু অর্জুন কখনো স্পষ্ট ভাষায় সন্ধির সপক্ষে কথা বলেননি[৬৮] — না ভয়ে, না কুরুকুলের মঙ্গলের কথা ভেবে, না বধ্যের প্রতি করুণাবশত। 'পরমদয়ালু অর্জুনেরও যুদ্ধে অভিলাষ নেই —' (উদ্যোগ : ৭৩), এ-কথা আমরা ভীমের মুখে একবার শুনতে পাই, কিন্তু অর্জুনের

নিজের মুখ থেকে ও-রকম কথা কখনোই নিঃসৃত হয় না বরং উদ্যোগ : ৪৭-এর দীর্ঘ ভাষণটিতে তাঁকে দেখা যায় যুদ্ধলালসায় প্রজ্বলন্ত। আর তাই, গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের কাতরোক্তি শুনে আমরা যতই না দ্রব হই, কর্মযোগী কৃষ্ণকে আমাদের মনের সম্মতি না-জানিয়েও পারি না — আর শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জুন যখন আবার তাঁর স্বকর্মকারী গাণ্ডীব তুলে নেন, তখন মনে হয় বিশ্বের এক ছন্দপতন সংশোধিত হ'লো।

কিন্তু অর্জুনের চেয়েও অনেক বড়ো এক স্বধর্মসাধকের সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি : তিনি রামচন্দ্র।

৬২। সভা : ৬৩-৬৬ দ্র। বিষয়সম্পত্তি সব হারাবার পর যুধিষ্ঠির যথাক্রমে চার ভ্রাতাকে, তারপর নিজেকে, আর সর্বশেষে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন। যুধিষ্ঠির নিজেই বিজিত হয়েছেন, অতএব অন্যকে পণ রাখেন কেমন ক'রে? — এই ছিলো দ্রৌপদীর প্রশ্নের মর্মার্থ। উত্তরে ভীষ্ম যে-হেঁয়ালিটি বললেন তা থেকে শুধু এটুকু বোঝা গেলো যে সর্বস্বত্বহীন দাসও তার পত্নীর প্রভু থেকে যায়; — অন্য কেউ সমস্যা-সমাধানের কোনো চেষ্টাও করলেন না। অবশেষে দ্রৌপদীর সপক্ষে যিনি উঠে দাঁড়ালেন তিনি কোনো কুরুবৃদ্ধ নন, তাঁর পঞ্চস্বামীরও অন্যতম কেউ নন — আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের এক অখ্যাত তরুণবয়স্ক পুত্র — বিকর্ণ। বিকর্ণ চারটি যুক্তি উপস্থিত করলেন : প্রথম, দ্যূত একটি রাজোচিত ব্যসন, আর ব্যসনমত্ত হ'য়ে রাজারা যা করেন তা গণ্য হয় না; দ্বিতীয়, দাসত্বপ্রাপ্ত যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদী-পণ অবৈধ (এটা স্পষ্টত দ্রৌপদীর কথার সমর্থক); আর তৃতীয়ত, এই পণ যুধিষ্ঠিরের স্বপ্রণোদিত ছিলো না, তাঁকে সোচ্চারভাবে উত্তেজিত করেন শকুনি। চতুর্থ দফায় সূক্ষ্মতর একটি যুক্তি দেয়া হ'লো : দ্রৌপদী পঞ্চভ্রাতারই পত্নী, কিন্তু অনুজদের অনুমতি বিনাই যুধিষ্ঠির তাঁকে পণ রেখেছিলেন — অতএব এই পণ অগ্রাহ্য। এগুলো সবই অবশ্য লজিক কপচানো, যার সঙ্গে ঘটনাটির বাস্তবতার কোনো সংযোগ নেই; আমরা

বুঝতে পারি যে এই অধ্যায়পর্যায়ে—দুঃশাসনের মুখে, ভীষ্মের মুখে, প্রশংসাযোগ্য বিকর্ণের মুখেও — 'ধর্ম' কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে শুধু আইনের অর্থে, সুনীতি সদাচারের অর্থে নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দ্রৌপদীর অনাবরণীকরণ যিনি নিবারণ করলেন তিনিও ধর্ম — একই শব্দের মধ্যে গৃহীত হ'লো বুদ্ধির উত্তরে হৃদয়, তর্কের উত্তরে অনুভূতি।

৬৩। আমি এই কথিকাটি পেয়েছি হাইনরিখ ৎসিমার প্রণীত *Philosophies of India* গ্রন্থে (Routledge & Kegan Paul, London, ১৯৫১, পৃ ১৬১-৬২)।

বনপর্বের ধর্মব্যাধের সঙ্গে অনেকে তুলাধার বণিকের তুলনা ক'রে থাকেন (শান্তি : ২৬১-২৬২), যাঁর কাছে মহামুনি জাজলিকে ধর্মশিক্ষার জন্যে যেতে হয়েছিলো। কিন্তু আমার মনে হয় দ্বিতীয়টি প্রথমটির দুর্বল অনুকরণ মাত্র।

৬৪। উদাহরণত উদ্যোগ : ৩৬, ও শান্তি : ৬০-৬১ দ্র।

৬৫। বইটির প্রেস-কপি তৈরি করার সময়ে আমি জানতে পারি যে আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ দু-জন পণ্ডিত-মনীষীর মতেও গীতার স্বধর্ম চাতুর্বর্ণ্যের নামান্তর নয় — সেটি একটি সর্বকালীন সর্বমানবিক নীতি, যা সমাজব্যবস্থার ভাঙা-গড়ার উপর নির্ভর করে না। (*Essays on the Gita :* Sri Aurobindo, পর্যায় : ২, পরি : ২০, "Swabhāva and Swadharma", ও টিলকের 'গীতারহস্য' পঞ্চদশ প্রকরণ দ্র)। যে-সব বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদক প্রাসঙ্গিক স্থলে নির্বিচারে লেখেন 'বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম' বা 'caste-duty', তাঁরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানতাবশত গীতার অভিপ্রায়কে বিকৃত করেন।

৬৬। মনে রাখতে হবে, মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা-কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রায় কিছুই সাদৃশ্য নেই।

৬৭। সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণের প্রারম্ভেই কুরুবংশের যে-কুলপঞ্জিকা প্রদত্ত হয়েছে সেই অনুসারে পুরুরবা ও উর্বশীর পৌত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির চৌত্রিশ পুরুষ পরে শান্তনু — যিনি মহাভারতের মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রথম কুরুরাজ। উর্বশী ও অর্জুনের মধ্যে চল্লিশ পুরুষের ব্যবধান, কালের ব্যবধান (এই স্বল্পজীবী কলিযুগের হিশেবেও) অন্তত এক হাজার বছর।

৬৮। কৃষ্ণের হস্তিনাযাত্রার পূর্বক্ষণে অর্জুন বললেন (উদ্যোগ : ৭৭) : 'কৃষ্ণ, যাতে উভয়পক্ষের মঙ্গল হয় তুমি তাই কোরো। সন্ধি বা সংগ্রাম তুমি যা বলবে তাতেই আমি সম্মত আছি।' কিন্তু সন্ধির প্রতি এই ওষ্ঠ-সেবা জানাবার পরমুহূর্তেই অর্জুনের সুর বদলে গেলো : 'দুর্যোধন নৃশংস উপায়ে আমাদের রাজ্যহরণ করেছিলো, তাকে উচ্ছিন্ন করা কি কর্তব্য নয়? যখন সে কপটদ্যূতে হারিয়ে আমাদের বনে পাঠিয়েছিলো, তখন থেকেই সে আমাদের বধ্য ব'লে গণ্য হয়েছে।'

১৫ : রামের উদাহরণ

ধর্ম নিয়ে বাদানুবাদ যেমন মহাভারতে একটি নিত্যকর্ম, রামায়ণে সে-রকম নয়, কেননা রামই সেখানে সর্বাধিপতি ও সর্বতোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন — প্রায় জাতক-কাহিনীর বোধিসত্ত্বেরই মতো। এমন নয় যে তর্ক কখনো ওঠে না, কিন্তু শেষ কথাটি সর্বদাই রামচন্দ্রের — তিনি যা বলবেন সেটাই মান্য, তিনি বলেছেন ব'লেই। মনে করা যাক সেই সব তীব্র প্রতিবাদ, যা অযোধ্যায় অনেকের মুখেই উচ্চারিত হয়েছিলো — রাম যেদিন পিতৃসত্যপালনে অঙ্গীকৃত হলেন। কৌশল্যা বললেন কৈকেয়ীর বচন এত গর্হিত যে তা পালন করলেই অধর্ম হবে, সারথি সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মুখের উপর তাঁকে তিরস্কার করলেন 'পতিঘাতিনী ও কুলঘ্নী' ব'লে; আর পথে-পথে জনগণেরও ধ্বনি উঠলো, 'ধিক আমাদের কামপরায়ণ রাজাকে! — রাজানং ধিগ্ দশরথং কামস্য বশমাস্থিতম্' (অযোধ্যা : ৪৯ : ৪) । সবচেয়ে প্রখর কণ্ঠ লক্ষ্মণের (অযোধ্যা : ২১, ২৩) : 'আমি বধ করবো ভরতকে ও তার বন্ধুবর্গকে, কৈকেয়ীমুগ্ধ কামচালিত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করবো।' — এখানেই ক্ষান্ত না-হ'য়ে তপ্ত-মস্তিষ্ক যুবক লক্ষ্মণ তাঁর ভক্তিভাজন অগ্রজের বিরুদ্ধেও মুখোমুখি

বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন (অযোধ্যা : ২৩ : ১১) : 'রাম, আপনি ধীমান, কিন্তু যে-ধর্মের প্রভাবে আপনি আজ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছেন, আমি সেই ধর্মকে বিদ্বেষ করি!' — কিন্তু চারদিক থেকে এত আক্রমণ ও আবেদন সত্ত্বেও রাম রইলেন স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল — যেহেতু কৈকেয়ীর বাক্য শোনামাত্র, মুহূর্তকাল চিন্তা না-ক'রে, তিনি সত্যপালনের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন (অযোধ্যা : ১৮–১৯)। মনে-মনে তিনিও জানেন সে ঘটনাটি ন্যায়সংগত নয়, কৈকেয়ীর মাৎসর্য ও দশরথের মোহাচ্ছন্নতার ফলেই তা ঘটতে পেরেছিলে[৬৯]; তাঁর জনক-জননীর আর্তি বিষয়েও তিনি সচেতন — কিন্তু তাঁর ধর্ম স্নেহ-দ্বেষ এবং ন্যায়-অন্যায়েরও ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত, তা পালনের জন্য অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে হ'লেও দিতে হবে, প্রিয়জনকে মর্মাঘাত হানতে হ'লেও পেছিয়ে যাওয়া চলবে না। কৃষ্ণের মুখে গীতা শোনার পরেও অর্জুন দু-বার ক্ষণকালীনভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন — প্রথমে তাঁরই নিক্ষিপ্ত শরের দ্বারা নিপীড়িত কৃপের জন্য, এবং দ্রোণবধের পরে আরো একবার (দ্রোণ : ১৪৭, ১৯৭) — কিন্তু সে-রকম কোনো দুর্বল মুহূর্ত রামের জীবনে একটিও নেই। পরিতপ্ত বৃদ্ধ দশরথ যখন করুণ বচনে তাঁকে মিনতি জানালেন শুধু বনযাত্রার পূর্বে শেষ রাত্রিটি রাজপুরীতে কাটিয়ে যাবার জন্য, তখনও তিনি দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন (অযোধ্যা : ৩৪ : ৪৩) — 'সত্যস্ত্বং ভব পার্থিব — মহারাজ, আপনার সত্য রক্ষা করুন।' আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, সেই রাত্রিটি রাজপুরীতে কাটালে রাম পিতাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারতেন এবং তাঁর সত্যরক্ষাও ক্ষুণ্ন হ'তো না :— কিন্তু কৈকেয়ী চেয়েছিলেন রাম 'অদ্যই' বনগমন করুন, এবং সেই অদ্যটুকু মনে রেখে, পিতাকে আক্ষরিকভাবে সত্যবাদী প্রমাণ করার জন্য, রাম সেই দিনই যাত্রা করলেন — যে-পিতার জন্য এই মহৎ ত্যাগ, তাঁর সুখ, স্বাস্থ্য, বা জীবন বিষয়ে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না-হ'য়ে।

পরবর্তী জীবনেও তেমনি — রাম যখন যেটিকে কর্তব্য ব'লে মেনে নেন তা সাধন করেন ক্ষিপ্র বেগে, সম্পূর্ণভাবে ও নিষ্কুণ্ঠ মনে। অন্যায় যুদ্ধে বালীকে বধ ক'রে তিনি মুহূর্তের জন্য অনুতপ্ত হলেন না (কিষ্কিন্ধ্যা : ৬-১৮), আর তপস্যাব্রত শম্বুকের শিরশ্ছেদ করতে গিয়ে একবার পলক পড়লো না তাঁর চোখে (উত্তর : ৭৪-৭৬)। শাস্ত্রমতে দু-জনেরই অপরাধ স্পষ্ট : বলী গ্রহণ করেছেন তাঁর ভ্রাতৃজায়াকে, শূদ্র শম্বুক তপশ্চর্যা নিয়েছেন — এবং অপরাধীকে দণ্ডদানই রাজধর্ম। শম্বুক তর্ক করারও সময় পাননি; 'আমি জাতিতে শূদ্র' — এই সত্য কথাটি তাঁর মুখ থেকে বেরোনোমাত্র রামের 'উজ্জ্বল ও নির্মল' খড়্গ তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছিলো — কিন্তু বীর বালী মৃত্যুর আগে 'রণগর্বিত' রামকে কয়েকটি 'পরুষ ও প্রশ্রিত' (কর্কশ ও বিনয়সম্মত) বাক্য শোনাতে পেরেছিলেন। 'রাম, আমি তো তোমার কোনো অহিত করিনি, আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলাম, আমার মাংসও অভক্ষ্য — তবে বিনা দোষে আমাকে মারলে কেন? হে সদ্বংশজাত প্রিয়-দর্শন প্রথিতযশা রাজপুত্র' — প্রতিটি বিশেষণে বিনয়াশ্রিত ব্যঙ্গের সুর শুনতে পাই আমরা — 'আমি ভেবেছিলাম তুমি শম দম ক্ষমা ও ধৃতিগুণসম্পন্ন, কিন্তু এখন দেখছি তুমি ধর্মধ্বজ অধার্মিক, তৃণাচ্ছাদিত কূপের মতো দুষ্কৃতকারী।' রামের উত্তরটি অনুধাবন করলে আমরা তাঁর প্রকৃতি ও মনের গতি অনেকটা বুঝতে পারি। তাঁর প্রথম কথা : 'বানর, তুমি লোকাচারবিরুদ্ধ পাপকর্ম করেছো —' বিশেষণটি আমার নয়, রামেরই, মূলে আছে 'লোকবিরুদ্ধ' — 'আর শাস্ত্রে বলে ভ্রাতৃবধূগামীর প্রাণদণ্ডই বিধেয়[১০]।' দ্বিতীয় কথা : 'আমি সুগ্রীবের ইষ্টসাধনের প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, তা লঙ্ঘন করি কী ক'রে?' তৃতীয় যুক্তি — মনুর বচন ও মান্ধাতার নজির : 'দোষী রাজদণ্ড পেয়ে পাপমুক্ত হয়, কিন্তু রাজা তাকে দণ্ড না-দিলে

নিজেই পাপস্পৃষ্ট হন, মান্ধাতাও এক পাপাচারীকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছিলেন, আর আমি সেই রাজধর্মেরই অধীন। [আমি তোমাকে ধর্মানুসারে বধ করেছি], ক্রোধের বশে নয়; তোমাকে বধ ক'রে আমার মনস্তাপও হচ্ছে না।' আর সব-শেষে অন্য এক 'মহৎ কারণ': 'মাংসাশী লোকেরা যে-কোনো উপায়ে মৃগবধ করে, তাতে দোষ হয় না; ধর্মজ্ঞ রাজারাও মৃগয়া ক'রে থাকেন;— আর তুমি তো এক শাখামৃগমাত্র, আমি তোমাকে যুদ্ধে অথবা অযুদ্ধে সংহার করলে কিছুই এসে যায় না। তুমি জেনো, মর্ত্যভূমিতে রাজারাই দেবতার প্রতিভূ; তাঁদের নিন্দা অথবা হিংসা করা কখনোই উচিত নয়।'— অতি প্রাঞ্জল, অতি যুক্তিসিদ্ধ এই ভাষণ, আক্ষরিক শাস্ত্রবিধি অনুসারে অপ্রতিবাদ্য; তবু একটি প্রশ্ন আমাদের মুখে উঠে আসে:— এক তির্যগ্‌যোনি শাখামৃগ না-হ'য়ে, মিত্রের শত্রু না-হ'য়ে, যদি বালী হতেন রামেরই বাল্য-বন্ধু, অথবা তাঁর আচার্য বা শোণিতসম্পৃক্ত আত্মীয়, তাহ'লেও কি এই ধরনের যুক্তি তাঁর জোগাতো, না কি তিনি দ্রোণবধের পরে অর্জুনের মতো সন্তপ্ত হতেন? কিন্তু এই প্রশ্ন মুখে আনতে-না-আনতেই তার উত্তর আমাদের মনে প'ড়ে যায়, মনে পড়ে অন্য এক উপলক্ষে রামচন্দ্রের শান্ত ও নিদারুণ ঘোষণা—'জেনো, এই বিপুল রণপরিশ্রম আমি তোমার জন্য করিনি, করেছি আমার প্রখ্যাত বংশের কলঙ্কক্ষালনের জন্য।'— কাকে বলছেন? কখন? বনবাসকালে যাঁকে হারিয়ে তিনি পাঁচ সর্গ জুড়ে বিলাপ করেছিলেন (অরণ্য: ৬০-৬৪), সেই 'চারুহাসিনী চম্পকবর্ণা হরিণলোচনা তন্বী' প্রেয়সীকে, যখন দীর্ঘ দুঃসহ বিচ্ছেদের পরে, বহু বেদনা ও সন্ত্রাস পেরিয়ে, এক বিপুল যুদ্ধের অবসানে, বৈদেহী অবশেষে তাঁর চিরকাঙ্ক্ষিত দয়িতের সামনে দাঁড়ালেন (যুদ্ধ: ১১৪-১৫)। 'জেনো, তোমার জন্য নয়, তোমার ধর্ষণজনিত দোষমার্জনার জন্য ("ধর্ষণাং প্রতিমার্জতা"),

এবং নিজের সম্মানরক্ষার জন্য আমি রাবণকে বধ করেছি। তুমি রাবণের অঙ্কে নির্জিত হয়েছো, সে তোমাকে দুষ্ট চোখে দেখেছে — এখন আমি আবার তোমাকে গ্রহণ করলে আমার কুলগৌরব কোথায় থাকবে? জনকনন্দিনী, তোমার প্রতি আমার আর অভিলাষ নেই, তুমি দশ দিকের যে-দিকে ইচ্ছা যাও, যাও লক্ষ্মণ বা ভরত বা শত্রুঘ্নের কাছে, বা সুগ্রীব অথবা বিভীষণের কাছেও সুখে থাকতে পারো। সীতা, তুমি সুন্দরী ও মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিক দিন সংযত হ'য়ে থাকেনি।' এই মহান, মর্মবিদারক ও সীতাব ভাষায়[৭১] 'ইতরোচিত' বাক্যের জন্য বাল্মীকি একটু আগে থেকেই প্রস্তুত করেছেন আমাদের—রাবণবধের পরে হনুমান যখন বার্তা নিয়ে এলেন যে দেবী মৈথিলী এখনই তাঁব সঙ্গে দেখা করতে চান, তখন রামের চোখ 'সহসা বাষ্পাকুল' হ'য়ে উঠলো (যুদ্ধ : ১১৪ : ৫) — আনন্দে, এবং সেইসঙ্গে সংশয়পীড়ায়, কেননা (এই কথাটি কিছুক্ষণ পরে প্রকাশিত হবে) — কেননা পুনর্মিলনের আসন্ন মুহূর্তটিতেই তাঁর মনে জেগেছে অমঙ্গলচিন্তা — পাছে কেউ কোনো অপবাদ দেয়, পাছে তিনি 'কামাত্মা' ব'লে নিন্দিত হন (যুদ্ধ : ১১৮ : ১৪)। সীতা মুহূর্তকাল দেরি করতে চাননি, কিন্তু রামের আদেশে তাঁকে হ'তে হ'লো সুস্নাতা ও দিব্যবেশধারিণী — যেন শারীরিক শুদ্ধীকরণের কোনো প্রয়োজন ছিলো তাঁর, অথবা যেন সুচারু প্রসাধনের উপরেই তাঁর মর্যাদা নির্ভর করছে। অথচ, রামেরই আদেশে, সীতাকে আসতে হ'লো দীন চরণে, বিনা শিবিকায়, 'লজ্জায় যেন স্বীয় দেহে লীন', সমবেত সব রাক্ষস-ভল্লুকের চোখের সামনে দিয়ে; এতে 'ব্যথিত' হলেন লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমান (যুদ্ধ : ১১৪ : ৩১-৩৩), রামকে তাঁদের মনে হ'লো পত্নীর প্রতি 'অপ্রীত'; কিন্তু এই ব্যবস্থাও রামচন্দ্রের সুপরিকল্পিত — তিনি চান না এ-মুহূর্তে সীতার সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাৎ, সর্বজনের উপস্থিতিটাই তাঁর কাম্য — কেননা

আসন্ন ঘটনার জন্য তাই আবশ্যক। 'সুবিচারসাধনই যথেষ্ট নয়, সুবিচার যে সাধিত হয়েছে তা দৃষ্ট হওয়াও প্রয়োজন' — যেন রোমক আইনের এই সূত্র অনুসারে — যাকে চলিত ভাষায় আমরা 'লোক-দেখানো' বলি তারই তাগিদে — অনুষ্ঠিত হ'লো ত্রিলোকবাসীকে সাক্ষী রেখে অগ্নিপরীক্ষা, শ্রুত হ'লো দেবগণ ও পিতৃগণের মুখে সীতা বিষয়ে শংসাবচন; আমরা বুঝে নিলাম যে রামের মতে সীতার সাধ্বিতাই যথেষ্ট নয়, সেটি একেবারে আক্ষরিক অর্থেই দৃষ্ট ও বিজ্ঞাপিত ও বিশ্ব-আদালতে শিলমোহরীকৃত হওয়াও প্রয়োজন, কেননা রামচন্দ্রের 'প্রখ্যাত বংশের সম্মানরক্ষা' তাঁর প্রধান কর্তব্য। আর তাই, বৈধানিক প্রমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ ক'রে, সব সন্দেহের ছিদ্র অগ্রিম অবরুদ্ধ ক'রে তবে তিনি গ্রহণ করলেন তাঁর 'প্রাণের চেয়েও প্রিয়' বৈদেহীকে — সম্পূর্ণ লোকসম্মত ও প্রথাসিদ্ধভাবে[৭২]।

কিন্তু তবু, এত সতর্কতা সত্ত্বেও, একদিন লোকের জিহ্বা পথে-ঘাটে ন'ড়ে বেড়াতে লাগলো (উত্তর : ৪৩ : ১৭-১৯): 'রাবণ-স্পৃষ্ট সীতাকে নিয়ে রামই যদি সম্ভোগসুখে ম'জে থাকেন তাহ'লে আমাদের স্ত্রীরা দুষ্টা হ'লে আমরা কী করবো?' শোনামাত্র রামের উক্তি (উত্তর : ৪৫ : ৪, ১৪-১৬): 'আমি মহৎ ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মেছি, সীতাও সৎকুলজাতা — এই অপকীর্তি আমার অসহ্য!··· আমি অপবাদের ভয়ে জীবন পর্যন্ত দিতে পারি···লক্ষ্মণ, তুমি রথ প্রস্তুত করো।' সীতাকে গ্রহণের সময় তিনি বিস্তীর্ণভাবে বিচার-বিবেচনা করেছিলেন, কিন্তু বর্জনের সময় কী দ্রুত তাঁর সিদ্ধান্ত, কী অমোঘ তাঁর আজ্ঞা! 'লক্ষ্মণ, তুমি কাল প্রভাতেই সীতাকে গঙ্গার ওপারে বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসবে — না, প্রতিবাদ কোরো না, অন্য কোনো পরামর্শ আমি শুনবো না!' আমাদের মনে প'ড়ে যায় সেই পুষ্পোদ্যান, যেখানে এই সেদিন

পর্যন্ত তিনি সীতাকে নিয়ে কত না আনন্দে বিহার করেছিলেন (উত্তর : ৪১), কিন্তু সেই সব স্নেহস্মৃতি অতিক্রম ক'রে রামের মনে পড়লো শুধু এই কথাটুকুই যে সদ্যগর্ভিণী সীতা অন্তত 'এক রাত্রির জন্য' কোনো তপোবনে বাস করতে চেয়েছিলেন ; — আর পত্নীর সেই আকাঙ্ক্ষাই তিনি পূরণ করলেন এবার, আশাতীত অত্যধিক মাত্রায়, সীতার পক্ষে অকল্পনীয় উপায়ে। আমরা জানি তাঁর নিজের মনে সীতার বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নেই — কখনোই ছিলো না : 'ত্রিলোকবিশুদ্ধা মৈথিলী আমার কীর্তির মতোই আমার অত্যাজ্যা,' 'আমার অন্তরাত্মা জানে সীতা শুদ্ধশীলা ও যশস্বিনী —' এ-সব কথা রামেরই মুখে আমরা শুনেছি (যুদ্ধ : ১১৮ : ২০, উত্তর : ৪৫ : ১০); সীতার পাতালপ্রবেশের আগে আরো একবার শুনবো (উত্তর : ৯৭ : ৫)। কিন্তু তবু তাঁর সেই হৃদয়ের সত্যের উপরে তিনি স্থান দিলেন জনমতকে, অন্তরাত্মার উপলব্ধিকে অগ্রাহ্য করে সীতাকে বিসর্জন দিলেন — অন্য কোনো কারণে নয়, শুধু, 'অপবাদভয়াৎ' — শুধু লোকনিন্দার ভয়ে, শুধু কণ্ডূয়নশীল গণজিহ্বার নিবৃত্তির জন্য। রাম বনে গিয়েছিলেন প্রজাবৃন্দকে বিক্ষুব্ধ ক'রে, আবার প্রজাবৃন্দের সন্তোষের জন্যই সীতাকে বনে পাঠালেন — এই দুটো আচরণকে হঠাৎ পরস্পরবিরোধী ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু আসলে তা নয় ; দুটোরই মূল কথা হ'লো অপবাদখণ্ডন — তাঁর নিজের বিষয়ে, পিতার বিষয়ে, তাঁর উচ্চ-অভিজাত বংশেরও বিষয়ে। রাম এক প্রজানুরঞ্জন রাজা, এই বহুপ্রচলিত ধারণাটাও ভুল : তিনি শুধু সময়োচিত কর্তব্য ক'রে যাচ্ছেন, প্রজারা তাতে তুষ্ট হ'লো, না কষ্ট পেলো সেটা তাঁর বিবেচ্য নয় ; তাঁর নিজের অথবা পিতা মাতা পত্নী বন্ধুর সুখে অথবা দুঃখে তাঁর কিছুই এসে যায় না। বংশ, কৌলীন্য, সম্মান — লোকচক্ষে সম্মান — রামের মূল্যবোধে এগুলোর স্থান সর্বোচ্চে, তাঁর যেন

ব্যক্তিগত জীবন ব'লে কিছু নেই ; ধর্মে ও লোকাচারে কোনো প্রভেদ তিনি দেখতে পান না ; সমাজনীতি বা রাজনীতির ইঙ্গিতে উপেক্ষা করতে পারেন তাঁর সব অন্তঃস্থিত বিশ্বাস ও মর্মানুভূতি — অনায়াসে, কোনো পুনর্বিবেচনা না-ক'রে। আগে যেমন পিতৃসত্যের শুভাশুভ বিষয়ে তিনি চিন্তা করেননি, তেমনি সীতাবর্জনের সময়েও মেনে নিলেন এক দারুণতর অন্যায় — এক জনরব, যা তিনি মিথ্যা ব'লে জানেন, এক অভিযোগ, যার ভিত্তিহীনতা বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই — সব সম্ভবপর আপত্তি ও প্রতিবাদ ছাপিয়ে তাঁর কাছে এই যুক্তিটাই চরম হ'য়ে উঠলো যে প্রজারা রাজারই অনুকরণ ক'রে থাকে — 'যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ত্ততে' (উত্তর : ৪৩ : ১৯)। আর তাই লক্ষ্মণকে এক নিদারুণ আদেশ দিতে গিয়ে তাঁর গলা কাঁপলো না, চোখ ঝাপসা হ'লো না — এমন কথাও মনে হ'লো না যে সাধ্বীর এই নির্বাসনদণ্ড দুর্জনের পাপসন্দেহকেই সমর্থন জোগাতে পারে। এমনকি, সীতাকে আশ্রমে রেখে লক্ষ্মণ যখন ফিরে এলেন তখনও রাম অধিক বেদনা প্রকাশ করলেন না — পাছে আবার তাঁরই উপর দোষারোপ হয় (উত্তর : ৫২ : ১৪) — পাছে কেউ এখনো ভাবে তিনি 'কামাত্মা', 'সীতাসম্ভোগসুখে'র অভাববশত কাতর হয়েছেন[১৩]। যেমন সীতার অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপারে, তেমনি এখানেও একটি বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হ'লো : সীতাকে বর্জন করাই যেন যথেষ্ট নয়, বর্জন ক'রে রাম কোনো দুঃখ পাননি তাও প্রদর্শিত না-হ'লে চলবে না। কিন্তু রামের পক্ষে এটা যে শুধু প্রদর্শন নয়, তাও আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন বাল্মীকি — লক্ষ্মণের সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই রামের হৃদয় বিদীর্ণ হ'লো — সীতার জন্য বেদনায় নয়, চারদিন রাজকার্যে মন দিতে পারেননি ব'লে (উত্তর : ৫৩ : ৪)। এমনি ক'রে, তাঁর মর্ত্যলীলার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত — নিষ্কম্প্র, নিষ্করুণ,

নিষ্কলুষেয় — তিনি পালন ক'রে যাচ্ছেন তন্নিষ্ঠভাবে তাঁর কুলধর্ম, তাঁর রাজধর্ম, তাঁর স্বধর্ম — এবং এটাই তাঁর মহামানবত্বের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠাভূমি।

মহামানব, সাধারণ মানবিক বৃত্তির বহু উর্ধ্বে, এক অদ্বিতীয় কর্মবীর ও ধর্মবীর — এ-ই হলেন বাল্মীকির রামচন্দ্র। কিন্তু এই রাম আমাদের পক্ষে বড়ো সুদূর, যেন শ্বাসরোধকারী, কষ্টকরভাবে উর্ধ্বমুখ হ'য়ে তবে আমরা তাঁর খবিন্দুব দিকে তাকাতে পারি। প্রায় যেন অসহনীয়ভাবে ধর্মপরায়ণ[18] — এমনি তাঁকে মনে হয় আমাদের, এবং অনেক প্রখ্যাত পূর্বসূরিও তা-ই অনুভব করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, প্রাকৃত ভাষার কাব্য নাটক কথকতার মধ্য দিয়ে যিনি ভারতীয় আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছেন, সেই বিরহক্লিষ্ট রামচন্দ্র কালিদাস[15], ভবভূতি ও পরবর্তী কবিদের সৃষ্টি, মূল গ্রন্থে তাঁর চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। বাল্মীকিতে দেখি, রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণের পর রাম যেমনই উদ্বেলভাবে বিলাপ করেছিলেন, উত্তরকাণ্ডে তেমনি তিনি পাষাণপ্রতিম — কেনো এখন আর তিনি নির্বান্ধব বনবাসী নন, এখন তিনি লঙ্কাবিজয়ী অযোধ্যারাজ, আর সেই রাজপদবির দাবি অনুসারে তাঁকে সর্বদাই অব্যাকুল থাকতে হবে। উপরন্তু, সীতা এবার অপহৃতাও নন, ভর্তার দ্বারাই পরিত্যক্ত — এবং সজ্ঞানভাবে স্বকৃত কর্মের জন্য অনুশোচনা পৌরুষবিরোধী। বাল্মীকিও তা জানেন, তাই সীতাবর্জনের পরবর্তী আটত্রিশটি সর্গে সীতার কোনো উল্লেখ তিনি করলেন না; অবমানিতা নির্বাসিতাকে রামের প্রথম মনে পড়লো অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজনকালে — আর তাও শাস্ত্রিক কারণেই, যেহেতু পত্নীব্যতিরেকে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু তবু অর্ধাঙ্গিনীকে সশরীরে ফিরিয়ে না-এনে তিনি স্থাপন করলেন যজ্ঞস্থলে এক 'স্বর্ণসীতা' — এক কাঞ্চনময় প্রতিমা: জীবন্ত সীতা এখন কেমন আছেন, তাঁর

গর্ভজাত সন্তান (রামেরও সন্তান!) এখন কোথায় — অশ্বমেধের মতো একটি মহৎ উপলক্ষেও এ-সব নিয়ে রামের কোনো কৌতূহল জাগলো না। সীতার প্রত্যাবর্তন ঘটালেন লব-কুশের সাহায্যে বাল্মীকি; — কিন্তু পুত্রদ্বয়কে চিনতে পেরেও রাম রইলেন উচ্ছ্বাসহীন, সীতার পুনরাগমনেব জন্য যে অনুজ্ঞা দিলেন তাও এই শর্তে যে তাঁকে (আবার, আরো একবার!) বিশুদ্ধির প্রমাণ দিতে হবে (উত্তর : ৯৫ : ৪-৬); — এই দ্বিতীয় পুনর্মিলনের প্রাক্কালে রামের মধ্যে এমন একটিও লক্ষণ আমরা দেখলাম না, যা কোনো শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দ্বারা অশ্রুসঞ্চারীভাবে অভিনয়যোগ্য। সত্য, সীতাকে চোখে দেখাব পর রাম সর্বসমক্ষে পূবকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন (উত্তর : ৯৭ : ৪), এবং সীতাব শেষ মহিমান্বিত অন্তর্ধানের পর তাঁর শোক অদম্য হ'য়ে উঠেছিলো, তিনি জগৎসংসার শূন্য দেখেছিলেন (উত্তর : ৯৮ : ৩-১০, ৯৯ : ৪)। কিন্তু সেটা স্পষ্টতই তাঁর চরিত্রের পক্ষে অপলাপ, এক অস্বভাবী অশংসনীয় আচরণ — আর তিনিও অবিলম্বে সেটা বুঝে নিয়ে সংবৃত করলেন নিজেকে; 'বহু সহস্র বৎসর' যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মে 'সুখে' অতিবাহিত করলেন (উত্তর : ৯৯ : ২০)। এই 'সুখে' কথাটা কি ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত? কিন্তু তা-ই যদি হবে তাহ'লে গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশে, রামের অথবা অন্য কারো বা কবির নিজের মুখেও, সীতার নাম একবারও কেন শোনা গেলো না?

এমন কি হ'তে পারে না যে রাম তাঁর সীতাবর্জন-জনিত বিশাল শোক মহৎ চেষ্টায় চেপে রেখেছিলেন নিজের মধ্যে, এক সমুদ্রকে নিঃশব্দ ক'রে দিয়ে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেছিলেন? তা-ই ভাবতে ভালোবাসি আমরা, সেটাই আমাদের মনঃসম্মত — কিন্তু বাল্মীকিতে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও তার কোনো নিদর্শন আমি জোটাতে পারিনি। আমরা দেখেছি তুলনীয় অবস্থায় আরো দুই ইতিহবিশ্রুত

পুরুষকে ; তাঁরাও, রামেরই মতো, রাষ্ট্রের যূপে কান্তা নারীকে বলি দিয়েছিলেন ; কিন্তু রোমক সম্রাট তিতুস যাঁকে পরিত্যাগ করেন তিনি অন্তত তাঁর ভার্যা হননি তখনও, এবং ঈনিয়াস-দিদোর কবি-কথিত 'বিবাহ'টিও বিধানসম্মত সমাজস্বীকৃত বিবাহ নয়। তাছাড়া ঈনিয়াস, যিনি প্রতি পদে দৈব নির্দেশে চালিত, তাঁরও পক্ষে সহজ হয়নি কাজটি ; তিনিও দিদোর প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন বিদায়ভাষণে বলেছিলেন : 'আমি ইতালিয়াকে অনুসরণ করছি — স্বেচ্ছায় নয়' ; তিনিও তাঁর পলায়নপর তরণী থেকে কার্থেজের তটে চিতাগ্নি দেখে চিন্তিত হয়েছিলেন। আর তিতুসের মানসিক দ্বন্দ্বকে উন্মোচন করে বন্ধুর সঙ্গে, প্রেয়সীর সঙ্গে তাঁর দ্বিরালাপ, তীব্রতরভাবে তাঁর দীর্ঘ স্বগতোক্তি। পক্ষান্তরে, সীতা রামচন্দ্রের আবাল্য-বিবাহিতা পত্নী — চিরপ্রিয়তমা অনন্যা নারী তাঁর জীবনে, এবং সে-সময়ে অন্তঃসত্ত্বা — আর দিদো ও বেরেনিকে-র পূর্ব ইতিহাস স্মরণ ক'রে যদি বা আমরা তাঁদের অপরাধিনী ব'লে ভাবতে পারি, সীতা বিশ্বসম্মতিক্রমে পুণ্যবতী। আরো উল্লেখ্য, য়োরোপীয় পুরাণে নারীবর্জনের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য দেখা যায় : যাঁদের প্রণয়প্রেরিত সহায়তায় থেসেয়ুস ও য়াসোন অসাধ্যসাধন করেন, সেই আরিয়াদ্‌নে ও মেদেইয়াকে যথাসময়ে পরিত্যাগ করতে তাঁদের বাধেনি : এই সংলগ্নতায় ঈনিয়াস ও তিতুসের আচরণ বীরোচিত ব'লেই স্বীকার্য। কিন্তু সমগ্র ভারতীয় পুরাসাহিত্যে রামের দ্বিতীয় সীতাবর্জনই একমাত্র অনুরূপ ঘটনা[৭৬], আর বাল্মীকি যে-ভাবে এটি উপস্থাপিত করেছেন তাও অতি বিস্ময়কর। যুদ্ধকাণ্ডে অগ্নিপরীক্ষার প্রাক্কালে রাম অন্তত স্পষ্ট ভাষায় তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন, সীতার মুখেও প্রতিবাদ ফুটেছিলো ; কিন্তু এখানে রাম নিজের মুখে একটি কথাও বললেন না সীতাকে — আর সীতা, তাঁর নির্বাসনদণ্ড বুঝে নেবার পরেও, দুর্বলের মতো শুধু নিজেরই জন্য বিলাপ করলেন, একবারও

স্বামীকে কোনো অভিযোগ করলেন না (উত্তর : ৪৮)। মহামুনি বাল্মীকির মুখেও শুধু এই কথাটি শোনা গেলো যে সীতা অপাপা (উত্তর : ৪৯ : ১৪) — যা এ-মুহূর্তে পুনরায় বলার প্রয়োজন ছিলো না ; রামের আচরণ তিনিও মেনে নিলেন নিঃশব্দে ও বিনা সমালোচনায়। একবার, একবার মাত্র উচ্চারিত হ'লো প্রতিবাদ — লক্ষ্মণের মুখে (উত্তর : ৫০ : ৮) ; একবার, একবার মাত্র রামকে আমরা সাশ্রুলোচনে দেখতে পেলাম — ক্ষণিকের জন্য (উত্তর : ৫২ : ৬) ; কিন্তু যিনি ক্রৌঞ্চীর শোকে আর্দ্র হয়েছিলেন সেই কবি সীতার মুখপাত্র হ'য়ে একটি কথাও বললেন না ; অনার্য বালীর প্রতি যে-কাব্যিক সুবিচার তিনি সাধন করেছিলেন, তা থেকেও তিনি বঞ্চিত রাখলেন তাঁর মানসকন্যাকে ; এক অদ্ভুত উদাসীনতার বশবর্তী হ'য়ে ঘটনাটির তীব্রতা রাখলেন অব্যক্ত ; — কিন্তু তবু, অথবা সেইজন্যেই, সীতার বেদনা যুগান্ত পেরিয়ে চিরকাল ধ'রে ধ্বনিত হ'তে লাগলো।

আমরা কৃতজ্ঞ সেই কবিদের কাছে, যাঁরা বাল্মীকির সর্বগুণাধার নিশ্ছিদ্র রামচন্দ্রকে এক বিরহবিধুর প্রণয়ীজনে রূপান্তরিত করেছেন — কেননা ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষে দুর্গম হ'লেও প্রেমের অনুভূতি সর্বজনীন। কিন্তু মানতেই হবে, এই রূপান্তরীকরণে রাম সম্পূর্ণ লাভবান হননি, আমরাও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। রামের প্রেমিক-সত্তাকে রূপ দিতে গিয়ে ভবভূতি তাঁকে ক'রে তুলেছেন মূর্ছাপ্রবণ ও অসহায়ভাবে আত্ম-করুণায় মগ্ন ; আর কৃত্তিবাসের নায়ক যখন 'শত মন সোনা' দিয়ে তৈরি সীতামূর্তির সামনে সাত রাত্রি ধ'রে অশ্রুপাত করেন[৭৭], তখন মনে হয় রাম তাঁর রামত্ব হারিয়ে হ'য়ে উঠেছেন এক দীনভাবাপন্ন গ্রাম্যজন, এক মৃত্যুজঠর পরবর্তীকালের পরিপাকযোগ্য হবার জন্য তাঁকে তাঁর চারিত্র্য থেকে ভ্রষ্ট হ'তে হ'লো। সীতাবর্জনের সময় চারদিন

রাজকার্যে অমনোযোগের জন্য যিনি সন্তপ্ত হন সেই রাম নির্মম হ'লেও বা নির্মম ব'লেই আমাদের নমস্য; কিন্তু একই কারণে যে-ক্ষত্রিয় পুরুষ সপ্তরাত্রিব্যাপী অশ্রুপাত করেন তাঁর দুঃখে সমদুঃখী হওয়াও সহজ নয়। অশ্রুপাত দূরে থাক — শেক্সপিয়রের অ্যান্টনির মতো আমাদের বুকে কম্পন তুলে বাল্মীকির রাম কখনো ব'লে উঠতে পারতেন না: 'অযোধ্যা সরযূর জলে গ'লে যাক!' — অথবা যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'ছার রাজ্য, ছার সিংহাসন!'-এর মতো দ্রব উক্তিও তাঁর মুখে কোনো অবস্থাতেই কল্পনীয় নয়। একদিকে বাল্মীকির এই ঐকান্তিক ও অনম্য কর্তব্যসাধক, যাঁকে কখনো-কখনো আমাদের মনে হয় অ-মানুষিক বা অতিমানুষিক — আর অন্যদিকে উত্তরকবিদের অশ্রুপ্লাবিত বিরহী, যাঁকে রাজা অথবা বীর ব'লে প্রায় চেনাই যায় না: এই দুই মূর্তিকে ভেঙে-গ'ড়ে নিয়ে আমরা যে যার মনোমতো রামকে রচনা ক'রে নিতে পারি এবং নিয়েও থাকি। কিন্তু এই দুই বিপরীতের মধ্যবর্তী অন্য এক সম্ভাবনা আছে — যেখানে কর্তব্যবোধ মানবস্বভাবকে অতিক্রম করে না এবং আবেগজনিত বিহ্বলতারও স্থান নেই — আর সেই সম্ভাবনারই প্রতিমূর্তি হলেন যুধিষ্ঠির।

রাম বিসর্জন দিয়েছিলেন সীতাকে, আগামেম্নন্ তাঁর নিজ তনয়ার কণ্ঠচ্ছেদ করেছিলেন, প্রেমিকা দিদোর আত্মহত্যার কারণ হয়েছিলেন ঈনিয়াস — সবই ধর্মের কারণে। রাজা, সেনাপতি, সাম্রাজ্যস্থাপক — যথাক্রমে এই তিন ভূমিকার সম্পূর্ণ দাবি মেটাবার জন্য সব বাধা এঁদের ডিঙোতে হয়েছে — যে-কোনো মূল্যে, বিনা শোচনায়। এক মহত্তর স্তরে, পৃথিবীর ধর্মগুরুদের জীবনেও এই নির্মম একমুখিতা আমরা দেখতে পাই। স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকার নেই — এই ছিলো বুদ্ধের মত: তাই তাঁর মাতৃস্বসা ও শৈশবের প্রতিপালিকা বৃদ্ধা গোতমীর কাতর মিনতিকে তিনবার প্রত্যাখ্যান

করলেন তিনি, আর অবশেষে — আটটি কঠিন শর্ত আরোপ ক'রে — তাঁকে সন্ন্যাসিনী হবার অনুমতি দিলেন শুধু আনন্দর উপরোধে, ধূলিধূসর কর্তিতকেশিনী অশ্রুমুখী গোতমীর প্রতি করুণাবশত নয়[৭৮]। খ্রীষ্টের জীবনে দেখি, দুই ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব নিতে চাইলে তিনি তাদের ক্ষণকাল অপেক্ষার সময় মঞ্জুর করলেন না — পরিজনের কাছে বিদায় নেবার জন্য, এমনকি মৃত পিতাকে কবর দেবার জন্য যেটুকু সময় প্রয়োজন, সেটুকুও নয় (লুক : ৯ : ৫৯-৬২)। 'ছোটো' হরিদাস একবার এক রমণীর কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলেন, এই অপরাধে চৈতন্যদেব জীবনের মতো বর্জন করলেন তাঁর ভক্ত শিষ্যকে, বহু চেষ্টা ক'রেও মহাপ্রভুর দর্শন না-পেয়ে হরিদাস আত্মঘাতী হলেন। চৈতন্য তখন পুরীতে; জ্যোৎস্না-রাতে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ শুনলেন আকাশে এক আর্তনাদ, বুঝে নিলেন হরিদাসের আত্মা ক্ষমা চাইছে তাঁর কাছে, সশব্দে ব'লে উঠলেন[৭৯] : 'ক্ষমা করলাম।' আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধীর জীবনেরও দু-একটি অকরুণ মুহূর্ত এসেছিলো : তাঁর সহধর্মিণী এক 'পঞ্চমে'র মলভাণ্ড পরিষ্কার করতে রাজি হননি ব'লে গান্ধী তাঁকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, আর-একবার একটি স্বর্ণালংকার নিয়ে চোখের জলে ভাসিয়েছিলেন কস্তুর বা-কে[৮০]। যেমন রামের তাৎক্ষণিক বনগমনের সময়, তেমনি এ-সব ক্ষেত্রেও আমাদের মন প্রশ্ন না-তুলে পারে না : বুদ্ধের বুদ্ধত্ব কি তিলপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হ'তো, যদি তিনি তাঁর বাল্যধাত্রীকে একটি-দুটি সদয় কথা বলতেন ? অথবা খ্রীষ্ট তাঁর অনুগামীকে পিতার শবসংকারের মতো সময়টুকু দিলে স্বর্গরাজ্যের একটি রশ্মিও মলিন হ'তো কি ? না কি চৈতন্যের পুণ্যবিভায় কোনো ক্ষীণতম ছায়াপাত হ'তো, যদি অনুতপ্ত অপরাধীকে তিনি জীবিতাবস্থায় ক্ষমা করতেন ? আর সত্যি কি নীতিভ্রষ্ট হতেন গান্ধীজী, যদি দক্ষিণ আফ্রিকার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, বা ভাবী পুত্রবধূকে যৌতুক দেবার জন্য, তিনি কস্তুর

বা-কে উপহারপ্রাপ্ত অলংকারটি রক্ষা-করার অনুমতি দিতেন ?' কিন্তু এ-সব প্রশ্ন যারা উত্থাপন করে তারা দুর্বল সাধারণ মানুষ, আর যাঁদের উদ্দেশে উত্থাপিত হয় তাঁরা বীর অথবা সন্ত অথবা মানবের উদ্ধার-কারী ; — আর তাঁদের পক্ষে এগুলি নিতান্তই অবান্তর কথা। তাঁরা আবিষ্ট, তাঁরা প্রতিশ্রুত, তাঁরা দিব্যোন্মাদ : যে-ব্রতপালনের জন্য তাঁরা আবির্ভূত হন, তার কোনো ব্যত্যয় তাঁরা সহ্য করতে পারেন না ; তাঁদের অন্তর্লোক যে শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত, তার মধ্যে এই জগতের সব বর্ণবিচ্ছুরণ লুপ্ত হ'য়ে যায়। আমাদের ভক্তির প্রথম অধিকারী তাঁরাই, আমাদের বিস্ময়বোধের অন্তিমতম প্রান্তে তাঁরা অবস্থিত ; কিন্তু ইতিহাসই প্রমাণ করে তাঁদের অনুসরণকারী হবার মতো শক্তি আমাদের নেই ; বেঁচে থাকার দুর্ভর বোঝা নিয়ে আমরা যতক্ষণে কয়েকটি মাত্র পদক্ষেপ করি, ততক্ষণে এই মুক্ত পুরুষেরা আমাদের সম্ভবপরতার সীমা পেরিয়ে দূর দিগন্তে মিলিয়ে যান। মন্দিরে-মন্দিরে তাঁদের উদ্দেশে অর্ঘ্যদানের পর, যদি আমরা এমন কাউকে খুঁজি যিনি আমাদের চেয়ে উন্নত হ'য়েও আমাদের জীবনযাত্রায় নিত্যসঙ্গী হ'তে পারেন, আমাদের সব সমস্যা ও মানুষিক দুর্বলতার যিনি অংশভাগী, কোনো সহৃদয় প্রতিবেশীর মতো যিনি আমাদের পক্ষে অধিগম্য ও ব্যবহার্য — তাহ'লে সর্বাগ্রে আমাদের যুধিষ্ঠিরকেই মনে পড়ে।

যুধিষ্ঠির তাঁর মর্ত্যসীমা মেনে নিয়েছেন, তাঁর চরিত্রে কোনো চরমতা নেই। আমরা যারা ঋজুতার জন্য আকাঙ্ক্ষা নিয়েও বক্র পথে না-চ'লে পারি না, আদর্শের প্রতি অনুরাগ নিয়েও হ'তে পারি না নিষ্কলভাবে আপোশহীন — যেহেতু আমাদের প্রয়োজন আমাদের বাধ্য করে, সুখে দুঃখে পরিবর্তনশীল এই জগৎ আমাদের বাধ্য করে — সেই আমাদেরই মতো একজন ব'লে মনে হয় তাঁকে, কিন্তু অনেক বেশি মননশীল ও অনুভূতিসম্পন্ন, আরো অনেক উন্মীলভাবে

সচেতন। ধর্মাত্মা, কিন্তু কখনোই ধর্মান্ধ নন — তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই সংকীর্ণ ও কষ্টকর ভূমিটুকুর উপর যেখানে সব শাস্ত্র শিখে নেবার পরেও সংশয়ের অবকাশ থাকে, সহস্রবার উপদেশপ্রাপ্ত হবার পরেও প্রমিতির সন্ধান মেলে না। তাঁর কৌলিক ক্ষত্রধর্ম তাঁর স্বভাবের বিরোধী, অথচ সেটিকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে তিনি পারেন না, আর যেটি তাঁর প্রকৃতি-জ দয়াধর্ম, অবস্থার চাপে তা থেকেও তাঁকে বিচ্যুত হ'তে হয়। এই দোটানার মধ্যে একটি শুধু অবলম্বন আছে তাঁর — সব তত্ত্বজ্ঞান ও বিধিবিধানের যা বাইরে — হৃদয়সঞ্জাত নিদ্রাহীন এক বেদনাবোধ, আমরা সাধারণত যাকে বিবেক ব'লে থাকি — এমনও বলা যায় গীতার অর্থে এই বেদনাবোধই তাঁর 'স্বধর্ম'। কিন্তু শুধু বিবেক বা হৃদয়ের উপর নির্ভর করলে মানুষ তার নিজেরই চৈতন্যের ভারে পিষ্ট হ'য়ে যেতে পারে — আমরা ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে তার দৃষ্টান্ত দেখেছি; কিন্তু যুধিষ্ঠির কোনো প্রিন্স মিশকিনও নন, নিষ্ক্রিয়ভাবে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রবান হবার মতো ভাগ্য নিয়ে তিনি জন্মাননি — তিনি কর্মের জালে জড়িয়ে আছেন, সংসারচক্রে ঘূর্ণিত হচ্ছেন — আবার বলছি, 'আমাদেরই মতো', অথচ আমরা কেউ তাঁর মতো নই। ভারতবর্ষীয় প্রতিভার এই এক অদ্ভুত ও অতুলনীয় সৃষ্টি, যুধিষ্ঠির: কর্মকারী কিন্তু কর্মবীর নন, ধর্মাচারী কিন্তু ধর্মবীর নন, অফুরন্তভাবে জ্ঞানান্বেষী হ'য়েও জ্ঞানগুরু হ'তে পারলেন না, স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা নিয়েও তপস্যারত হলেন না কখনো — আমাদের অনেক ভাগ্যে কোনো অর্থেই তাঁকে মহাপুরুষ বলা যায় না — তিনি মানুষ, শুধুমাত্র মানুষ, প্রায় এক 'সাধারণ' গৃহস্থ, যাঁর মুখচ্ছবিতে মানবজীবনের সব দায়িত্ব ও দায়িত্বজনিত বেদনার রেখা অঙ্কিত হ'য়ে আছে, এবং সেইজন্যেই যিনি চিরস্মরণীয়।

৬৯। বনবাসের প্রথম দিনে, সুমন্ত্রকে বিদায় দেবার পর সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মণের সঙ্গে নিভৃতে ব'সে রাম বললেন (অযোধ্যা : ৫৩ : ৭-১০) : 'আমি শঙ্কিত হচ্ছি, লক্ষ্মণ, পাছে ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য কৈকেয়ী দেবী দশরথের প্রাণহানি ঘটান। পিতা এখন বৃদ্ধ ও কামার্ত, কৈকেয়ী তাঁকে বশে এনেছেন, আমিও কাছে নেই — এ-অবস্থায় মহারাজ কী করবেন জানি না। তাঁর এই মতিভ্রম দেখে আমার মনে হচ্ছে অর্থ ও ধর্মের চেয়ে কামই প্রবল। কোনো অবিদ্বান ব্যক্তিও কি প্রমদা পত্নীর জন্য আমার মতো সেবক পুত্রকে ত্যাগ করতে পারে ?'

রাম, লক্ষ্মণ ও জনগণের মুখে বার-বার 'কাম' শব্দটি শুনতে পেয়ে কোনো পাঠক পাছে ক্ষুব্ধ হন, তাই মূল গ্রন্থ থেকে দু-একটি তথ্য এখানে জানিয়ে রাখছি। কৈকেয়ীর মানভঞ্জনের দৃশ্যে বাল্মীকি দশরথকে বার-বার বলছেন 'কামী,' 'কামমোহিত,' 'মন্মথশরবিদ্ধ,' ইত্যাদি (অযোধ্যা : ১০-১১), এবং ভূতলশায়িনী তরুণী ভার্যার সঙ্গে বৃদ্ধ রাজার ব্যবহারে এই পুনরাবৃত্ত বিশেষণগুলির পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। রাজা কৈকেয়ীর গৃহে গেলেন 'রত্যর্থী' অবস্থায়, 'প্রাণের চেয়েও গরীয়সী' ভার্যার অঙ্গমার্জনা করলেন স্বহস্তে, কেশদামে হস্তচালনা করলেন — এই সব অনুপুঙ্খযোগে বাল্মীকি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথের ইন্দ্রিয়লালসাই প্রধান অপরাধী।

৭০। সুগ্রীবও রাজা হবার পরে বালীর সদ্যবিধবা পত্নীকে অঙ্কশায়িনী ক'রে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই অপরাধ নির্বিবাদে উপেক্ষা করলেন রামচন্দ্র ; সুগ্রীবকে তিনি 'বালীর পথে' পাঠাতে চাইলেন — ভ্রাতৃবধূগ্রহণের জন্য নয়, সীতা-উদ্ধার বিষয়ে অমনোযোগের জন্য। যথোপযুক্ত শাস্ত্রবচন এখানেও উল্লিখিত হ'লো : 'ব্রহ্মা বলেছেন কৃতঘ্ন ব্যক্তি বধযোগ্য, তাই সুগ্রীব যেন উপকারীর প্রত্যুপকার করতে না ভোলে' (কিষ্কিন্ধ্যা : ৩৪ : ১১-১২)। 'সকল ভ্রাতাই ভরতের তুল্য হয় না' — এই সরল সূত্রের তলায় বিভীষণের ভ্রাতৃদ্রোহরূপ অন্যায় আচরণ চাপা প'ড়ে গেলো (যুদ্ধ : ১৮ : ১৫) — রাবণ-বধের যন্ত্রস্বরূপ রাবণ-ভ্রাতাকে ব্যবহার করতে রাম কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হলেন না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ও যুদ্ধকাণ্ডে সেই কর্মই ধর্মসংগত, যা সীতা-উদ্ধারের সহায়ক, কেননা ক্ষাত্রধর্ম ও রাজধর্ম অনুসারে সেটাই তখনকার মতো রামের পক্ষে প্রাথমিক ও আবশ্যিক কর্তব্য।

৭১। রাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর সীতার উক্তি :

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ॥
(যুদ্ধ : ১১৬ : ৫)

—'নীচ ব্যক্তি নীচ নারীকে যেমন বলে — হে বীর, তুমি আমাকে সেই রকম কর্কশ, অনুচিত ও কর্ণকটু বাক্য শোনাচ্ছো কেন?'

৭২। রামের এই আচরণকে মধ্যযুগের ভক্তিরসাপ্লুত কবিরা মেনে নিতে পারেননি — তাঁরা নানা উপায়ে এটিকে মৃদু ও কোমল ও রামের পক্ষে শ্লাঘনীয় ক'রে এঁকেছিলেন। কৃত্তিবাসে তবু বাল্মীকির প্রেতসঞ্চার দেখা যায়, কিন্তু তুলসীদাস — যিনি এক এপিক-কাব্যের নায়ককে ঈশ্বরের অবতার-রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর মতে ঘটনাটি একটি 'ললিত নরলীলা' মাত্র। তাঁর 'রামচরিতমানসে'র অরণ্যকাণ্ডে এই 'ললিত লীলা' প্রথম অনুষ্ঠিত হয় : পতির নির্দেশে সীতা নিজে অনলে প্রবিষ্ট হ'য়ে বাইরে রেখে যান অবিকল তাঁরই অনুরূপ একটি ছায়ামূর্তি শুধু (তুলসীদাসের ভাষায় 'প্রতিবিম্ব'), এবং এরই অব্যবহিত পরে রাবণের আবির্ভাব ঘটে। যুদ্ধকাণ্ডের অগ্নিপরীক্ষা এই ঘটনারই পুনরুক্তি ব'লে কথিত হয়েছে — অথবা তার পরিপূরণ ; অর্থাৎ প্রকৃত সীতা এতদিনে তাঁর অগ্নিগুণ্ঠন থেকে বেরিয়ে এসে জগৎসমক্ষে প্রকাশিত হলেন, এবং তাঁকে প্রকাশিত করাই ছিলো রামচন্দ্রের উদ্দেশ্য।

অগ্নিপরীক্ষার এই ব্যাখ্যা চমকপ্রদ সন্দেহ নেই, কিন্তু এটি তুলসীদাসের নিজস্ব উদ্ভাবন নয়, প্রাচীনতর অধ্যাত্ম-রামায়ণেও এই ঘটনাই বর্ণিত আছে। সেখানেও রামচন্দ্র শতকল্প-একশো পরিমাণে বিষ্ণুর অবতার, এবং সীতা লক্ষ্মী দেবীর নামান্তর মাত্র ; এবং সেখানেও (অরণ্য : ৭) রামের নির্দেশক্রমে দেবী জানকী বাইরে একটি মায়ামূর্তি রেখে নিজে 'এক বছরের জন্য' আগুনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছিলেন, এবং রাবণবধের পর যাঁর অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিলো (লঙ্কা : ১২), তিনি দেহধারিণী মৈথিলী নন, বিদেহিনী 'মায়াসীতা' মাত্র। অর্থাৎ, সীতাহরণ ব্যাপারটা আগাগোড়াই ফাঁকি, শুধু এক ছায়ামূর্তির জন্য এত বড়ো একটা যুদ্ধ হ'য়ে গেলো! ঠিক যেন স্তেসিকোরস-প্রবর্তিত ছায়া-হেলেনের গল্প, যার উল্লেখ আমি গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে করেছি। আরো লক্ষণীয় : সীতার প্রতি রামের বিখ্যাত বা

কুখ্যাত কটূক্তির উল্লেখমাত্র তুলসীদাসে নেই, আর অধ্যাত্ম-রামায়ণে শুধু এটুকু উল্লিখিত আছে যে রাম সীতাকে অনেক 'অকথ্য কথা' বললেন ('অবাচ্যবাদান্ বহুশঃ প্রাহ তাং রঘুনন্দনঃ'), যা সহ্য করতে না-পেরে সীতা ঝাঁপ দিলেন আগুনে। এখানেও অগ্নিপরীক্ষা সীতার পুনরুদ্ধারের নামান্তর, কবি সেটা স্পষ্ট ক'রে না-বললেও আমরা বুঝে নিতে পারি।

কিন্তু এই ধরনের কপোলকল্পনার বহু ঊর্ধ্বে বাল্মীকির প্রতিষ্ঠা। অগ্নিপরীক্ষার নিষ্ঠুর বাস্তবের উপর তিনি যে কোনো আচ্ছাদন টেনে দেননি, উত্তরকাণ্ডে কঠিন রেখেছেন রামচন্দ্রকে, সেইজন্যেই তাঁর কাব্য চিরবরণীয়, এবং তাঁর প্রসাদজীবী উত্তরসাধকেরাও সার্থক। এ-বিষয়ে আমার "রামায়ণ" প্রবন্ধে একবার আলোচনা করেছিলাম ('সাহিত্যচর্চা', ২য় সং, ত্রিবেণী, বঙ্গাব্দ ১৩৬৮, পৃ ১-১৬ দ্র); তার পরিপূরকরূপে এখানে আমি বলতে চাই যে বাল্মীকি যা অনুক্ত রেখেছিলেন, সেই বিরহব্যথাকে ভাষা দিয়েছিলেন পরবর্তী কবিরা; — শুধু রাম-সীতার প্রসঙ্গে নয়: যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়া, মদন ও রতি, কৃষ্ণ ও রাধা, এবং আধুনিক যুগে সাধারণ মানুষ-মানুষীর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গেও — কালিদাস থেকে বৈষ্ণব কবিদের পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিরহের যে-বহুলাঙ্গ বিচিত্র প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, তার আদি উৎস নিঃসন্দেহে বাল্মীকি — তিনিও, ভার্জিলেরই মতো, অনভিপ্রেতভাবে এক চিরায়ত প্রেম-কাব্যের প্রণেতা হয়েছিলেন।

৭৩। বলা দরকার, শোকসংবরণের পরামর্শটি রামকে দিয়েছিলেন লক্ষ্মণ, কিন্তু সর্বদা-স্বমত-চালিত রামচন্দ্র যে শোনামাত্র অনুজের কথাটি মেনে নিলেন তাতে বোঝা যায় পরামর্শের কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

এমনও হ'তে পারে যে কামপরায়ণ দশরথকে প্রজারা সমবেত কণ্ঠে ধিক্কার দিয়েছিলো ব'লে রামচন্দ্র ঐ একটি অপবাদ বিষয়ে অতিমাত্রায় সতর্ক হ'য়ে পড়েছিলেন, সব সম্ভবপর উপায়ে প্রমাণ করেছিলেন যে ঐ পিতৃদোষ তাঁকে স্পর্শ করেনি। অবশ্য সাধারণ ন্যায়ধর্মের হিশেবে, এটা কোনো কারণ হ'তে পারে না যার জন্য প্রাণপ্রিয়া পুণ্যাত্মা পত্নীকে বিসর্জন দেয়া যায়, এখানে কোনো সত্যপালনের দায়িত্বও ছিলো না; — কিন্তু রামায়ণ কাব্যের পক্ষে এটা ছিলো অপরিহার্য প্রয়োজন, কাব্যের বিচারে সীতার নির্বাসন ও পাতালপ্রবেশই রামায়ণের মহত্তম ঘটনা।

৭৪। সীতাকে নির্বাসনে রেখে ফেরার পথে লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বলেছিলেন (উত্তর : ৫০ : ৭-৮) : 'পৌরজনের কথায় রাম এমন নৃশংস ও অযশস্কর কর্ম কী ক'রে করতে পারলেন? এতে কোন ধর্ম রক্ষিত হ'লো ?' — কিন্তু সুমন্ত্রকে নিভৃতে যা বলা গিয়েছিলো তা রামের সামনে লক্ষ্মণ অথবা অন্য কেউ কখনো মুখে আনেননি।

৭৫। এই তালিকায় উজ্জ্বলতম উদাহরণ রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ যেখানে রাম-সীতা লঙ্কা ছেড়ে অযোধ্যার দিকে বিমানযাত্রী। ঘটনাটি অবশ্য বাল্মীকি থেকেই আহৃত (যুদ্ধ : ১২৩), কিন্তু দুই লেখনে তুলনা করলে আদি রামের ব্যক্তিস্বরূপ আরো স্পষ্ট হয়। কালিদাসের রামের মুখে শুনি সমুদ্রবর্ণনা, ভূদৃশ্যবর্ণনা, আর প্রণয়গুঞ্জন অবিরল; কিন্তু বাল্মীকিতে তিনি যুদ্ধ-বৃত্তান্তের চুম্বক বললেন, নিসর্গের প্রতি অন্যমনস্ক — এবং তাঁর পূর্বতন বিরহদুঃখ স্মরণ করলেন মাত্র একবার, অতি সংক্ষেপে (শ্লোক : ৪১)। বাল্মীকি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অরণ্যকাণ্ডের প্রকৃতিমুগ্ধ প্রণয়বিহ্বল রামচন্দ্র আর নেই, অন্তর্বর্তী ঘটনার চাপে তিনি বদলে গিয়েছেন — ফিরে যাচ্ছেন, বিজয়ী বীর, স্বদেশে — যেখানে প্রজাপালনের বিরাট দায়িত্ব অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। 'ঐ আমার পিতৃরাজধানী অযোধ্যা — সীতা, প্রণাম করো।' — রামের এই ক্ষুদ্র গম্ভীর শেষ উক্তিটিতে সেই দায়িত্বপালনের সংকল্প ধ্বনিত হ'লো।

৭৬। বলা বাহুল্য, নল-কর্তৃক দময়ন্তী-ত্যাগ তুলনীয় ঘটনা নয়, কেননা নলের আচরণ কোনো সামাজিক বা সাংসারিক সুবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়নি, বরং তা বুদ্ধিভ্রংশেরই একটি চরম উদাহরণ।

ঈনিয়াস-দিদোর কাহিনীর উৎস ভার্জিলের ঈনীড কাব্য (প্রথম সর্গ থেকে পঞ্চম সর্গের প্রথম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত); তিতুস-বেরেনিকে-র জন্য রাসীন-এর 'বেরেনীস' নাটক দ্র। (লাতিন 'বেরেনিকে' নামের ফরাশি প্রকরণ 'বেরেনীস'।)

৭৭। কৃত্তিবাস থেকে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক পঙক্তি উদ্ধৃত করছি :

সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর।
সীতা নহে রঘুনাথ কে দিবে উত্তর॥
এক দৃষ্টে চাহেন সীতার সোনামুখ।
উত্তর না পেয়ে রামের বড় হয় দুখ॥

সাত হাজার বৎসর যে সীতার সংহতি।
সোনার সীতা দেখিয়া বঞ্চিল সাত রাতি ॥
সাত রাত্রি বঞ্চিয়া রাম আইল বাহির।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর ॥

(উত্তর : অ : 'স্বুবর্ণ সীতা')

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তুলসীদাসে দ্বিতীয় সীতাবর্জনের নামগন্ধ নেই; তাঁর উত্তরকাণ্ডটিতে কোনো ঘটনাই স্থান পায়নি — সেখানে আদ্যন্ত ধ্বনিত হচ্ছে রামরূপী ভগবানের স্তবগান।

৭৮। *Buddhism in Translation* : Henry Clarke Warren, Atheneum, New York, ১৯৬৩, পেপার-ব্যাক সং, পৃ ৪৪১-৪৫ দ্র। (মূল গ্রন্থ : 'চুল্ল-বগ্‌গ'।)

৭৯। ঘটনাটি 'চৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লিখিত আছে, আমার উৎস দীনেশ-চন্দ্র সেন ('বৃহৎ বঙ্গ,' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সং বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২য় খণ্ড, পৃ ৭৭৯)।

৮০। *An Autobiography* : M. K. Gandhi, Navajivan, Ahmedabad, সং ১৯৬৮, পৃ ১৬৪-১৬৭ ও ২০৭-২০৯ দ্র। স্মর্তব্য, অলংকারটি ব্যক্তিগতভাবে কস্তুর বা-কেই উপহার দেয়া হয়েছিলো, তাই গান্ধীজীর পক্ষেও কর্তব্যনির্ধারণ সহজ হয়নি।

'অস্পৃশ্য' অর্থে 'পঞ্চম' শব্দটি গান্ধীজীর, আমি অন্য কোথাও এর ব্যবহার পাইনি — যদিও 'চলন্তিকা'য় 'মাদ্রাজ প্রদেশের অস্পৃশ্য জাতি' ব'লে নির্ণীত আছে দেখলাম। চতুর্বর্ণবহির্ভূত, তাই 'পঞ্চম' এই ব্যাখ্যা সহজেই অনুমেয়, মনে হয় গুজরাটেও এর প্রচলন আছে।

১৬ : ঘরে-বাইরে

রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে বলেছিলেন 'গৃহাশ্রমের কাব্য', দীনেশচন্দ্র তাতে যৌথ পরিবারের 'আদর্শ' চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন[৮১]।

বাংলাদেশে এ-দুটো কথা প্রায় কবিপ্রসিদ্ধিতে দাঁড়িয়ে গেছে — আমি আবাল্য এর পুনরাবৃত্তি শুনে আসছি — কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে কোনোটাই প্রামাণিক নয়। পারিবারিক সম্পর্কগুলির উপস্থাপনা রামায়ণে যে অকরুণভাবে বাস্তবনিষ্ঠ তা ভুলে থাকলে আমরা বাল্মীকির প্রতি অবিচার করবো। কুভ্রাতা বিভীষণ বালী সুগ্রীব, অতি সহজে সাধ্বিতাচ্যুত বালীপত্নী তারা — এদের না-হয় ছেড়ে দেয়া গেলো, কেননা তারা অনার্য আর দুটো উক্তিরই ভিত্তি হ'লো আর্য সভ্যতা। কিন্তু পবিত্র ইক্ষ্বাকুবংশজাত দশরথ, যিনি তরুণী পত্নীর মানভঞ্জনের জন্য প্রথমেই মোহাচ্ছন্নভাবে ব'লে ওঠেন, 'বলো, কোন অবধ্যকে বধ করতে হবে, কোন বধ্যকে মুক্তিদান করবো?' (অযোধ্যা : ১০ : ৩৩) — সেই দশরথ কি গৃহপতির ভূমিকায় চলনসইরকমও ভালো? এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে মন্থরা-চালিত কৈকেয়ীর মূঢ় আচরণের মধ্যে যৌথ পরিবারের চিরকালীন আত্মধ্বংসী প্রবণতাই স্ফুট হয়েছে — মহাভারতে যেমন দুর্যোধনের, তেমনি এখানেও কৈকেয়ীর ঈর্ষা তাঁর পারিবারিক পরিবেশ থেকেই উদ্ভূত। এবং যখন মনে পড়ে সেই উপেক্ষিতাকে, যাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথ প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন — ক্বচিৎ-দৃষ্টা দুঃখিনী সেই উর্মিলা, স্বামী বর্তমান থাকতেও যাঁর জীবন ছিলো চিরন্তন বিধবার মতো — যখন ভাবি ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর প্রতি অস্বাভাবিক বা অস্বভাবী আসক্তিবশত লক্ষ্মণ সারাজীবন তাঁর স্বীয় ভার্যাকে কী-রকম অমানুষিক অবহেলা করেছিলেন, এবং স্বীয় পত্নীর প্রণয়ভুঞ্জনকারী রাম সেই আচরণের কোনো প্রতিবাদ করেননি, তখন আমি অন্তত বুঝতে পারি না রামায়ণকে কোনো 'আদর্শ' পারিবারিক চিত্র কেমন ক'রে বলা যায়। কেননা শুধু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, সব সনাতন আর্যবিধি অনুসারেও পত্নী মাননীয়া ও আদরণীয়া — স্বয়ং মনু সেই মর্মেই উপদেশ দিয়েছেন[৮২]। রামায়ণ 'গৃহাশ্রমের কাব্য' এ-কথাটাও শুধু গল্পাংশ

বিষয়ে কিছু পরিমাণে প্রয়োজ্য হ'তে পারে ; রাম নিজে এর সপক্ষে ঠিক সাক্ষ্য দেন না। পারিভাষিক অর্থে রাম নিশ্চয়ই গৃহস্থ (যেহেতু তিনি বিবাহিত ও সংসারক্ষেত্রে সঞ্চরণশীল), কিন্তু সপ্তকাণ্ড পুঁথির মধ্যে আমরা তাঁকে গৃহবাসীরূপে দেখতে পাই দু-বার মাত্র : একবার বালকাণ্ডের শেষ অংশে, আর-একবার উত্তরকাণ্ডে সীতাবর্জনেব পূর্বমুহূর্তে (সর্গ : ৪১)। 'ভারতবর্ষীয় গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখ, সুবিধার জন্য ছিল না — গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত —' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাত্ত্বিক দিক থেকে মেনে নিয়েও বলতে পারি যে গৃহের কেন্দ্রবিন্দুটি নিভৃত ও ঘনিষ্ঠ, অল্প কয়েকটি সহবাসী ও সহযোগী মানুষকে ঘিরে-ঘিরেই তা গ'ড়ে ওঠে ও সমাজকে আতিথ্য দেবার মতো বল প্রাপ্ত হয় — এবং সেই ধরনের গৃহরচনার অবকাশ রামের জীবনে অল্পই এসেছিলো, তাঁর চিত্তবৃত্তিরও উন্মুখতা ছিলো না সেদিকে। কথিত আছে, তিনি অযোধ্যার প্রাসাদে সীতার সঙ্গে বহুকাল ('বহূন্ ঋতূন্') 'তদ্গত'ভাবে মধুচন্দ্র যাপন করেছিলেন (বাল : ৭৭ : ২৫-২৯) ; কিন্তু এটা নিছক একটি তথ্য হিশেবেই জানানো হয়েছে আমাদের, এর মধ্যে রামের চরিত্রের কোনো অভিব্যক্তি নেই, তাঁর মহত্ত্বের কোনো প্রকাশ নেই — কলমের এক আঁচড়ে এটা ব'লে নিয়ে বাল্মীকি দ্রুত চ'লে এলেন মন্থরা-কৈকেয়ীর চক্রান্তে, যেখান থেকে রামের সত্যিকার জীবন আরম্ভ হ'লো। আর সেই জীবন ব'য়ে চলে অবিরলভাবে বাইরে, প্রায় সর্বদাই অসংখ্যের চোখের সামনে, প্রায় সর্বদাই কোনো-না-কোনো বিপুল কর্মে স্রোতস্বল। তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে স্থান পায় — শুধু আত্মীয়েরা নয় — সেনাবাহিনী ও সমর-মিত্র ও অযোধ্যা-কিষ্কিন্ধ্যার জনগণ ; তাঁর গৃহের সীমা বিস্তীর্ণ হ'তে-হ'তে প্রায় জগতের মধ্যে লীন হ'য়ে যায়। পারিবারিক সম্পর্ক বলতে আমরা যা বুঝি (এবং দীনেশচন্দ্র যা বুঝেছিলেন), সেগুলি রামের পক্ষে বড়ো

স্বল্পায়তন; মহত্ত্বের দ্বারা মণ্ডিত ক'রে নিয়ে তবে তিনি গ্রহণ করতে পারেন সেগুলিকে; কোনো কঠিন ত্যাগ বা দুঃসাধ্য সংগ্রামের উপলক্ষ হিশেবেই তাঁর কাছে আত্মীয়তাবোধ মূল্যবান। যেখানে তিনি পুত্র বা পতি বা ভ্রাতা, সেখানেও তিনি প্রভাবশালী লোকনায়ক, এ-কথাটা তিনি নিজে কখনো ভোলেননি এবং আমাদেরও ভুলে গেলে চলবে না। সত্যি বলতে, অরণ্যকাণ্ডে সীতার জন্য বিলাপের অংশটি বাদ দিলে, তাঁর পারিবারিক জীবনেও একটি অসাধারণ নৈর্ব্যক্তিকতা ধরা পড়ে — যেন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি শুধু কর্মসূত্রে জড়িত, সত্যিকার অন্তরঙ্গ তাঁর কেউ নেই। লক্ষ্মণ তাঁর 'দ্বিতীয় প্রাণ'[৮৩]; কিন্তু অযোধ্যাকাণ্ডের পর থেকে, উভয় পক্ষেরই অনুক্ত সম্মতিক্রমে, লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা হ'য়ে ওঠে — দুই সমকক্ষ ভ্রাতার নয়, আদেশকর্তা প্রভু ও আজ্ঞাবহ ভৃত্যের; সীতাবর্জনের সময় লক্ষ্মণ যখন প্রতিবাদ করার অধিকারটুকুও পেলেন না তখন সেটা কষ্টকর ভাবে প্রকট হ'য়ে উঠলো। ভরতকে রাম শ্রদ্ধা করেন কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না, তার প্রমাণ আমরা দু-বার পেয়েছি। কৈকেয়ীর আজ্ঞা শুনে রাম বনযাত্রার উদ্যোগ করছেন — তখন পর্যন্ত সীতা সঙ্গে যাবেন ব'লে স্থির হয়নি — এ-রকম সময়ে বিদায়কালীন উপদেশ হিশেবে তিনি সীতাকে বললেন (অযোধ্যা: ২৬: ২৫), 'ভরতের সামনে আমার গুণকীর্তন কোরো না, ঋদ্ধিশালী পুরুষ অন্যের প্রশংসা সইতে পারে না।' আবার যুদ্ধের শেষে, বনবাসের চোদ্দ বছর পূর্ণ হবার পর রাম যখন স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পথে, তখন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম থেকে হনুমানকে অগ্রিম অযোধ্যায় পাঠালেন ভরতের মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য (যুদ্ধ: ১২৫: ১৪-১৫)। 'আমি মিত্রসমেত ফিরে যাচ্ছি শুনে ভরতের মুখের ভাব কেমন হয় তা লক্ষ কোরো ··· তাঁর মতিগতি শীঘ্র আমাদের জানা দরকার।' — উভয়

স্থলেই ভ্রাতৃস্নেহকে ছাপিয়ে উঠেছে রামচন্দ্রের গভীর বুদ্ধি ও রাজনৈতিক সতর্কতা। আমরা লক্ষ করি যে চিত্রকূটে পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রাম অতিমাত্রায় শোকার্ত হলেন না, মুহূর্তের জন্য সংজ্ঞা হারিয়ে তখনই তাঁর আত্মস্থতা ফিরে পেলেন — রামায়ণের মাপজোক অনুসারে তাঁর বেদনার ভাষাও ক্ষীণাঙ্গ, আটটি মাত্র শ্লোকে তা পর্যবসিত হ'লো (অযোধ্যা : ১০৩ : ৮–১৫)। সীতা-বিসর্জন বিষয়ে এখানে কিছু না-বললেও চলে, কিন্তু এটাও কম উল্লেখযোগ্য নয় যে উত্তরকাণ্ডে লব-কুশের আগমনের পরে রাম তাদের গ্রহণ করলেন শুধু রামায়ণ-গানের উদ্গাতারূপে, তাঁর এবং অন্তর্হিতা সীতার সন্তান হিশেবে বিশেষ কোনো অভ্যর্থনা তাদের জানালেন না, একবারও প্রবৃত্ত হলেন না তাদের সঙ্গে সম্ভাষণে বা সংলাপে — শুধু যথাসময়ে যথোচিতভাবে পুত্রদ্বয়কে রাজ্যদান করলেন। রাজা, যোদ্ধা, সত্যব্রত বীর, আর শেষ পর্যায়ে নিঃশোকভাবে যজ্ঞপরায়ণ — এই সব প্রধান ভূমিকায় রামকে দেখে-দেখে আমরা এতদূর পর্যন্ত অভ্যস্ত হয়েছি যে চেষ্টা ক'রেও কোনো অন্তঃপুরে বা গৃহাঙ্গনে তাঁকে ধরাতে পারি না — কেবলই মনে হয় গার্হস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বেশি মহৎ তিনি, অত্যন্ত বেশি বৃহৎ।

এবং এ-কথাও স্মর্তব্য যে বাল্মীকি সচেতনভাবে কোনো গৃহাশ্রমের কাব্য লেখেননি, তাঁর রামায়ণ ঘোষিতভাবে এক মহাপুরুষের জীবনচরিত। বালকাণ্ডের প্রথম আঠারোটি শ্লোকে রামের বিষয়ে বহু গগনচুম্বী বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু একটিতেও গার্হস্থ্যের প্রতি কোনো উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে, মহাভারতের মুখবন্ধেই গৃহাশ্রমের প্রশংসা পাওয়া যায়। এই প্রশংসা মনুসংহিতাতেও উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে — কিন্তু মহাভারত কোনো নীতিশাস্ত্র নয়, একটি অতিদূরবিস্তারী কাব্য; সেখানে গৃহাশ্রমের প্রশস্তি ঠিক প্রত্যাশিত ছিলো না :

ভূতসংস্থানি সর্বাণি রহস্যং বিবিধং চ যৎ।
বেদা যোগঃ সবিজ্ঞানো ধর্মোঽর্থঃ কাম এব চ ॥
ধর্মকামার্থযুক্তানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
লোকযাত্রাবিধানং চ সর্বং তদ্ দৃষ্টবানৃষি ॥

অস্য কাব্যস্য কবয়ো ন সমর্থা বিশেষণে।
বিশেষণে গৃহস্থস্য শেষাস্ত্রয় ইবাশ্রমাঃ[৮৪] ॥
(আদি : ১ : ৪৮-৪৯, ৭৩)

—'প্রাণীগণের সব বাসস্থান, ধর্ম অর্থ ও কামের রহস্য, ব্যাখ্যাসমেত বেদ ও যোগশাস্ত্র, ধর্ম অর্থ ও কামসংক্রান্ত এবং লোকযাত্রাবিহিত শাস্ত্রসমূহ — ঋষি (বেদব্যাস) তা সবই জানতেন।

'যেমন গার্হস্থ্যাশ্রমকে অন্য তিনটি অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি এই কাব্যকে (মহাভারতকে) অতিক্রম করতে কবিরাও পারবেন না।'

কেন — আমরা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি — মহাভারতের মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে কেন উল্লিখিত হ'লো শুধু ধর্ম অর্থ ও কাম, এবং সেই সব বিদ্যা যা লোকযাত্রাবিহিত — অর্থাৎ সর্বসাধারণের জীবনে যা কাজে লাগে? চতুর্বর্গের মধ্যে যেটি সবচেয়ে কাঙ্ক্ষণীয় ও সবচেয়ে দুর্লভ সেই মোক্ষ বর্জিত হ'লো কেন? আধ্যাত্মিকতার আদর্শ অনুসারে সন্ন্যাসই মহত্তম আশ্রম, এবং একদা-গৃহবাসীর পক্ষেও অন্ত্য কালে সেটাই বরণীয়, কিন্তু কেন এখানে গার্হস্থ্যের স্থান সর্বোচ্চে? আমরা জানি ও মানি যে মহাভারত জনগণের গ্রন্থ; যে-বিষয়ে সর্বজনের অভিজ্ঞতা আছে সেই সংসার-জীবনই এর ভিত্তিভূমি ও অবলম্বন; — কিন্তু তাই ব'লে মোক্ষ বা সন্ন্যাস কেন উপেক্ষিত হবে? আমাদের কৌতূহল আরো বেড়ে যায় যখন মনে পড়ে যে বস্তুত কোনো উপেক্ষার পরিচয়ও নেই, কেননা সে-বিষয়ে অনেক আলোচনা ও দৃষ্টান্ত আছে মহাভারতে; — আছেন ভীষ্ম,

যাঁকে দেহত্যাগের সময় জীবন্মুক্ত ব'লে অনুভব করি আমরা ; আর বিদুর, আশ্রমবাসিকপর্বে যাঁর ক্ষণিকের-জন্য-দেখা সন্ন্যাসীরূপ আমরা ভুলতে পারি না ; বৈরাগ্যের অনেক গুণগান আছে শান্তিপর্বে (অ : ১৭৪-৭৮) — গীতায় প্রচারিত মোক্ষতত্ত্বের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। অথচ গ্রন্থারম্ভে উল্লিখিত হ'লো শুধু ধর্ম অর্থ কাম, গার্হস্থ্যকে বলা হ'লো শ্রেষ্ঠ আশ্রম। কেন[৮৫] ?

এই প্রশ্নের উত্তর যুধিষ্ঠিরের জীবনে মূর্ত হ'য়ে আছে : মনে হয় এই তিনটি শ্লোক তাঁকে লক্ষ ক'রেই লেখা হয়েছিলো — এখানে যেন ব'লে দেয়া হচ্ছে যে যুধিষ্ঠিরই মহাভারতের প্রতিভূ পুরুষ।

কেননা যুধিষ্ঠির কোনো মুমুক্ষু বা বৈরাগ্যসাধক মানুষ নন ; ধর্মপুত্র হ'য়েও কাম ও অর্থকে তিনি অবজ্ঞা করেন না ; তিনি গৃহস্থ — 'আদর্শ' নন, সর্বলক্ষণসম্পন্ন — কোনো বিষয়েই আদর্শ হওয়া তাঁর চরিত্রে নেই — শুধু প্রশ্ন ও প্রয়াস ও দায়িত্ব আছে তাঁর জন্য। 'গৃহস্থের পক্ষে যে-সব কর্ম কর্তব্য, আমি সাধ্যমতো সেগুলি অনুষ্ঠান ক'রে থাকি —' এই উক্তি আমরা তাঁরই মুখে শুনতে পেয়েছি (বন : ৩১) ; আর, জীবনের সব অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে, তাঁর চরিত্রের সব স্ববিরোধ সত্ত্বেও, তার প্রমাণও তিনি অনেকবার দিয়েছেন। গৃহস্থের প্রাথমিক লক্ষণ পরিবারপ্রীতি — সংকীর্ণ ও ঘনিষ্ঠ অর্থে পরিবার ; এবং যুধিষ্ঠিরকে দেখা যায় প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর বিধবা মাতা ও চার ভাই ও সহধর্মিণীর সঙ্গে ব্যক্তিগত স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ ; তাঁদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা তাঁকে নিস্তার দেয় না কখনো — বন, বিরাট ও উদ্যোগপর্বে মাঝে-মাঝে তা অত্যুগ্র হ'য়ে ওঠে, যেহেতু তিনি দ্যূতব্যসনে নিঃস্ব হয়েছেন। সংসারজীবনে যেটি স্থূলতম, হীনতম সমস্যা — যার তিক্ত স্বাদ আমাদের অনেকেরই ঠোঁটে লেগে আছে — সেই অর্থাভাবও কষ্ট দিয়েছে তাঁকে, যদিও রামের মতো তিনিও এক মহৎকুলজাত রাজপুত্র। তাঁর নিজেরই দোষে

এ-রকম ঘটেছিলো, সে-কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ; তাঁর গৃহস্থশোভন মনোভাব ও তৎসংক্রান্ত অভিজ্ঞতাই এখানে আলোচ্য। তাঁকে বলা যায় না কোনো অর্থেই ভোগলিপ্সু, কিন্তু সাংসারিক সচ্ছলতা তাঁর কাম্য ; আপৎকালে তিনি পঞ্চগ্রামও প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে হ'তে কখনোই তাঁকে ইচ্ছুক দেখি না। 'অঋণী ও অপ্রবাসী হ'য়ে স্বগৃহে যে শাকান্ন ভোজন করে, সে-ই সুখী —' এই কথাটাও গৃহস্থেরই, বৈরাগীর নয় ; 'অঋণী', 'অপ্রবাসী', 'স্বগৃহ' — এই তিনটি শব্দের সন্নিবেশে বোঝা যায় যে যুধিষ্ঠির তাঁর পায়ের তলায় মাটি চান, চান মাথার উপরে নিশ্চিত একটি আচ্ছাদন, চান তাঁর স্বদেশের বাতাসে নিশ্বাস নিতে, কোনো অবস্থাতেই মর্ত্য-জীবনের সরলতম সন্তুষ্টির স্বাদ হারাতে চান না। স্মর্তব্য, একবার ধর্মবকের কাছে, আর-একবার কৃষ্ণের কাছে (উদ্যোগ : ৭১) তিনি দরিদ্র ব্যক্তিকে 'মৃত' ব'লে আখ্যাত করেছিলেন — এবং এখানেও তাঁর গৃহধর্মী মন কথা বলছে, কেননা শুধু গার্হস্থ্যজীবনেই দারিদ্র্য মৃত্যুর তুল্য, সন্ন্যাসীর পক্ষে তা বৈকুণ্ঠগামী রাজপথ। এমনকি, পার্থিব সুখভোগ বিষয়েও যুধিষ্ঠির যে নিশ্চেতন নন, তার প্রমাণ আমরা পাই শান্তিপর্বে (অ : ৭), যখন মৃত ধার্তরাষ্ট্রদের জন্য তিনি এই ব'লে আক্ষেপ করেন যে তারা অসূয়ার দ্বারা আক্রান্ত ও চালিত হ'য়ে 'পৃথিবী উপভোগ' করার সময় পর্যন্ত পেলো না[৮৬]। লক্ষণীয়, তাঁর ভোগ্য বস্তুর তালিকা থেকে নারীসংসর্গ বাদ পড়েনি — 'ন তৈর্ভুক্তেয়মবনির্ন নার্যো গীতবাদিতম্' ; — স্বেচ্ছায় পত্নীবিরহিত ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণকে তিনি পছন্দ করতেন কিনা সন্দেহ।

গৃহাশ্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হ'লো বিবাহিত অবস্থা ; তাই যুধিষ্ঠিরের দাম্পত্য জীবনের দিকেও এখানে একবার দৃষ্টিপাত করা দরকার। বিষয়টি একটু জটিল, কেননা পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ সমস্ত আন্তর্জাতিক আর্যবিধিকে লঙ্ঘন করেছিলো[৮৭]। দ্রৌপদীর মতো

ধর্মচারিণীর পক্ষেও পঞ্চস্বামীকে সমভাবে দেখা সম্ভব হয়নি ; মনে-মনে অর্জুনের প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিলো — কেনই বা থাকবে না ? — আর সেই মনঃপ্রীতিকে হয়তো আরো পুষ্টি জুগিয়েছিলো অর্জুনের দীর্ঘায়িত ও পৌনঃপুনিক অনুপাস্থিতি। কিন্তু সারা মহাভারতে দুটি মাত্র মুহূর্ত আছে যখন অর্জুন-দ্রৌপদীকে নিভৃতে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়[৮৮] — এবং সে-দুটি আক্ষরিক অর্থেই মুহূর্তমাত্র। যাজ্ঞসেনীকে জয় করলেন অর্জুন, ভীম বহু পরিশ্রম করলেন তাঁর জন্য (কনকপদ্মসংগ্রহ, কীচকবধ, জয়দ্রথনিগ্রহ) ; কিন্তু 'আসলে' যেন যুধিষ্ঠিরই তাঁর স্বামী, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই নিকটতম তাঁর সম্বন্ধ — ঘটনার পর ঘটনা অনুধাবন করতে-করতে এমনি একটা ধারণা হয় আমাদের, যদিও অগ্নিসম্ভবা আগ্নেয়স্বভাব পাঞ্চালীর সঙ্গে মৃদু দ্যূতাসক্ত যুদ্ধবিমুখ যুধিষ্ঠিরের বৈসাদৃশ্য অতিশয় স্পষ্ট। যুধিষ্ঠিরকে আমরা চিরকাল জেনেছি নারী বিষয়ে ঔৎসুক্যরহিত, কিন্তু তাঁর জীবনে যে-একটিমাত্র মহিলার অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো, তাঁকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন। বক-যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে তিনি তিনবার উল্লেখ করলেন ভার্যার — তাঁর ভার্যার, তা বুঝে নিতে আমাদের দেরি হয় না। 'গৃহে মিত্র ভার্যা,' 'দৈবকৃত সখা ভার্যা,' আর উপরন্তু : 'ধর্ম অর্থ কাম — এই তিন পরস্পরবিরোধীর সংযোগ ঘটে শুধু ধর্মচারিণী ভার্যার মধ্যে' — এ-সব কথা যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে ঠিক শাস্ত্রবচনের মতো শোনাচ্ছে না, এদের পিছনে দ্রৌপদীর সঞ্চার আমরা অনুভব করি, কেননা ইতিপূর্বে আমরা অনেক শুনেছি দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে বিতর্ক ও ভাববিনিময়, এঁদের পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্কটি আমাদের মনে রেখাপাত করেছে। যুধিষ্ঠির সযত্নে লালন করেছিলেন এই সম্পর্কটিকে, এবং বহুভর্তৃকা দ্রৌপদী এর মূল্য বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন তাও আমরা অনেকবার দেখেছি। স্মর্তব্য, তাঁর পায়ের কাছে যে-স্বর্ণপদ্মটি উড়ে এসে পড়েছিলো, দ্রৌপদী সেটি

যুধিষ্ঠিরকেই উপহার দিয়েছিলেন, আজ্ঞাবহ ভীমসেনকে নয় (বন: ১৪৬)। তাঁর আছে 'ইন্দ্রের মতো পঞ্চস্বামী' এই বাঁধা বুলিটি দ্রৌপদীর মুখে অহরহ শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু দ্যূতসভায় অবমানিত হ'য়ে তিনি তীব্র স্বরে ব'লে উঠলেন (সভা: ৬৭): 'আমি পাণ্ডবদের স্বহধর্মিণী, আমি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ভার্যা!' — যেন বহুবচনের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে ধরানো গেলো না, স্বতন্ত্রভাবে ও বিশেষভাবে তাঁর নাম বলতে হ'লো, অথবা যেন পাঁচের মধ্যে একের নাম করতে হ'লে যুধিষ্ঠিরকেই তাঁর মনে পড়ে। মনে হ'তে পারে, ভাইয়েদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব'লেই এই প্রাধান্য পেয়েছেন যুধিষ্ঠির, অথবা তাঁর চারিত্রিক শ্রেষ্ঠতা সূচিত হচ্ছে এখানে; — কিন্তু এও স্মর্তব্য যে অগ্রজের ভূমিকায় তিনি অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাননি (এ-বিষয়েও তিনি রামের ঠিক উল্টো!), এবং তাঁর চারিত্রিক শ্রেষ্ঠতা তখন পর্যন্ত শুধু বর্ণিত হয়েছে, প্রমাণিত হয়নি। আমরা লক্ষ করি যে সভাপর্বের পরে কাহিনী যত এগিয়ে চলে, ততই সত্য হ'য়ে ওঠে দ্রৌপদীর সেই আর্ত মুহূর্তের ঘোষণা; — একান্তভাবে না হোক, উত্তরোত্তর আরো বেশি সংশ্লিষ্টভাবে, তিনি যুধিষ্ঠিরের ভার্যারূপে প্রতিভাত হ'তে থাকেন। দ্রৌপদীর অন্য দুই প্রধান স্বামীর উপর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আলো ফেলেছেন ব্যাসদেব — বলা বাহুল্য, নকুল-সহদেব এ-প্রসঙ্গে বিবেচ্য নন — দ্রৌপদীর বল্লভরূপে কখনো অর্জুনকে আর কখনো বা ভীমকে আমরা দেখতে পাই[৮৯]: কিন্তু তাঁর নিত্যসঙ্গীরূপে যুধিষ্ঠিরই ছিলেন একমাত্র — হয়তো ঘটনাচক্রে, যেহেতু অর্জুন ছিলেন অনবরত ভ্রাম্যমাণ আর ভীমসেন প্রধানত এক মল্লবীর হিশেবে উপস্থিত, বা হয়তো অন্তঃস্থিত কোনো নিগূঢ় আকর্ষণ ছিলো দু-জনের মধ্যে — কেননা বিপরীতেরও আকর্ষণ আছে, এবং তা প্রবল হবারও বাধা নেই: যে-কারণে কান্তিমান দুর্মদ যুবা আলকিবিয়াদেস-এর পক্ষে কুদর্শন বৃদ্ধ জ্ঞানী

সক্রেটিস ছিলেন প্রয়োজন, হয়তো সেই কারণেই দ্রৌপদীর যুধিষ্ঠিরকে না-হ'লে চলতো না। যাকে বলা যায় সত্যিকার দাম্পত্য সম্বন্ধ, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীকেই মনে পড়ে আমাদের — ঠিক মধুর রসে আশ্রিত নয় হয়তো, বলা যায় না রতিপরিমলে অনুলিপ্ত[১০], কিন্তু গভীর ও স্থির ও সশ্রদ্ধ ও প্রীতিপরায়ণ সেই সম্বন্ধ, এবং — যা আরো জরুরি — সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত — দ্রুপদ-নন্দিনীকে তাঁর স্রষ্টা যে কোনো 'ছায়েবানুগতা' পতিব্রতার ছাঁচে গঠন করেননি সে-কথা অবশ্য না-বললেও চলে। এক যৌথ জীবনের সমান অংশিদার - অনেক দুঃখ, অনেক যুদ্ধ, অনেক দুস্তর মতভেদের মধ্য দিয়েও দুই দায়িত্বচেতন পরস্পরনির্ভর সহযোগী: এইভাবে আমরা দেখতে পাই যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীকে, আর দাম্পত্যরূপ শাখাজটিল ও অনিষ্কণ্টক বৃক্ষের এটাই হয়তো শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম ফল। অথচ এই 'গৃহমিত্র'কে কতই না কষ্ট দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, ভার্যার মুখে কত না তীক্ষ্ণ তিরস্কার তাঁকে শুনতে হয়েছিলো।

'যেমন সব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদী সমুদ্রে বিরাম লাভ করে, তেমনি সব শ্রেণীর লোকেরা গৃহস্থের কাছে আশ্রয় পায়' (মনু : ৬ : ৯০)। শান্তিপর্বে ব্যাসের মুখেও শুনি গৃহস্থ সর্বভূতের প্রতিপালক ব'লেই গার্হস্থ্য চতুরাশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের জীবনের দিকে তাকালে, এবং আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করলেও, অন্য একটি গূঢ়তর কারণ প্রতিভাত হয়। যিনি সন্ন্যাসী, তিনি এক আঘাতে সব গ্রন্থি ছেদন করেছেন; যিনি কৈবল্যসাধক, তিনি সুখদুঃখের অতীত :— এঁদের কাছে মানুষিক ভাবনা-বেদনার কোনো অস্তিত্ব নেই। গুরুগৃহবাসী অকৃতদার বিদ্যার্থীর জীবন অতিশয় সরল ও নির্ভার (প্রাচীনেরা তাকেই বলতেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম), আবার কর্ম-ভারমুক্ত বিশ্রান্ত বানপ্রস্থেও সেই নিশ্চিন্ত ভাবটি ফিরে পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু গৃহাশ্রম আমাদের ঠেলে দেয় ভবসংসারের

একেবারে মধ্যখানে — এক ক্ষণভঙ্গুর ও নিত্যজাত-বুদ্‌বুদময় ধূমায়িত আবর্তের মধ্যে যেন — সমস্যা যেখানে অফুরান ও সংগ্রাম নিত্য-নৈমিত্তিক, এবং যেখানে ভয় অথবা হতাশা অথবা প্রলোভনের মূর্তি নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত আছে শত্রুর দল, আমাদের সহজাত সাধুতা ও সৃষ্টিশীলতাকে নষ্ট করার জন্য। ঐ রিপুরা সন্ন্যাসীকেও শিকার করে না তা নয় — কী-ভাবে করে তার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান তপস্বীদের জীবনে দেখেছি; — কিন্তু অরণ্য- বা হিমালয়- বা মরু-নিবাসী সমাজচ্যুত নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর পক্ষে সমস্যা অনেক সহজ, অন্য কারো জন্য দায়ী নন তিনি, তাঁকে জয় করতে হবে নিজেকে শুধু — পরিবর্তনশীল প্রবঞ্চক এই জগতের সঙ্গে প্রতিদিন নতুন ক'রে বোঝাপড়া করতে হবে না, সহ্য করতে হবে না প্রণয়াস্পদা পত্নীর দুঃখ বা যুবকপুত্রের মৃত্যুজনিত শোকতাপ, অংশ নিতে হবে না বাধ্য হ'য়ে পাপাচরণে। সংসারের মতো কঠিন ও ক্ষমাহীন ও 'মনোমলময়' পরীক্ষাস্থল আর নেই — আর যুধিষ্ঠির সেই মানুষ, যিনি অনবরত নানা দিক থেকে নানাভাবে পরীক্ষিত হচ্ছেন ও নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা করেছেন : মোহমুক্ত পিঙ্গলার মতো আশার উচ্ছেদ ক'রে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব নয় জনক-রাজার মতো বলা[৯১] : 'আমার সমুদয় রাজ্য দগ্ধ হ'লেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না' — যেহেতু তাঁর গৃহস্থোচিত কর্তব্য তাঁকে জাগিয়ে রাখে, সর্বদা বেদনা দেয়। সেই বেদনার তীব্রতম প্রকাশ তাঁর যুদ্ধকালীন ক্রিয়াকর্মে আমরা দেখতে পেয়েছি। সাধারণত-চিন্তাহীন ও লঘুসঞ্চারী অর্জুন যে-মিথ্যাটি মুখে আনতে রাজি হলেন না (দ্রোণ : ১৯১), তা যুধিষ্ঠিরকেই অস্পষ্ট স্বরে বলতে হ'লো — পরমপূজনীয় দ্রোণাচার্যের সংহারসাধনের জন্য : এই ঘটনাটিতে ব্যাসদেব যেন আমাদের মর্মে শেল বিঁধিয়ে বুঝিয়ে দিলেন গৃহাশ্রমের দায়িত্ব কী নিদারুণ। এ-রকম মুহূর্তে, গৃহাশ্রমের সামাজিক ও মানবিক

মূল্য উপলব্ধি ক'রেও, আমাদের মন গৃহের প্রতি, পরিবারের প্রতি বিমুখ হ'য়ে ওঠে: আমরা প্রশ্ন না-ক'রে পারি না — ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের পক্ষে এই জীবন কি যথেষ্ট? যেখানে নেই বিরাট ত্যাগে আহ্বান, কোনো বিশুদ্ধ আদর্শের কাছে আত্মোৎসর্গেরও সুযোগ নেই, সেখানে প্রতিভার বিকাশ ঘটবে কেমন ক'রে; কেমন ক'রে অসংখ্যের ক্ষুদ্রতার উপরে মহত্ত্বের আলোকস্তম্ভগুলি জ্ব'লে উঠবে? এই প্রশ্নের উত্তর যুধিষ্ঠির কী-ভাবে দিয়েছিলেন তা আমরা পরে দেখবো; কিন্তু তার আগে, এই আলোচনার সম্পূর্ণতার জন্য, অন্য দু-একটি প্রতিবাদী বা ঈষৎ-তুলনীয় দৃষ্টান্ত আমি উপস্থিত করতে চাই।

৮১। 'রামায়ণী কথা': দীনেশচন্দ্র সেন, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, সং বঙ্গাব্দ ১৩৭৬। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা ও 'রামায়ণ ও সমাজ' প্রবন্ধ দ্র। ভূমিকাটি ঈষৎ পরিবর্ধিত আকারে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্ভূত আছে।

৮২। নারী-নিন্দুক হিশেবে মনু সম্প্রতি কুখ্যাত হ'য়ে পড়েছেন, কিন্তু তাঁর একটি আজ্ঞা এই যে বিবাহিত পুরুষ সর্বদা স্বীয় ভার্যার প্রতি অনুরক্ত থাকবেন ('স্বদারনিরতঃ সদা,' মনু: ৩: ৪৫)। এ-প্রসঙ্গে তাঁর আরো কিছু বচন উদ্ধৃতিযোগ্য:

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥

(মনু: ৩: ৫৬-৫৮)

—'নারীগণ যেখানে সমাদৃত সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন; নারী যেখানে অনাদৃত সেখানে সব ক্রিয়া নিষ্ফল।

• 'নারীগণ (জাময়ঃ) যেখানে দুঃখী সেই কুল অচিরে বিনষ্ট হয়; নারী যেখানে প্রীতি, সেখানে সবদা শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

'যেখানে অনাদৃতা নারীর অভিসম্পাত পড়ে, সেই গৃহ নিহতের মতো সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়।'

মনিয়র-উইলিয়মস এ 'জামা,' 'জামি,' 'জামী' — এই তিনটি শব্দ পাওয়া যায়, এদের অর্থ কন্যা, পুত্রবধূ, যে-কোনো আত্মীয়া বা সাধ্বী রমণী। বাংলায় এই কথাগুলো পৌঁছয়নি, কিন্তু সংশ্লিষ্ট জামাতৃ শব্দটি আমরা পেয়েছি। 'নারী' অর্থে 'জামি' শব্দ ব্যবহার ক'রে মনু হয়তো গার্হস্থ্যের উপরে আরো একটু জোর দিতে চেয়েছিলেন।

৮৩। বাল্মীকি আমাদের জানিয়েছেন যে লক্ষ্মণ রামের 'বহিঃপ্রাণ'তুল্য ছিলেন (বাল : ১৮ : ৩০), আর রাম একবার নিজের মুখেই লক্ষ্মণকে তাঁর 'দ্বিতীয় অন্তরাত্মা' ব'লে অভিহিত করলেন (অযোধ্যা : ৪ : ৪৩)। এই কথাটাকেই ঈষৎ বদলে নিয়ে মেঘদূতের যক্ষ তার পত্নীকে বলেছিলেন 'দ্বিতীয় প্রাণ' — 'জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্' (উত্তরমেঘ : ৮৬)।

৮৪। এই শ্লোকটি, একটিমাত্র শব্দের ভেদ নিয়ে, আদি : ২ : ৪০২-এ পুনরুক্ত হয়েছে।

৮৫। এই প্রশ্ন প্রাচীনদের মনেও উঠেছিলো; মনে হয় মোক্ষরহিত মহাভারতের ধারণাটিকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণের প্রারম্ভে যে-ভারতপ্রশস্তিটি পাওয়া যায় সেটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ব্যাস-শিষ্য জৈমিনি এসেছেন মার্কণ্ডেয়র কাছে ভারত-কথার ব্যাখ্যা শুনতে; গ্রন্থটিকে সর্বশাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করার পরে জৈমিনি, যেন গুরুদেবের আদি উক্তি সংশোধন করার জন্য বললেন :

অত্রার্থশ্চৈব ধর্মশ্চ কামো মোক্ষশ্চ বর্ণ্যতে।
পরস্পরানুবন্ধাশ্চ সানুবন্ধাশ্চ তে পৃথক্॥
ধর্মশাস্ত্রমিদং শ্রেষ্ঠমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
কামশাস্ত্রমিদঞ্চাগ্র্যং মোক্ষশাস্ত্রং তথোত্তমম্॥
চতুরাশ্রমধর্মাণামাচারস্থিতিসাধনম্।
প্রোক্তমেতন্মহাভাগ বেদব্যাসেন ধীমতা॥

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ : ১ : ৬-৮)

—'এখানে (মহাভারতে) ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ বর্ণিত আছে — পৃথক-ভাবেও, পরস্পরে সম্পৃক্তভাবেও।

'[এই গ্রন্থ] ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান, এবং অর্থ কাম ও মোক্ষশাস্ত্রের মধ্যে উত্তম।

'হে মহাভাগ! চতুরাশ্রমের ধর্ম, আচার ও সাধনপদ্ধতি — ধীমান বেদব্যাস সেই সবই কীর্তন করেছেন।'

৮৬। কালীপ্রসন্নর অনুবাদে যুধিষ্ঠিরের উক্তিটি তুলে দিচ্ছি: 'ঐ নির্বোধগণ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা) পূর্বে আমাদের সমৃদ্ধি-দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন কখনই সুস্থ অন্তঃকরণে এই পৃথিবী উপভোগ, নারীগণের সহিত বিহার, গীতবাদ্য-শ্রবণ, ধনদান, অর্থাগমের চেষ্টা এবং আমাত্য, সুহৃৎ ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই।' যুধিষ্ঠিরের মুখে আগেও একবার শোনা গিয়েছিলো যে 'ভাগ্যহীন ব্যক্তিকে গীতশ্রবণ বা মাল্যগন্ধাদির উপভোগ থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়' (উদ্যোগ : ২৫)।

৮৭। আমি ভুলে যাচ্ছি না যে পশ্চিমদেশীয় অনেক পণ্ডিতের মতে পাণ্ডবেরা ছিলেন অনার্য, আর পঞ্চভ্রাতার সহপত্নীকতাই তাঁদের সপক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি। তাছাড়া আছে 'পাণ্ডু' শব্দের আক্ষরিক অর্থ, কিরাতবাসিত হিমালয়প্রান্তে যুধিষ্ঠিরাদির রহস্যময় জন্মবিবরণ, আছে দ্রুপদের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরের অস্পষ্ট উক্তি যে তাঁরা 'পূর্বপুরুষের প্রথামতো' আচরণ ক'রে থাকেন (আদি : ১৯৫); এমনকি ভীমের তুবরত্ব বা শ্মশ্রুহীনতাও এই মতের সমর্থনে ব্যবহৃত হ'তে পারে। কিন্তু এত সব সারবান ও উন-সারবান যুক্তি সত্ত্বেও আমি এই প্রস্তাবটিকে আপাতত স্থান দিতে পারছি না, কেননা কল্পনা যা সত্য ব'লে গ্রহণ করে সেটাই আমার বর্তমান আলোচনার পক্ষে সত্য। মহাভারতে ও অন্য সব পুরাণ-কাব্যে পাণ্ডবেরা কুরুবংশেরই একটি প্রখ্যাত শাখারূপে বর্ণিত হয়েছেন, তাঁরা পেয়েছেন আর্য-ভারতে ক্ষত্রিয়োচিত সমুদয় সংস্কার, এবং তাঁদের অন্য সব আচার আচরণও তদনুরূপ, আর আমরাও বহুকাল ধ'রে তাঁদের সেইভাবে জ্ঞাত হয়েচি ও ধারণা করেছি; আজ তাঁরা জাতি হিশেবে মঙ্গোলীয় ব'লে প্রমাণিত হ'লেও বিকৃত হবে না সেই চিরায়মান মানসচিত্র, তাঁদের যৌথ-বিহারের বিস্ময়করতা হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে, আর্যসমাজেও এক স্ত্রীর

বহুস্বামিকত্বের প্রচলন ছিলো এমন অনুমানও সংগত নয়, কেননা আদি : ১৯৬-এ উল্লিখিত সপ্তঋষিপত্নী জটিলা বা ভ্রাতৃদশজায়া বার্ক্ষি আমাদের পক্ষে ক্ষণশ্রুত ও অচিরবিস্মৃত (ও যুধিষ্ঠিরের পক্ষে দূরশ্রুত) নামমাত্র; আবহমান ইন্দো-য়োরোপীয় সাহিত্যে বৈধভাবে বহুভর্তৃকা নারীর স্মরণীয় দৃষ্টান্ত দ্রৌপদী ছাড়া একটিও নেই। এবং আমাদের পুঁথির মধ্যেও ঘটনাটি সহজে ঘটতে পারেনি; 'সকলে সমবেত হ'য়ে ভোগ করো' বলার পরে কুন্তী দ্রৌপদীকে দেখে অধর্মের ভয়ে চিন্তাকুল হয়েছিলেন, যুধিষ্ঠিরও প্রথমে বলেছিলেন অর্জুন তাঁর জিত কন্যাকে একাই বিহার করুন (আদি : ১৯১), দ্রৌপদীর পিত্রালয়েও প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল। দ্রুপদের ভাষা খুব স্পষ্ট: 'এক পুরুষের বহুপত্নীগ্রহণ (একস্য বহ্ব্যো মহিষ্যঃ) শাস্ত্রসিদ্ধ হ'লেও "একস্যা বহবা পতয়ঃ" আমরা কখনো শুনিনি'; তিনি প্রস্তাবটিকে বলেছিলেন 'বেদবিরোধী ও অধর্ম্য'; ব্যাসের মুখে জন্মান্তরকথা শোনার পরেও সম্মতি দিয়েছিলেন নিরানন্দ মনে, নেহাৎই দৈবকে মেনে নিয়ে (আদি : ১৯৬-৯৮)। সন্দেহ নেই, কোনো অস্পষ্ট আদিম জটিলা বা বার্ক্ষির পথ পৌরাণিক ভারতে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিলো, নয়তো দ্রৌপদীর বিবাহ নিয়ে এত তর্ক উঠতো না পাণ্ডবগৃহে ও পাঞ্চালভবনে, তার সমর্থনকল্পে কবিকেও উদ্ভাবন করতে হ'তো না মাতৃবাক্য-রক্ষার ছেলেমানুষি অছিলাটুকু, গঙ্গাবক্ষে অবগাহনকারিণী রোদনরূপসীর মনোমুগ্ধকর উপাখ্যান বলারও প্রয়োজন হ'তো না। স্মর্তব্য, আদি : ১০৪ অনুসারে নারীর যাবজ্জীবন একবিবাহের যিনি প্রবর্তন করেন সেই দীর্ঘতমাও প্রাক-পুরাণিক ঋষি; মহাভারতের মূল ঘটনাবলির সময়ে তাঁরই বিধান যে অলঙ্ঘ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো তার প্রমাণ পাই দ্যূতসভায় কর্ণের উক্তিতে — 'একো ভর্তা স্ত্রিয়া দেবৈর্বিহিতঃ' (সভা : ৬৬ দ্র)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিকত্ব বিষয়ে মার্কণ্ডেয়পুরাণে অন্য একটি উপাখ্যান পাওয়া যায় (অ : ৫)। তার সারাংশ এই যে ইন্দ্রপত্নী শচী যাজ্ঞসেনা-রূপে উৎপন্ন হয়েছিলেন, এবং ইন্দ্রেরই বীর্যাংশ নিয়ে দেবগণ পঞ্চপাণ্ডবকে প্রজনিত করেন। অতএব 'শক্রস্যৈকস্য সা পত্নী কৃষ্ণা নান্যস্য কস্যচিৎ — দ্রৌপদী একমাত্র ইন্দ্রেরই পত্নী, অন্য কারো নন' (৫ : ২৬)। কিন্তু এত সব সাফাই সত্ত্বেও, পঞ্চপুরুষের বা অন্তত পুরুষত্রয়ের পত্নীরূপেই তিনি মহাভারতীয় মঞ্চে অবতীর্ণ আছেন। দ্বিচারিণী হেলেনের অবস্থাও দ্রৌপদীর

সঙ্গে তুলনীয় নয়, কেননা হেলেন একই কালে ও একই স্থানে একাধিক পুরুষের পত্নী ছিলেন না, এবং পারিসের সঙ্গে তাঁর তথাকথিত বিবাহের বৈধতা নিয়েও তর্ক তোলা যায় — যদিও গ্রীক পুরাণ-সম্পৃক্ত আলোচনায় সেই তর্ক কখনো উঠেছিলো ব'লে শুনিনি।

৮৮। আদি : ২২১ ও বিরাট : ২৪। গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদ ও তৎলগ্ন টী : ৪৮ দ্র।

৮৯। স্মর্তব্য, সভাপর্বে দুঃশাসন যখন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভাস্থলে টেনে নিয়ে এলো, তখন সবচেয়ে উত্তেজিত হয়েছিলেন ভীমসেন, অর্জুন তেমন বিচলিত হননি। ভীম-দ্রৌপদীর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ মুহূর্তটি পাওয়া যায় কীচকবধের প্রাক্কালে, কাব সেখানে বর্ণলেপনে অকৃপণ। —'শুচিস্মিতা দ্রৌপদী রন্ধনাগারে নরবৃষ ভীমসেনের কাছে উপস্থিত হলেন, যেন কোনো সর্বশ্বেতা (বকপক্ষিণী) বা তিন-বছর-বয়সী বন্য গাভীর মতো (সর্বশ্বেতেব মাহেয়ী বনে জাতা ত্রিয়াহণী)। গোমতীর তীরে ফুল্ল বিশাল শালবৃক্ষকে লতা যেমন বেষ্টন করে তেমনি তিনি মধ্যম পাণ্ডবকে আলিঙ্গন করলেন। দুর্গম বনে সিংহী যেমন সুপ্ত সিংহকে জাগ্রত করে, তেমনি অনিন্দিতা (দ্রৌপদী) তাঁকে দুই বাহুর আলিঙ্গনে প্রবুদ্ধ করলেন। হস্তিনীতুল্য দ্রৌপদী মহাগজ ভীমসেনকে আলিঙ্গন ক'রে গান্ধারস্বনিত বীণার মতো মধুর স্বরে বলতে লাগলেন, 'ভীমসেন, ওঠো, ওঠো —" ' ইত্যাদি (আর্যশাস্ত্র সং, বিরাট : ১৭ : ১০-১৫)। আবার দেখি, অর্জুন যখন অস্ত্রসংগ্রহের জন্য দেশান্তরী হ'তে চলেছেন (বন : ৩৭) — ইতিপূর্বে বারো-বছরব্যাপী বনবাসের পর আরো একবার — তখন দ্রৌপদীর বিদায়ভাষণে তাঁর মনের গোপন দুর্বলতাটি সকলের সামনেই ব্যক্ত হ'য়ে পড়লো। 'তোমার জন্মের সময় কুন্তী যে-সব ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, আর তুমি নিজে যা-কিছু অভিলাষ করো — হে ধনঞ্জয়, সেই সবই পূর্ণ হোক। তোমার ভ্রাতারা তোমার ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে আলোচনা ক'রেই সান্ত্বনা পাবেন. কিন্তু, পার্থ, তুমি দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকলে আমাদের কোনো সুখ থাকবে না — না ধনে, না ভোগে, না জীবনে।' স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে 'আমাদের' অর্থ 'আমার', কেননা একটু আগেই বলা হয়েছে যে ভ্রাতারা অর্জুনের বিষয়ে কথাবার্তা ব'লেই তুষ্টিলাভ করবেন। — এ-ধরনের

• মন্মথস্পৃষ্ট বা কারুণ্যসিক্ত মুহূর্ত যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর একটিও নেই, অথচ এই দু-জনকেই সর্বতোভাবে স্বামী-স্ত্রীরূপে আমরা অনুভব করি।

১০। ব্যাসদেব আমাদের জানিয়েছেন যে দ্রুপদকন্যাকে চোখে দেখামাত্র পঞ্চপাণ্ডবই যুগপৎ 'মনোভবের দ্বারা উন্মথিত' হয়েছিলেন (আদি: ১৯১), কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে আর কখনো দেখানো হয়নি। যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্কের উল্লেখ আমি মহাভারতে একবার-মাত্র পেয়েছি — তাও প্রত্যক্ষভাবে নয়। কর্ণকে অনিহত রেখে অর্জুন রণাঙ্গন ত্যাগ করেছিলেন ব'লে যুধিষ্ঠির যখন ধিক্কার দিলেন ভ্রাতাকে (কর্ণ: ৬৯, ৭১), অর্জুন রোষান্বিত হ'য়ে উত্তর দিলেন: 'ভরতনন্দন, তুমি রণস্থল থেকে এক ক্রোশ দূরে ব'সে আছো,…আর আমি তোমার মঙ্গলের জন্য জীবন পর্যন্ত পণ করেছি! … তোমার জন্য কত মহাযোদ্ধাকে আমি সংহার করলাম, আর তুমি শঙ্কাহীন মনে দ্রৌপদীর শয্যায় স্থিত হ'য়ে আমাকে অপমান করছো। তুমিই করেছিলে অক্ষক্রীড়ারূপ পাপাচরণ, আর এখন চাচ্ছো আমাদের সাহায্যে নিস্তার পেতে? তোমার কাছে আমরা অল্প সুখও পেয়েছি এমন আমাদের মনে পড়ে না, তোমার রাজ্যলাভ আমার ঈপ্সিত নয়।' — এখানে অর্জুনের অন্যান্য অভিযোগ সত্য, যুধিষ্ঠিরের সব দোষ ও দুর্বলতা অনেক আগেই বিজ্ঞাপিত হ'য়ে গেছে; কিন্তু দ্রৌপদীর শয্যার প্রতি উল্লেখটিকে অর্জুনের ঈর্ষার একটি স্ফুলিঙ্গ ব'লে মনে হয় (মূলে আছে 'তল্পসংস্থঃ'; 'তল্প' শব্দটি বিশেষভাবে দাম্পত্যশয্যার অর্থেই ব্যবহৃত হ'তো — অর্জুনের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট।)

তত্রাচ, এও মনে রাখা চাই যে দ্রৌপদীর নারীত্বকে যুধিষ্ঠির অবহেলা করেননি। পাশাখেলায় ভীষণতম পণ রাখার পূর্বমুহূর্তে যে-সাতটি শ্লোকে তিনি দ্রৌপদীর রূপগুণের বর্ণনা করেন (সভা: ৬৫: ৩৩-৩৯), তাতে বোঝা যায় যুধিষ্ঠির একজন সৌন্দর্যরসিক বিদগ্ধ পুরুষ হিশেবেও তাঁর সহধর্মিণীকে জেনেছিলেন ও ভালোবেসেছিলেন।

১১। পরে শান্তিপর্বের সপ্তদশ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির জনক-রাজার এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেন, কিন্তু তখন যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে, তাঁর মনের গতি অন্য দিকে। উপাখ্যান দুটির জন্য শান্তি: ১৭৪ ও ১৭৮ দ্র।

১৭ : পশ্চিমসমুদ্র ও হিমালয়

নেপোলিয়নের রুশ অভিযান ব্যর্থ হ'লো। তাঁর সৈন্যেরা ফিরে যাচ্ছে স্বদেশে — যূথবদ্ধ বাহিনীর আকারে নয়, ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত হ'য়ে, ছিন্নভিন্নভাবে, রাশিয়ার বিশাল প্রান্তর-পথে নেতৃহীন। যাচ্ছে পায়ে হেঁটে, কেননা তাদের ঘোড়াগুলোই এখন খিদে মেটাচ্ছে তাদের। এমনি একটি দলের সঙ্গে চলেছে কয়েকজন রুশীয় বন্দী — অসামরিক নাগরিক তারা, মস্কো থেকে পালাবার পথে ধরা প'ড়ে গেছে — তাদের মধ্যে একজনের নাম পিয়ের বেজুখহভ, জনাকীর্ণ 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের প্রধানতম পুরুষ-চরিত্র বলতে তাকেই আমাদের মনে পড়ে[১২]। আগে আমরা তাকে দেখেছি এক ধনী, কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল ও অবিন্যস্ত স্বভাবের যুবক, সেন্ট পিটার্সবার্গ ও মস্কোর অভিজাত সমাজে ঘূর্ণমান ; — আর এখন দেখছি তার জুতো ছিঁড়ে গেছে, পা দুটো ক্ষত-বিক্ষত, মাথার চুল উকুনে ভর্তি, বদল করার মতো দ্বিতীয় বস্ত্র নেই — এখন দেখছি সে আর চিন্তা করছে না, শুধু অনুভব করছে। সারা জীবন বিলাসিতায় অভ্যস্ত হ'য়েও এই বন্দী দশায় সে কষ্টে নেই, বরং এটা তার ভালোই লাগছে। ভালো লগাছে অশ্বমাংসের অজ্ঞাতপূর্ব আস্বাদ, সারাদিন পায়দল চলার পর রাত্তিরে অন্যদের সঙ্গে গোল হয়ে হ'য়ে ব'সে আগুন পোহানো, নিবে-যাওয়া আগুনের সামনে শীতে কুঁকড়ে আকাশের তলায় আধো-তন্দ্রা। হৈমন্তিক ঠাণ্ডা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সে মনে-মনে বলে : 'নামো, বৃষ্টি ! যত পারো নামো !' ; লবণের অভাবে বারুদে রাঁধা মাংসের ঝাঁঝালো ঘ্রাণ তার উপভোগ্য ব'লে মনে হয় ; সে আবিষ্কার করেছে উকুনের কামড় শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে। এমন নয় যে অসাধারণ দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী ব'লেই সে ক্লান্তিহীন, এবং তার এই ভাবটি কোনো স্টোয়িকধর্মী সহিষ্ণুতা

থেকেও উৎপন্ন হয়নি; এক দুর্দান্ত জীবনলিপ্সা তাকে অধিকার ক'রে নিয়েছে। তাদের সহযাত্রী এক শবভুক কুকুরের স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য ক'রে সে আনন্দ পায়; কিন্তু যে রুগ্ন, বৃদ্ধ, সাধুস্বভাব বন্দীটি সন্ধ্যের পরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই গল্প বার-বার বলে[৭৩], এবং যে স্পষ্টত আর বেশিদিন বাঁচবে না, তার দিক থেকে সচেতনভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় বেজুখহুব — সম্পূর্ণ করুণাহীন ও অখ্রীষ্টানভাবে। অথচ আর্তের প্রতি তার এই বিমুখতার নিন্দে করতেও বাধে আমাদের, কেননা এটা কোনো মানসিক জড়ত্বের লক্ষণ নয়, বরং সদ্য-জেগে-ওঠা চৈতন্যেরই ফলাফল। সে হঠাৎ উপলব্ধি করেছে যে পৃথিবীতে কোনো ভয় নেই, দুঃখ নেই, বন্ধন নেই — কেননা ঈশ্বর আছেন, এবং এই জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি। বুদ্ধি দিয়ে নয়, তার সমগ্র সত্তা দিয়ে সে বুঝতে পেরেছে যে জীবনই সব, জীবনই ঈশ্বর, সব দুঃখ ও মৃত্যু ও অবিচার সত্ত্বেও জীবনকে যে ভালোবাসতে পারে, সে-ই ভগবানের ভক্ত। দার্শনিক বিচারে গ্রাহ্য হোক বা না হোক, বেজুখহুবের পক্ষে, তখনকার মতো, এই অনুভূতি একটি ধ্রুবসত্য হ'য়ে উঠলো; কসাক সৈন্যদের হাতে মুক্তি পাবার পরেও এর প্রভাব সে কাটাতে পারলো না; আর তার এই আলোকপ্রাপ্তির পরে মাত্র যখন কয়েকটা মাস কেটেছে, তখনই নাটাশা রস্টহুব-এর সঙ্গে তার বিবাহ হ'লো।

'যুদ্ধ ও শান্তি'র এমন কোনো পাঠক আমি কল্পনা করতে পারি না, যার মন এই বিবাহের সংবাদে যুগপৎ হর্ষ বিস্ময় বেদনায় আন্দোলিত না হয়েছে। কেননা আমরা অনেক আগে থেকেই অনুভব করেছি যে নাটাশা ও পিয়েরই পরস্পরের যোগ্য — যাকে বলে রাজযোটক, তাদের বিবাহ হ'তো তা-ই — কিন্তু সেই শুভ ঘটনাটিকে সম্ভবপরতার সীমা থেকে আমরা সরিয়ে দিয়েছিলাম, কেননা নাটাশার সঙ্গে দেখা হবার আগেই পিয়েরের এক খেদজনক

বিবাহ ক'রে ফেলেছে, তাছাড়া অন্য দিক থেকেও অনেক দুস্তর বাধা ছিলো। সেই বাধাগুলিকে, সান্তর এবং অন্তরভাবে, এক ঘটনাজটিল বিশাল কাহিনীর বহু শত পৃষ্ঠার মধ্যে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে, একে-একে দূর ক'রে দিলেন টলস্টয়; নেপোলিয়নের রাশিয়া-আক্রমণ সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করলো। যুদ্ধে মৃত্যু হ'লো অতি সজ্জন, অতি গুণবান প্রিন্স আনদ্রির, যার সঙ্গে নাটাশা ছিলো কোনো-এক কালে বাগ্‌দত্তা; আস্ত একটি পা কাটা গেলো আনাতোল নামে অন্তঃসারশূন্য অপদার্থ ছেলেটার — সেই রমণীমোহন মনোহরদর্শন আনাতোল, যার সঙ্গে, প্রিন্স আনদ্রিকে পরিত্যাগ ক'রে, এক উন্মাদ মুহূর্তে নাটাশা একবার পালিয়ে যাবার সংকল্প করেছিলো; আর অবশেষে বেজুখভ-এর সুখহীন দাম্পত্যবন্ধনকেও ছিন্ন ক'রে দিলো মৃত্যু। অনেক বলি, অনেক ভ্রান্তি, অনেক ব্যর্থতা, বিত্তশালী রস্টভ পরিবারের অবক্ষয়, রাশিয়ার বুকের উপর যুদ্ধজনিত হাজার ক্ষতচিহ্ন: এই সব অতিক্রম ক'রে তবে আমাদের বহুবাঞ্ছিত পরিণয়টি ঘটতে পারলো। এ থেকে আমরা কতই না আশা করেছিলাম — আরো কত উন্মীলন ও সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য; কিন্তু বিয়ের পরে ঘর বাঁধার সঙ্গে-সঙ্গে এদের দু-জনের এমন একটি পরিবর্তন ঘটলো যাকে আমরা অধঃপতন বলতে বাধ্য হচ্ছি।

'আনা কারেনিনা'য় লেভিনেরও আত্মার জাগরণ হয়েছিলো: সেও বুঝেছিলো জীবন এক 'চিরন্তন অলৌকিক ঘটনা', যে সত্য ও সাধুতাই ঈশ্বর, ও ঈশ্বর আমাদের অন্তঃস্থিত এক সহজ অনুভূতি — এবং সেও ছিলো বিবাহিত জীবনে অতি সুখী। কিন্তু গ্রন্থের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে টলস্টয় অন্তত অনিশ্চয়তার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন লেভিনকে: একদিকে পত্নীর প্রতি প্রেম, শিশুপুত্রের প্রতি সদ্য-জাগরিত বাৎসল্য — আর অন্য দিকে তার ফিরে-ফিরে-আসা ঈশ্বর-চিন্তা, তার অনুচ্চারিত গভীর সব স্বগতোক্তি, যার অংশ সে তার

প্রেয়সী কিটিকে দিতে গিয়েও দিচ্ছে না (পাছে কিটি ও-সব না বোঝে) — এই দোটানার উপরেই যবনিকা নেমে এলো, আমরা লেভিনের ভবিষ্যৎ বিষয়ে ইচ্ছেমতো জল্পনাকল্পনা করতে পারি। কিন্তু বেজুখহবকে দেখি গার্হস্থ্য সুখে একেবারে নিমজ্জিত :— বিয়ের পরে সাত বছরের মধ্যে চারিটি সন্তানের পিতা হ'লো সে ; পল্লীনিবাস ছেড়ে মস্কোতে বড়ো-একটা যায় না, কোনো প্রয়োজনে কখনো যেতে হ'লেও কাজটুকু সেরে তক্ষুনি বাড়ি ফিরে আসে ; তার পূর্বজীবনের বন্ধুদের সঙ্গে সংযোগ এখন ক্ষীণ, এমনকি নাটাশার ঈর্ষার ভয়ে কোনো মহিলার সঙ্গে শিষ্টাচারসম্মত বাক্যালাপ থেকেও সে বিরত হয়। পুরোনো অভ্যেসগুলো সে একেবারে ছেড়ে দিয়েছে তা নয় — মাঝে-মাঝে প্রবৃত্ত হয় অধ্যয়নে বা রচনাকর্মে : কিন্তু সে-রকম সময়ে, নাটাশার হুকুমে, সারা বাড়ির লোক যে পা টিপে-টিপে হাঁটে, শিশুরাও গলা চড়াতে সাহস পায় না — তাতেই বোঝা যায় বেজুখহব-এর মননশীলতা এখন অবসন্ন ; অথচ — আমরা যতদূর দেখতে পাচ্ছি — তার সম্প্রতি-লব্ধ মিস্টিক অনুভূতিও সে হারিয়ে ফেলেছে। সেই পিয়ের, যে যুদ্ধ-বন্দী হ'য়ে নগ্ন পায়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে পেরিয়েছিলো ; যার পথের দু-পাশে ছড়ানো ছিলো অশ্ব ও অশ্বারোহীর শবদেহ ; যে দেখেছিলো তার জ্বরগ্রস্ত বৃদ্ধ সঙ্গীকে হামাগুড়ি দিয়ে কবরের দিকে এগিয়ে যেতে ; দেখেছিলো সেই পিস্তলের ধোঁয়া, যার দ্বারা ক্ষণকাল আগে নিহত হয়েছে তারই সহযাত্রী কোনো রুশ বন্দী ; আর দেখেছিলো হত্যাকারীর চোখে বেদনার ছায়া যা চেষ্টা ক'রেও সে গোপন রাখতে পারছে না :— এবং এই সব আর্তির মধ্যেই যার চিদাকাশে প্রতিভাত হয়েছিলেন ঈশ্বর ; এক বন্ধুহীন অচেনা শহরের হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে যে জীবনানন্দে আপ্লুত হ'য়ে গিয়েছিলো, অনুভব করেছিলো নিজের মধ্যে এক অপার ও অনাক্রমণীয় বন্ধনহীনতা ; — সেই পিয়ের এখন

তার পত্নীর পেটিকোট-রজ্জুতে বাঁধা প'ড়ে গেছে, সন্তানদের নিয়ে সোহাগ ও নাটাশার সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্তার চেয়ে মহত্তর কোনো সুখের উৎস তার নেই। আর নাটাশা — সেও এখন অনুজ্জ্বল ও হৃতশ্রী। আমরা তাকে প্রথম দেখেছিলাম এক নবযৌবনা কন্যা — ক্ষীণতনু ও আবেগবতী ও প্রাণোচ্ছল : তার ঠোঁটে গান, তার চোখে স্বপ্ন, তার পায়ের পাতা নাচের ছন্দে চঞ্চল, দেখেছিলাম যুবকের পর যুবককে তার প্রেমে পড়তে (এবং আমরা নিজেরাও পড়িনি তা নয়); এবং তাকে অন্য রূপেও দেখেছিলাম — যখন সে তার প্রস্ফুটিত নারীত্ব নিয়ে যুদ্ধে-আহত প্রিন্স আন্‌দ্রির শিয়রে অশ্রুমতী সেবাপরায়ণ; আর যখন তার পিতার ধনক্ষয় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে তার গণ্ডশোণিমা পাংশু হ'য়ে গিয়েছে। এই সবই সঞ্চিত আছে আমাদের স্মরণে, থাকবে চিরকাল — কিন্তু আমাদের সেই পূর্বপরিচিতার কোনো চিহ্ন এখন অবশিষ্ট নেই ; সে পরিণত হয়েছে শিথিলবসনা স্থুলাঙ্গী এক 'গিন্নিবান্নি'তে, টলস্টয়ের ভাষায় 'স্বাস্থ্যবতী পরিপুষ্ট সুপ্রসবিনী একটি কুক্কুটীর মতো' দেখায় তাকে আজকাল ; তার মুখে কোনো আত্মিক বিভা আর ধরা পড়ে না। স্বামীকে সে চোখে হারায়, সন্তানের জন্য সে জীবন দিতে পারে ; কিন্তু নিকটতম স্বজন ছাড়া অন্য সকলেই তার কাছে অস্তিত্বহীন। সে এড়িয়ে চলে সামাজিক সংসর্গ, এবং আত্মীয়দের সঙ্গে কথাবার্তায় তার শিশুপুত্রের মলের বর্ণ গৌরবের স্থান অধিকার করে। যেন স্মৃতি নেই, অনুচিন্তন নেই, দূরকল্পনাও নেই, নেই কোনো সামনে-পিছনে তাকানো — এমনি আমাদের মনে হয় এই দম্পতিকে : বেজুখহ্ব-এর ঈশ্বরচেতনা এক ঝলক বিদ্যুতের মতো জ্ব'লে উঠেই মিলিয়ে গেলো ; নাটাশা তার পূর্বজীবনের প্রেম ও ব্যর্থতা ও সুখ-দুঃখের আন্দোলন থেকে কিছুই শিখলো না ; একটি-দুটি বসন্তেই ঝ'রে গেলো তার সব লাবণ্য ; কালিদাসের শকুন্তলার

মতো বেদনাবিধুর হেমন্তরূপসী সে হ'তে পারলো না। গৃহরচনা করলো পিয়ের-নাটাশা, কিন্তু শুধু নিজেদের জন্য — রবীন্দ্রনাথের অর্থে গৃহাশ্রম সেটিকে বলা যায় না, সমাজের জন্য কোনো আশ্রয় নেই সেখানে, দিগন্তের কোনো আভাস নেই, বিশ্বজীবনের বিপুল অর্কেস্ট্রার ক্ষীণতম মূর্ছনাও সেখানে পৌঁছয় না। জগতের মুখের উপর সবগুলো দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে সুখে আছে এরা — অতি সাধারণ, অতি সংকীর্ণ এবং কিছুটা মনোহীনভাবে সুখী। নারীর রূপযৌবনের প্রাকৃত উদ্দেশ্যটি নিষ্করুণ আলোয় প্রদর্শিত হয়েছে এখানে, প্রজনন ও সন্তানপালনের সীমাবদ্ধ দাম্পত্যজীবন হ'যে উঠেছে মনুষ্যত্বের পক্ষে খর্বতাসাধক। মনে হয় টলস্টয় এখানে ব্যঙ্গ করছেন গার্হস্থ্যকে, আমাদের সামনে খুলে দিচ্ছেন গার্হস্থ্যের সেই তামসিক দিক, যা মহাভারতের কবির কল্পনায় ছিলো না, কিন্তু আধুনিক কালে আমরা যে-বিষয়ে নিত্যসচেতন :— তাঁর চোখ দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম গার্হস্থ্যের গণ্ডির মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব কেমন কুঁকড়ে যায় ও ঝিমিয়ে পড়ে — যদি না অন্য কোনো টানে সে জাগিয়ে রাখতে পারে নিজেকে। অথচ, পুরো উপন্যাসটির কথা ভাবলে, টলস্টয়ের উদ্দেশ্য বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হ'তেও পারি না। হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে য়োরোপমন্থন ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ লিখে, তরুণ-তরুণী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রাজা যোদ্ধা ধনী দরিদ্র এবং শিশু ও পশুসংবলিত এক বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনা ক'রে, অনেকগুলো স্ত্রী-পুরুষের জীবনকে জড়িয়ে-জড়িয়ে গিঁট বেঁধে ও গিঁট ছাড়িয়ে — অবশেষে টলস্টয় আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন এক গৃহবন্দী পরিতৃপ্ত পরিবারের সামনে : কেন? তিনি কি আমাদের বলতে চাচ্ছেন : 'ছাখো — এই স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, অতি সাধারণ, অতি দৈনন্দিন এরা, কখনো বিখ্যাত হবে না বা অন্যের জীবনকে প্রভাবিত করবে না — কিন্তু এরাই আসল, সব যুদ্ধ ও বিপ্লব ও

ঐতিহাসিক আলোড়ন পেরিয়ে এরাই টিকে থাকে, নেপোলিয়ন ইত্যাদির "সঙের নাচন" থেমে যাবার পর এদেরই মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য ফিরে পাবে মানুষ, এরাই সভ্যতার 'আদিসত্য।'? কিন্তু এ-ই যদি টলস্টয়ের বক্তব্য, সেটি উপন্যাসের ভিতর থেকে ঠিক ফুটে ওঠেনি, তাই এর যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দিহান না-হ'য়ে আমরা পারি না। কেননা গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে প্রচারক-টলস্টয় কিছুটা শোচনীয়ভাবে প্রবল হ'য়ে ওঠেন ; কাহিনীবয়নের ফাঁকে-ফাঁকে জুড়ে দেন এমন সব বক্তৃতা যার কথক তিনি নিজেই, তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্র নয় ; কিন্তু যতই না তিনি ইতিহাস- ও রাজনীতি-সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাগুলিকে বিধ্বস্ত করুন, যতই না চেষ্টিত হোন তাঁর চিন্তাধারায় আমাদের সকলকে দীক্ষিত করতে — আমাদের দীর্ঘশ্বাস কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, তাঁব সব জ্ঞানগর্ভ ভাষণের চাইতে পূর্বজীবনের পিয়ের-নাটাশাকে অনেক বেশি মূল্যবান ব'লে মনে হয় আমাদের। আমরা চেয়েছিলাম তাদের খুব বড়ো ক'রে দেখতে — সেই ইচ্ছে টলস্টয়ই আমাদের মনে জাগিয়েছিলেন — চেয়েছিলাম তারা আলোর দিকে, আকাশের দিকে পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে দিক ; — কিন্তু কী তুচ্ছ, কী নৈরাশ্যজনক তাদের পরিণাম !

একটি সুপ্রাচীন কাব্যকাহিনীর উপসংহারেও এই ধরনের অতৃপ্তি আমরা অনুভব করি। যুধিষ্ঠিরের বিপরীত মেরুতে, লেভিন-বেজুখহ্বের জগৎ থেকে বহু দূরে, আমাদের স্মরণলোকে অন্য এক পুরুষ বিরাজমান : পাশ্চাত্ত্য মানুষের সীমান্তলঙ্ঘী কৌতূহল ও জঙ্গমতার প্রতিরূপ যিনি — অদিসেয়ুস। অর্জুনের চেয়েও বিচিত্র তাঁর জীবন, আরো ব্যাপ্ত তাঁর অভিজ্ঞতার প্রসার। মানবী ও অর্ধদেবী, ভীমবল দৈত্য ও নরমাংসলোলুপ রাক্ষস ; সমুদ্রের বুকে অগণ্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, নিয়তিগর্ভ দ্বীপ ও দ্বীপান্তর ; পদ্মভোজীদের অমানুষিক-মধুর তন্দ্রাচ্ছন্নতা ; ভীষণা-মোহিনী কির্কে,

যিনি পুরুষদের পশুতে পরিণত করেন; রহস্যময়ী সাইরেনীদের মারাত্মক গান; প্রেতলোকে অবতরণ ও পুনরুত্থান; তুফান, ঘূর্ণি, নৌকাডুবি — কত বাধা, কত বিপদ, কত প্রলোভন, কত আতঙ্কের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে অদিসেয়ুসের ভ্রমণকাহিনী, পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য এই ভ্রমণকাহিনী। কবে বেরিয়েছিলেন ঘর ছেড়ে, ট্রয়ান যুদ্ধে দশ বছর কেটে গেলো; অন্য গ্রীক যোদ্ধারা মৃত অথবা স্বদেশে প্রত্যাবৃত; — শুধু তাঁরই উপর দেবতার এই অভিশাপ বা আশীর্বাদ পড়লো যে তিনি সহজে ফিরতে পারবেন না, আরো দশ বছর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ঝাপট স'য়ে কাটাতে হবে। ইলিয়াডে যুদ্ধ-বর্ণনার পর, হেক্তোর-আকিলেউসের বীরত্বকে অর্ঘ্যদানের পর, অদিসি-কাব্যে হোমার যেন তির্যকভাবে গার্হস্থ্যের বন্দনা করলেন: এখানে অদিসেয়ুসের সব চেষ্টার লক্ষ্য হ'লো — কোনো নতুন কীর্তি অর্জন নয় (সেগুলো পথে-পথে দৈবাৎ তাঁর ভাগ্যে জুটে যাচ্ছে), শুধু ঘরে ফেরা, ইথাকায় স্বগৃহে তাঁর পালঙ্কে শুয়ে পত্নীকে পাশে নিয়ে ঘুমোনো। আমাদের আধুনিক মন অনেক বেশি সুখী হ'তো, যদি অদিসেয়ুস — হেমিংওয়ে-বর্ণিত বীর বৃদ্ধ ধীবরের মতো — তাঁর সব প্রকাণ্ড পরিশ্রমের পরেও ব্যর্থ হতেন; অথবা যদি, কাজান্ত্‌জাকিস-এর উত্তরকথনের পূর্বাভাস দিয়ে, কৃতকার্যভাবে দেশের মাটিতে পদার্পণ ক'রেও তিনি পত্নী পুত্র প্রজাদের সঙ্গে মনের সুর মেলাতে না-পারতেন। কিন্তু আমরা জানি যে হোমারীয় জগতে এই ধরনের বেদনার কোনো স্থান নেই; তাই অদিসেয়ুসের সফলতাকে, তাঁর দেশ, কাল এবং যুগধর্মসম্মত মূল্যবোধের নিরিখ অনুসারে আমরা অভিনন্দন জানাতে পারি; আর যে-ভাবে, যুবক পুত্র তেলেমাকোস-এর সাহায্যে, পেনেলোপের একশো-আটটি পাণিপ্রার্থীর প্রতিটিকে তিনি শীতল-রক্তে নিষ্ঠুরভাবে নিধন করলেন, তা যতই না ধিক্কারযোগ্য ব'লে মনে হোক, তাঁর সঙ্গে পেনেলোপের

পুনর্মিলনের দৃশ্যে আনন্দিত হ'তেও আমাদের বাধে না। কিন্তু এই কথাটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না যে তাইরেসিয়াস-এর ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে[১৪], তাঁর ক্ষুদ্র তালুক ইথাকাতেই, ধনে-জনে পরিপুষ্ট হ'য়ে (মেষ, মদ, ও ফলবান বৃক্ষ উৎপাদনে মনোনিবেশ ক'রে) — পিয়ের-নাটাশার গার্হস্থ্যের বন্দীশালায়, অথবা বলা যাক কালিপ্সোর নিত্যসুখময় নিশ্চেতন গুহারই একটি ভিন্ন প্রকরণে সীমাবদ্ধ হ'য়ে — অদিসেয়ুস তাঁর অবশিষ্ট জীবন যাপন করেছিলেন। আমরা যারা রোমান্টিকতার তীব্র সুরা পান করেছি সেই আমরা শুধু নই — প্রাচীন ও প্রাচীনতর কবিরাও বিশ্বাস করেননি যে ঘটনাকীর্ণ কুড়ি-বছরব্যাপী বহির্জীবনের স্মৃতি নিয়ে যিনি বাড়ি ফিরে এলেন, সেই অদিসেয়ুসকে 'কুয়াশার মতো কোমল' হাতে স্পর্শ করেছিলো মৃত্যু, যখন তিনি শান্তভাবে ও সসম্মানে গার্হস্থ্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের যে-অবলুপ্ত অংশটিকে পণ্ডিতেরা এপিক-বৃত্ত নাম দিয়েছেন, যার সারাংশ বা সারাংশেরও চুম্বকমাত্র ছিন্নভিন্নভাবে আমাদের হাতে পৌঁচেছে, তাতে ইলিয়াড ও অদিসির কাহিনী নানা দিক থেকে অনুসৃত ও পূর্ণীকৃত হয়েছিলো। 'তেলেগোনিয়া' নামক লুপ্ত কাব্য অনুসারে অদিসেয়ুস কির্কের (বা কালিপ্সোর) গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন, সেই পুত্রের নাম তেলেগোনোস ; সে বড়ো হ'য়ে ইথাকায় দস্যুবৃত্তি চালিয়ে হত্যা করে তার পিতাকে ; পরে তার সঙ্গে পেনেলোপের ও পেনেলোপে-পুত্র তেলেমাকোসের সঙ্গে কির্কের বিবাহ হয়। কিন্তু তাইরেসিয়াস-কথিত ভবিতব্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রবল ও সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিবাদ যিনি উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি খ্রীষ্টপরবর্তী য়োরোপীয় ধ্রুপদী মানসের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ — দান্তে। নরকের অষ্টম মণ্ডলে, যেখানে কুচক্রী কুপরামর্শদাতারা দগ্ধ হচ্ছে ও চিরকাল হবে, সেখানে কবিদ্বয়ের সঙ্গে অগ্নিশিখারূপী উলিসেস[১৫] ও দিওমেদেস-এর সাক্ষাৎ

হ'লো। ভাজিল-কর্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে উলিসেস বললেন তাঁর শেষ অভিযান ও মৃত্যুর সেই বিবরণ, যা উদ্ভাবন ক'রে দান্তে প্রমাণ করেছেন যে খ্রীষ্টভক্ত স্বর্গযাত্রী হ'য়েও তিনি ইতালীয় রেনেসাঁসের এক পূর্ববিহঙ্গ।

পুত্রের প্রতি স্নেহ, বৃদ্ধ পিতার প্রতি শ্রদ্ধা, এমনকি সেই প্রণয় যা প্রাপ্য ছিলো পেনেলোপের এবং তাকে যা প্রফুল্ল করবে কথা ছিলো —

কিছুই পারলো না সংবৃত করতে আমার ব্যাকুলতাকে, জগৎটাকে ও মানুষের ভালো-মন্দ জানার জন্য :

আমি বেরিয়ে পড়লাম উন্মুক্ত সমুদ্রে, একটিমাত্র নৌকা নিয়ে, আর অল্প কয়েকটি নাবিক, যারা আমাকে পরিত্যাগ করেনি।

দেখলাম দুই তীর হিস্পান পর্যন্ত, মরক্কো পর্যন্ত, সর্দিনিয়া ও সমুদ্র-স্নাত অন্য সব দ্বীপও দেখলাম।

আর যখন পৌঁছলাম সেই সংকীর্ণ জলপথে, যেখানে হেরাক্লেস-এর সীমান্তচিহ্ন প্রতিহত করে দূরযাত্রীদের[৯৬],

তখন আমি শিথিলপেশী বৃদ্ধ, আমার সঙ্গীরাও তা-ই ; আমার ডাইনে প'ড়ে রইলো সেভিল্লা, অন্য দিকে থেউতা বন্দর মিলিয়ে গেলো[৯৭] ;

'ভাই সব,' আমি হেঁকে বললাম, 'তোমরা যারা লক্ষ বিপদ পেরিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছো পশ্চিমে, কার্পণ্য কোরো না

'তোমাদের অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়শক্তিকে জাগিয়ে রাখতে, যাতে নিতে পারো সূর্যের পশ্চাৎবর্তী[৯৮] বাসিন্দাহীন এই জগতের স্বাদ।

'ভাবো তোমাদের উৎপত্তি : পশুর মতো জীবনযাপনের জন্য জন্ম নাওনি তোমরা — চারিত্র ও জ্ঞান তোমাদের সাধনা।'

এই স্বল্প কথায় আমি এতদূর ব্যগ্র ক'রে তুললাম সঙ্গীদের যে চাইলেও তাদের ঠেকিয়ে রাখতে আ'র পারতাম না :

মাঝির পিঠ রইলো প্রভাতের দিকে, আর এই মূঢ় যাত্রায় মাল্লাদের দাঁড় হ'য়ে উঠলো পাখা, আর এমনি ক'রে আমরা বাঁয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

রাত্রি নামলো অন্য মেরুতে[৯৯] তার সব নক্ষত্র নিয়ে; আর আমাদের মেরু এত নিম্নে যে তা সমুদ্র থেকে উত্থিত হ'লো না।

পাঁচবার প্রজ্বলিত ও নির্বাপিত হ'লো চন্দ্রালোক, আর আমরা তবু সেই পরিশ্রমী পথে যাত্রী,

তখন দেখা দিলো এক পর্বত[১০০], দূরত্বের জন্য ম্লান, আমার মনে হ'লো এমন উত্তুঙ্গ চূড়া আমি আর দেখিনি।

আনন্দ আমাদের — কিন্তু অচিরেই সেই আনন্দ হ'লো আর্তি, কেননা ঝড় ছুটে এলো নতুন দেশ থেকে, আঘাত করলো নৌকোতে।

মহাতরঙ্গে তিনবার ঘূর্ণিত হ'লো তরুণী, আর চতুর্থ ঢেউয়ে ডুবে গেলো গলুই, হাল উঠে গেলো উঁচুতে, অন্য একজনের ইচ্ছায় সমুদ্র আমাদের মাথার উপরে বুজে গেলো।

(ইনফের্নো : ২৬ : পঙক্তি ৯৪-১৪২। কার্লাইল-উইকস্টিড-কৃত ইংরেজি গদ্য ও লরেন্স বিনিয়ন-কৃত পদ্য-অনুবাদ থেকে অনুলিখন।)

অদিসি-কাব্যের শেষ অংশে আমরা যাঁকে এক সুখী ও সম্পত্তি-চেতন গৃহস্বামীরূপে দেখতে পাই, সেই অদিসেয়ুসকে ধ্বংস ক'রে দিয়ে দান্তে সৃষ্টি করলেন এক দুঃসাহসিক মৃত্যুপণকারী অভিযাত্রীকে, যৌবন ফুরিয়ে যাবার পরেও যাঁর শোণিতের চাঞ্চল্য থামে না, যাঁর অভীপ্সা দুরধিগম্য নিষিদ্ধ পথে বিস্তীর্ণ হয়। অদিসেয়ুস বলতে আজকের দিনে যাঁকে আমাদের মনে পড়ে, যাঁকে মনে হয় ইতিহাসের সব কলম্বাস বালবোয়া ভাস্কো দা গামার আদিপিতা, সব শ্বেতাঙ্গ আবিষ্কারক ও উপনিবেশ-স্থাপকের দীক্ষাগুরু; মানুষের কল্পনাপ্রসূত চিরভ্রাম্যমাণ সব নাবিকের মধ্যে, য়োরোপের 'উড়ুক্কু ওলন্দাজ'[১০১] ও আরব্যোপন্যাসের সিনবাদের মধ্যে যাঁর বিবর্তন আমরা লক্ষ করি, যাঁর ছায়া জাতককাহিনীতে পড়েছিলো ব'লে অনুমিত হ'য়ে থাকে[১০২], স্বপ্নতাড়িত শান্তিহীন দন কিহোতে ও অনন্ত-জ্ঞানসন্ধানী ফাউস্টকেও যাঁর আত্মীয় ব'লে মনে হয় আমাদের[১০৩] — সেই সব

অনুষঙ্গ- ও চিত্রকল্প-জড়িত অদিসেয়ুসের উৎসস্থল — হোমার নন — দান্তের এই মিতভাষিত ত্রিপদীগুচ্ছ[১০৪]। ধূর্ত প্রবঞ্চক নীতিজ্ঞানহীন অদিসেয়ুসকে নরকভোগের শাস্তি দিয়েছিলেন দান্তে — ঠিকই করেছিলেন ; কিন্তু একই সঙ্গে, উত্তাল পশ্চিমসমুদ্রে অদিসেয়ুসের গৌরবময় ব্যর্থ অভিযান বর্ণনা ক'রে তিনি উত্তরকালের মানুষকে দূরত্বের সাইরেনী-সংগীত শুনিয়ে গিয়েছেন, সেজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এতক্ষণে পাঠকের নিশ্চয়ই মনে প'ড়ে গেছে যে যুধিষ্ঠিরও তাঁর গৃহাশ্রমে চিরকাল আবদ্ধ থাকেননি ; তাঁকেও একদিন ডাক দিয়েছিলো এক বিপুল মুক্তি — এবং প্রাচীন হিন্দুর চিৎপ্রকৃতি ও ভারতবর্ষীয় ভূগোল অনুসারেই তাঁর সেই যাত্রাপথ চিহ্নিত হয়েছিলো। হিমালয়ের ধাপে-ধাপে তাঁর উর্ধ্বারোহণের শেষ দৃশ্যটিতে যুধিষ্ঠির লব্ধ হলেন তাঁর পরিপূর্ণতা — অদিসেয়ুসের ধরনে নয়, সম্পূর্ণ তাঁর নিজের ধরনে — তাঁর সমগ্র অতীত জীবনকে এবং মহাভারতের বিশাল কাহিনীকে যেন অল্প কয়েকটি ধ্যানগম্ভীর মুহূর্তের মধ্যে সংহত ক'রে নিয়ে। পৃথিবীর অন্য কোনো পুরাকাব্যে এমন একটি সুন্দর ও সুসংগত ও অনুরণনময় সমাপ্তি আমরা দেখতে পাই না।

৯২। *War and Peace*, অনু: কন্সটান্স গার্নেট, মডার্ন লাইব্রেরী সং: খণ্ড ৮, পরি: ৮-১৭ ; খণ্ড ১০, পরি: ৩৭ ; খণ্ড ১২, পরি: ১৪-১৬ ; খণ্ড ১৪, পরি: ১২-১৫ ; খণ্ড ১৫, পরি: ১২-১৯, ও উত্তরকথন দ্র।

৯৩। বৃদ্ধের মুখে যা ছিলো এক অসংলগ্ন ঘটনা, টলস্টয় উত্তরজীবনে তাকে একটি সম্পূর্ণ গল্পে রূপান্তরিত করেন। গল্পের নাম: "ঈশ্বর সত্যদ্রষ্টা, কিন্তু অপেক্ষমাণ"।

৯৪। তাইরেসিয়াস প্রেতলোকে অদিসেয়ুসকে বলেন (অদিসি: ১১),

'তারপর, তুমি যখন ঋদ্ধশালী বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়েছো', আর তোমার দেশবাসীরা শান্ত প্রসন্নতায় ঘিরে আছে তোমাকে, তখন আসবে তোমার কাছে সমুদ্রবাহিত মৃত্যু, কুয়াশার হাতের মতো কোমল।' হোমারে শুধু এই ভাবীকথনটুকুই আছে, অদিসেয়ুসের বার্ধক্য বা মৃত্যু বর্ণিত হয়নি।

এখানে 'সমুদ্রবাহিত' শব্দের অর্থ নিয়ে নানা অনুমান সম্ভব, কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে দান্তের উলিসেসকে মৃত্যু 'কোমল হাতে' স্পর্শ করেনি।

৯৫। অদিসেয়ুস নামের লাতিন প্রকরণ উলিসেস, ইংরেজি অপভ্রংশ ইউলিসিস।

উলিসেসের সঙ্গে দিওমেদেসকে যুক্ত ক'রে দান্তে নির্ভুল নীতিবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন; ইলিয়াড ও এপিক বৃত্ত অনুসারে গ্রীক বীরবৃন্দের মধ্যে এই দু-জনই সবচেয়ে পিশুন। দান্তে অবলম্বনেই টেনিসন তাঁর 'ইউলিসিস' কবিতা লেখেন — সেটি, দুঃখের বিষয়, ইংরেজ-প্রভাবিত ভারতবর্ষে 'ইনফের্নো'র চেয়ে বেশি বিখ্যাত।

৯৬। জিব্রাল্টার প্রণালীর দুই দিকে অবস্থিত পাহাড় দুটিকে পুরাকালে হেরাক্লেস-স্তম্ভ বলা হ'তো। দান্তের সময় পর্যন্ত ধারণা ছিলো ঐ 'স্তম্ভ' দুটি অধিবাসিত পৃথিবীর পশ্চিম সীমা নির্দেশ করছে, তা অতিক্রম করলে মৃত্যু নিশ্চিত।

৯৭। থেউতা (Ceuta): উত্তর মরক্কোতে হিস্পান-অধিকৃত বন্দর। বাংলায় সুশ্রাব্য করার জন্য আমি হিস্পানি উচ্চারণ অনুসরণ করেছি।

৯৮। সূর্যের পশ্চাৎবর্তী: দূরতম পশ্চিমে অবস্থিত।

৯৯। অন্য মেরুতে: যাত্রীরা এবারে জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে বেরিয়ে বিষুবরেখা অতিক্রম করলো। নৌকোটি চলছে আটলান্টিকের উপর দিয়ে নৈঋত কোণে — সোজা পশ্চিমে নয়। আধুনিক যুগে যার নাম আমেরিকা, আর দান্তের সময়ে যা ছিলো এক কল্পনানির্ভর অস্পষ্ট-শ্রুত জনরব, সেই মহাদেশের দিকেই উলিসেস অগ্রসর হচ্ছেন। কার্যত না হোক, অভিপ্রায় দিয়ে বিচার করলে দান্তের উলিসেসকেই আমেরিকার প্রথম আবিষ্কারক বলা যায়।

১০০। এটি শোধনাগার-পর্বত, এখানে কোনো জীবিত মানুষ পদার্পণ

করতে পারে না। দান্তের মনে আধুনিক ভূগোল ও বাইবেলভিত্তিক বিশ্বচিত্র অদ্ভুতভাবে সংমিশ্রিত ছিলো।

১০১। কোনো-এক পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এক ওলন্দাজ নাবিক চিরকাল ধ'রে সমুদ্রে-সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে — এটি য়োরোপীয় নাবিকসমাজের একটি বহুকালের সংস্কার। নাবিকদের বিশ্বাস, অভিশপ্ত জাহাজটিকে সাধারণত উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে দেখা যায়, এবং সেটি দেখতে পাওয়া মানে ঘোর অমঙ্গল। এই কিংবদন্তী অবলম্বন ক'রে হ্বাগ্‌নার একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। কোলরিজের 'দি এনশেণ্ট ম্যারিনার' কবিতাতেও এর ছায়াপাত অনুমেয়।

১০২। লোশকজাতক (সংখ্যা ৪৮) ও চতুর্দ্বারজাতক (সংখ্যা ৪৩৯) দ্র। দ্বিতীয়টি প্রায় প্রথমটিরই পুনরুক্তি। জাতকগ্রন্থে সামুদ্রিক গল্প আরো আছে।

সিনবাদকে আমরা আরব্যোপন্যাসের প্রসূন ব'লে জানি, কিন্তু দশম শতকের আরবি লেখক মাস্‌উদির একটি উক্তি অনুসারে 'সিনবাদ-কিতাব' ভারত থেকে আরবে গিয়েছিলো।

১০৩। এ-প্রসঙ্গে এর্নস্ট ব্লোখ মনোজ্ঞ একটি আলোচনা লিখেছেন; আমি কোনো-কোনো তথ্য সেই প্রবন্ধ থেকে আহরণ করেছি। (*Homer : Twentieth Century Views*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, ১৯৬২, পৃ ৮১-৮৫ দ্র।)

১০৪। এই ত্রিপদীগুচ্ছের এক পূর্ণতর পরিণতি দেখিয়েছেন বিশ-শতকী গ্রীক কবি নিকোস কাজ়ান্ত্‌জাকিস; তাঁর বিশাল কাব্যে অদিসেয়ুসের উত্তরজীবন যে-ভাবে চিত্রিত হয়েছে তা ফাউস্টীয় ধরনে ঘটনাবহুল ও সংশ্লেষধর্মী। ইথাকা ছেড়ে স্পার্টা, স্পার্টা থেকে হেলেনকে নিয়ে পলায়ন, তারপর বহু হেলেনিক দ্বীপ ও মিশর ও গভীরতর আফ্রিকা পেরিয়ে, বহু ধ্বংস, নির্মাণ, সংগ্রাম ও সম্ভোগের অভিজ্ঞতা অতিক্রম ক'রে, অদিসেয়ুস নৌকা ভাসালেন দক্ষিণমেরুর দিকে; অবশেষে তাঁর প্রাণবায়ু যখন বহির্গত হ'লো, তখন তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ ধরনে বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী—মনে হয় যেন অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে এক সত্তায় মিলিয়ে দেয়া হ'লো। (*The Odyssey : A Modern Sequel* : Nikos Kazantzakis, অনু : Kimon Friar।)

১৮ : নীলচক্ষু নকুল

যুদ্ধের পরে অন্য এক জগতে আমরা প্রবেশ করি। পঞ্জিকায় আঠারোটি মাত্র দিন — কিন্তু তারই মধ্যে ঘটনার স্রোত যুগান্তর-সীমা উত্তীর্ণ হ'লো। সব সফল অগ্রহায়ণের সমস্ত সোনালি শস্য উৎপাটন ক'রে কর্তক তার পুরাতন ধামে ফিরে গেলো, আর এখন সেই শূন্য রুক্ষ প্রান্তরের উপর ধূসর হ'য়ে নেমে আসছে সন্ধ্যা — এমন এক সন্ধ্যা, যার পরে আর প্রভাত হবে কিনা কেউ জানে না। যাঁরা এখনো জীবিত আছেন তাঁরা যেন উদ্বৃত্ত, অমেয় কোনো মহোৎসবের পর ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টের মতো অবান্তর তাঁরা : — স্ত্রীপর্বে নারীকণ্ঠের ক্রন্দনরোল মিলিয়ে যাবার পরে, মৃতদের জলতর্পণক্রিয়া সমাপনের পরে, আমরা ভেবে পাই না তাঁরা এখন কোন কাজে লাগবেন, কোথায় খুঁজে পাবেন সার্থকভাবে বেঁচে থাকার মতো উপাদান। কেননা পৃথিবী শুধু যে বীরশূন্য হ'য়ে গেছে তা নয় — ভীমের দ্বারা নির্জিত হবার জন্য কোনো যক্ষ-রাক্ষসও যেন অবশিষ্ট নেই ; কোথাও নেই চতুর্থ কোনো সুন্দরী অর্জুনের জন্য বরমাল্য হাতে অপেক্ষমাণা ; নেই কোনো সংগ্রাম যা সাধনযোগ্য, কোনো আহ্বান যাতে শিরায়-শিরায় রক্ত নেচে ওঠে। শুধু আছে দীর্ঘশ্বাস বাতাসে-বাতাসে ছড়িয়ে, শুধু আছে অদৃশ্য কোনো রোগজীবাণুর মতো প্রাণশক্তিহারক ব্যর্থতাবোধ। কিন্তু — কথাটা এখনই বলা দরকার — কিন্তু এই সব অনুভূতি আমাদের মনে সংক্রমিত করেছেন যুধিষ্ঠির ; এই ক্লিষ্ট, খিন্ন, বিবর্ণ জগতের ছবি তাঁরই মনস্তাপ দিয়ে রচিত। দূত এসে যখন জানালো যে পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র নিহত হয়েছেন (সৌপ্তিক : ১০), তখন থেকেই যুধিষ্ঠিরের মনে নিরন্তর প্রশ্ন উঠছে : 'তাহ'লে কেন যুদ্ধ করা হ'লো ? কে লাভবান হ'লো এই যুদ্ধে ? রিক্তরস রিক্তরাগ বৈধব্যপ্রাপ্ত এই পৃথিবী — আর কি তাকে বলা যায় ভোগ্য বা লোভনীয় ? আর

তবু কি এই রাজ্যের ভার, ধনের ভার ব'য়ে বেড়াতে হবে আমাদের, যখন জীবন পর্যন্ত অর্থহীন ও বিস্বাদ হ'য়ে গেলো ?'

স্পষ্টত, যুধিষ্ঠিরের এই মনোভাব যুক্তিসংগত নয়; স্পষ্টত, তাঁর কর্তব্য এখন দৃঢ়ব্রত হ'য়ে রাজ্যভার গ্রহণ করা, ধ্বংসের উপরে পুনর্গঠনের চেষ্টাই তাঁর ধর্মানুযায়ী কর্ম। কেননা যুদ্ধে 'শতাধিক ষট্‌ষষ্টি কোটি বিংশতি সহস্র' সৈন্য[১০৫] নিহত হ'য়ে থাকলেও মানব-বংশ নিঃশেষিত হয়নি; আছেন নারী, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, যুধিষ্ঠিরেরই গণনা অনুসারে কিঞ্চিদধিক চব্বিশ হাজার যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলো; তাছাড়া আছে মৃত যোদ্ধাদের অনুল্লিখিত অনাথ শিশুরা। তাদেরই মুখ চেয়ে, ভবিষ্যৎ প্রবংশের কথা ভেবে, যুধিষ্ঠির এখন অনন্য চিত্তে রাজকর্ম পালন করবেন — এইটেই আশা করা যায় তাঁর কাছে — করা যেতো, যদি তিনি যুধিষ্ঠির না-হ'য়ে অন্য কেউ হতেন। কিন্তু তাঁকে আমরা এতকাল ধ'রে যে-ভাবে দেখে আসছি (এবং একজন সমর্থ ও কৃতকার্য রাজা হিশেবে একবারও দেখিনি), তাতে আমাদের মনে এমন আশা জাগে না যে এই কর্তব্যভারের উপযুক্ত তিনি হ'তে পারবেন। বরং যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্র তিনি যে মগ্ন হলেন এক বিরাট গভীর গহ্বরের মতো নির্বেদে, তাঁর পক্ষে সেটাই আমাদের স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়। শুধু একটি বিষয়ে আমরা পরিবর্তন দেখি তাঁর মধ্যে — অতি উল্লেখযোগ্য সেই পরিবর্তন: তাঁর চিরাচরিত গৃহাশ্রম থেকে চ্যুত হয়েছেন যুধিষ্ঠির, পৃথিবীর মৌলিক লবণের আস্বাদগ্রহণে আর তাঁর আগ্রহ নেই। যুদ্ধের এক উত্তপ্ত মুহূর্তে তাঁর যে-মন দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষের এই জীবনই 'সর্বোৎকৃষ্ট ও দুর্লভ' (ভীষ্ম : ১০৮) তাঁর সেই মন মৃত আত্মীয়দের দেহের সঙ্গে দগ্ধ হ'য়ে গিয়েছে; শবভস্মে আস্তীর্ণ মৃত্তিকার উপর লুটিয়ে পড়েছে তাঁর সেই অন্তরতম গৃহ অথবা গৃহের ধারণা, যা এই দীর্ঘকাল ধ'রে — বনবাসের

সময়েও — তিনি সযত্নে লালন করেছেন মনে-মনে। তাঁর স্বভাবের বিরোধী ব'লে আমরা জেনেছিলাম এতদিন, তাঁর চরিত্রে যে-প্রবণতার অভাবের জন্য তিনি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিলেন, এখন সেই বৈরাগ্যের দিকে তিনি উৎসুক, সেই মোক্ষ তাঁর অন্বিষ্ট, এখন সেই সন্ন্যাসের পথেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হ'তে চান[১০৬]। যুধিষ্ঠিরকে উদ্বোধিত ও প্রবোধিত করার চেষ্টা — এই নিয়েই ভীম অর্জুন এখন সর্বদা ব্যতিব্যস্ত আছেন, এবং শুধু তাঁরাই নন অবশ্য : দ্রৌপদী ও মাদ্রীতনয়েরা, ব্যাসদেব ও কৃষ্ণ, এমনকি শতপুত্রের মৃত্যুতে শোক-জর্জর বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিজেও — শান্তি থেকে আশ্বমেধিক পর্ব পর্যন্ত এঁরা যৌথভাবে বা পালা ক'রে রাজ্যভারগ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁকে — মিনতির স্বরে, রূঢ় স্বরে, সান্ত্বনা ও ভর্ৎসনা মিশিয়ে, নানা ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, বার-বার। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনোবেদনা এখন অচিকিৎস্য, আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতিটি সুবচন তাঁর হৃদয়-ক্ষতকে আরো গভীর ক'রে তুলছে — যুদ্ধের সময়েও এত অশান্ত আমরা তাঁকে দেখিনি।

গার্হস্থ্য ভালো, না সন্ন্যাস — শান্তিপর্বের শুরুতে এই বিতর্ক বহুক্ষণ ধ'রে চললো। মহাভারতের অনুক্রমণিকা থেকে পূর্বোদ্ধৃত সেই তিনটি শ্লোকের (আশা করি পাঠকের তা স্মরণে আছে) পুনরাবৃত্তি আমরা শুনি এখানে : পক্ষীরূপী ইন্দ্রের মুখ দিয়ে বলানো হ'লো যে 'গৃহাশ্রমই সর্বোৎকৃষ্ট ও অতি পবিত্র' (শান্তি : ১১); ব্যাস বললেন যুধিষ্ঠিরের পক্ষে গৃহত্যাগ হবে ধর্মত্যাগেরই নামান্তর, কেননা 'গার্হস্থ্যেই পরম ধর্মলাভ হয়' (শান্তি : ২৩)। উল্টো দিক থেকে, সন্ন্যাস-আশ্রমের নিন্দাও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রচারিত হ'লো (শান্তি : ১৮) : 'সন্ন্যাসীরা পরাশ্রিত জীব, অর্থার্জনকারী গৃহস্থেরাই তাঁদের অন্নদাতা, তাঁরা কর্ম ও কামনা থেকেও মুক্ত নন, কেননা তাঁরা মঠাধিপতি হ'য়ে শিষ্যাদিলাভের চেষ্টা

ক'রে থাকেন'[১০৭] — অর্জুনের এই উক্তিগুলিকে অনেক আধুনিক হিন্দু সানন্দে সমর্থন করবেন সন্দেহ নেই। ভীমের মতেও সন্ন্যাসীরা কপটাচারী (শান্তি : ১০) — দ্বিতীয়-যুদ্ধকালীন বিশ-শতকী ভাষায় পলায়নপন্থী — পরিবার-প্রতিপালনে অক্ষম লোকেরাই মৃগ-পক্ষীর মতো বনে-বনে ঘুরে সুখী হ'তে পারে, নিজের উদর-পূর্তি ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব যার নেই তার জীবন পশুর সঙ্গে তুলনীয়। মূঢ়, ক্লীব, বুদ্ধিভ্রষ্ট — এই ধরনের অনেক বিশেষণ অগ্রজের উদ্দেশে নিক্ষেপ করলেন দুই বীর ভ্রাতা ; দ্রৌপদী আরো অগ্রসর হ'য়ে তাঁকে 'বন্ধনযোগ্য নাস্তিক' ব'লে অভিহিত করলেন (শান্তি : ১৪)। — তবু যুধিষ্ঠির তাঁর সন্ন্যাস-সংকল্পে অবিচল।

দুঃখী যুধিষ্ঠির ! — এই উক্তিটি আমাদের ঠোঁটের প্রান্তে উঠে আসে এবার : মনে হয় যেন সভাপর্বে শুধু নয়, সারা মহাভারত জুড়েই তিনি হ'য়ে রইলেন কর্মক্ষেত্রে অনর্থকারী ও প্রতিষ্ঠাহীন ; তাঁর নৈতিক বর্মে ছিদ্র এত বেশি — অথবা তাঁর সাধুতা বিষয়ে অন্যেরা এমন অসম্ভব উচ্চ ধারণা পোষণ ক'রে থাকেন — যে তাঁকে আক্রান্ত হ'তে হয় পদে-পদে, ভিন্ন-ভিন্ন কারণে ও উপলক্ষে, এমনকি বিপরীত কারণেও। কোনো-এক সময়ে যুদ্ধে ইচ্ছাপ্রকাশের জন্য তাঁকে সম্ভ্রমপূর্ণ শালীন ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন সঞ্জয় (উদ্যোগ : ২৬), আর তারই অনতিপরে সন্ধি বিষয়ে তাঁর আনুকূল্য দেখে দ্রৌপদী তাঁর প্রিয় সখা কৃষ্ণের কাছে রোষে-ক্ষোভে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিলেন (উদ্যোগ : ৮১)। যুদ্ধ যে-ক'দিন ধ'রে চললো, কৃষ্ণ তাঁর সুযুক্তি ও কুযুক্তি-মেশানো জটিল জালে বেঁধে রাখলেন যুধিষ্ঠিরকে — ভীম অর্জুনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তা মিলে গিয়েছিলো ; অথচ কৃষ্ণের প্ররোচনায় স্বপক্ষের স্বার্থ-সাধনের জন্য তিনি যে-মিথ্যা কথাটা মুখে আনলেন তা যোদ্ধা অর্জুন ক্ষমা করতে পারলেন না (দ্রোণ : ১৯৭), সেটাকে চিহ্নিত করলেন রামের বালীবধের মতোই

এক 'চিরস্থায়িনী অকীর্তি' ব'লে। সেখানে তবু অর্জুনের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধুয়ো ধরেছিলেন তক্ষুনি (দ্রোণ : ১৯৮); যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাভাষণের ঠিক সমর্থন না-ক'রেও দ্রোণকে এক অবশ্যবধ্য দুরাত্মা বলতে তাঁদের বাধেনি। কিন্তু শান্তিপর্বে যাঁরা উপস্থিত বা অভ্যাগত তাঁরা সকলেই যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ; তাঁর পক্ষে রাজ্যত্যাগ যে এক অক্ষম্য অধর্মাচরণ হবে সে-বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। আর আমরা — যদি রণদীর্ণ হস্তিনাপুরের অখ্যাতনামা নাগরিকরূপে কল্পনা করি নিজেদের, তাহ'লে আমরাও পারি না ভীম অর্জুন দ্রৌপদীর উষ্মার নিন্দা করতে, তাহ'লে আমরাও বলতে বাধ্য হবো যে যুধিষ্ঠিরের শোক সব যুক্তিবুদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যদি তিনি অকস্মাৎ একদিন মধ্যরাত্রে উঠে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়তেন তাহ'লেও না-হয় কথা ছিলো, কিন্তু গৃহত্যাগ বা গৃহপ্রবেশ কোনোটাই তিনি করছেন না, শুধু যন্ত্রণা দিচ্ছেন নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে — তাঁর এই আচরণ কী ক'রে আমরা সমর্থন করি? মোক্ষ যাঁকে ডাক দিয়েছে তিনি কি কখনো অন্যের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করেন?

অথচ, যুধিষ্ঠিরের এই অপ্রশমেয় বেদনাকে অশ্রদ্ধা করতেও পারি না আমরা, সেটাকে মনে হয় না অবাস্তব বা ভিত্তিহীন, তার উৎসস্থলে আমরা অনুভব করি হৃদয়ের সেই যুক্তির নির্দেশ যা, পাস্কালের ভাষায়, 'যুক্তি কখনো বুঝতে পারে না'। এবং এ-কথাও সত্য যে এত হত্যা, এত মিথ্যা, এত হিংসা ও প্রতিহিংসা পেরিয়ে আসার পর, যদি যুধিষ্ঠির, পত্নীর শয্যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত অদিসেয়ুসের মতো, সগৌরবে সিংহাসনে সমারূঢ় হতেন, বা একদা-ঈশ্বরচেতন বেজুখহব-এর মতো সুখী হতেন স্বার্থপরভাবে, জীবনের সব অন্ধকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে — তাহ'লে আমরা তাঁকে ধ্যানরূপে কখনো দেখতে পেতাম না, আর মহাভারত নামক সাত-সমুদ্র-পেরোনো অর্ণবপোতটি ঠিক তখনই

জলমগ্ন হ'তো যখন তার নিয়তিনিহিত গন্তব্যস্থলের সৈকতরেখা চোখে দেখা যাচ্ছে।

নিয়তি — যুধিষ্ঠিরের নিয়তির গ্রন্থি এবার খুলে যাচ্ছে, অতি ধীরে, অতি কষ্টকরভাবে। ব'য়ে যাচ্ছে ঝড় তাঁর মনের মধ্যে ঝাপটের পর ঝাপট তুলে, তাঁর অস্তিত্বের শিকড়গুলিকে যেন কাঁপিয়ে দিয়ে। শোক — বিলাপ — অনুশোচনা : দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের জন্য, কুন্তীর মুখে কর্ণের পরিচয় পাবার পর থেকে কর্ণের জন্য, দুর্যোধন ও অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রদের জন্য, সমগ্র কুরুকুলের ধ্বংসের জন্য — কিন্তু শুধু কি তা-ই ? যে-ভাষায় তিনি বিলাপ করছেন তা অদ্ভুতভাবে অর্থপূর্ণ : একদিকে যেমন তাঁর পূর্বজীবনের, তাঁর হৃদপ্রান্তিক জবানবন্দির কোনো-কোনো অংশের তা প্রতিবাদ করছে, তেমনি অন্যদিকে তাঁর চৈতন্যের এক নতুন উন্মোচনে তা সগর্ভ। কুরুক্ষেত্রের মতো যুদ্ধে জয়-পরাজয় সমার্থক বা সমানভাবে অর্থহীন হ'য়ে যায় — এ-কথা কি তিনি ছাড়া আর-কেউ বুঝেছিলেন ? অন্য কেউ কি অনুভব করেছিলেন যে কাল আমাদের রন্ধন ক'রে নেবার পরেও জীবনের বিক্ষেপগুলি অবশিষ্ট থাকে, আর সেগুলিকেই আমরা ভয়াবহভাবে জীবন ব'লে ভুল ক'রে থাকি ? 'এই যে আমরা জয়ী হলাম এটাই আমাদের পরাজয়, আর যারা পরাজিত তারাই জয়ী হ'লো। যে-জয়ের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হয় সেটাই সত্যিকার পরাজয় (সৌপ্তিক : ১০)।... আমরা আত্মঘাতী, কৌরবদের সংহার ক'রে নিজেদেরই বিনষ্ট করেছি — আমাদের জয়লাভ হয়নি, তারাও জয়ী হ'তে পারলো না। চলো, অর্জুন, চলো আমরা যাদবনগরে গিয়ে ভিক্ষার জন্য পর্যটন করি[১০৮]।...আমি লোভ করেছিলাম, আমি পাপে লিপ্ত হয়েছি — এখন ত্যাগ, ত্যাগই আমার অনন্য অবলম্বন। আমি ত্যাগ করবো এই রাজত্ব, ত্যাগ করবো এই দুঃখতাপ, আমি জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই। অর্জুন, তুমি নির্বিঘ্নে এই পৃথিবী শাসন করো।

(শান্তি : ৭)।... শোনো, অর্জুন, ক্ষণকাল মন দিয়ে আমার কথা শোনো। আমি বর্জন করবো গ্রাম্য সুখ[১০৯], বর্জন করবো প্রিয়-অপ্রিয় ভেদজ্ঞান, সহ্য করবো শীত উত্তাপ ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রম, স্থাবর-জঙ্গম কোনো সত্তাকে হিংসা করবো না কখনো, কোনো কার্যেই লিপ্ত হবো না, স্পৃষ্ট হবো না শোকে অথবা হর্ষে, আমি মুণ্ডিতমুণ্ড মুনি হ'য়ে অরণ্যপথে একাকী প্রাণত্যাগ করবো। শুধু সে-ই সুখী, অর্জুন, জন্ম মৃত্যু ব্যাধি বেদনায় পরিকীর্ণ এই সংসার যে পরিত্যাগ করতে পারে (শান্ত : ৯)।' — আমরা ভুলিনি যে কোনো-এক সময়ে যুধিষ্ঠির সুখী মানুষের বিপরীত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, বনবাস-কালে স্বহস্তে মৃগয়া না-করলেও মাংসভোজন ত্যাগ করেননি; কিন্তু তাঁর সেই জীবন-লিপ্সা এখন নিঃশেষিত। শান্তিপর্বের প্রারম্ভে তাঁর উত্তাল বাকতরঙ্গ শুনতে-শুনতে আমাদের মনে হয় যুধিষ্ঠিরের বেদনা শুধু মৃত খ্যাতনামাদের জন্য নয় — তিনি যেন মনে-মনে শুনতে পাচ্ছেন দীনতম অনামী সৈনিকের মৃত্যুকালীন আর্তনাদ — সেই যারা চীন কম্বোজ বাহ্লীক দেশ থেকে এসেছিলো, কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধে যাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ জড়িত ছিলো না; যেন তাঁর মনে প'ড়ে গেছে মরণ-পণে-আবদ্ধ সংশপ্তকচমূকে, যাদের মধ্যে একজনও রক্ষা পায়নি, আর হয়তো তাঁর পিতৃবন্ধু বৃদ্ধ ভগদত্তকেও, কৃষ্ণাশ্রিত অর্জুন যাঁকে সাবলীলভাবে বধ করেছিলেন (দ্রোণ : ২৯) — এমনি আরো অনেক, আরো অনেক। আর সবচেয়ে প্রবল, সবচেয়ে অসহ্য, তাঁর স্বকৃত কর্মের স্মৃতিবৃশ্চিক : দ্রোণবধে তাঁর কুৎসিত ভূমিকা, কর্ণবধের সংবাদে তাঁর অনার্যোচিত উল্লাস, শল্যের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত তাঁর মর্মঘাতী অস্ত্র, মৃতপ্রায় দুর্যোধনের প্রতি তাঁর নির্দয় ব্যবহার — এ কি স্বাভাবিক নয়, অনিবার্য নয় যে যুধিষ্ঠির, যিনি ভীষ্মবধের উপায় বিষয়ে পরামর্শ করার পরে ধিক্কার দিয়েছিলেন ক্ষাত্রজীবিকায় (ভীষ্ম : ১০৮) — তাঁর এখন

বিষাক্ত ব'লে মনে হবে সেই গৃহাশ্রম, সেই জীবন, সেই পরিবার-প্রীতি, যার তাড়নায় তিনি ও-সব কার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন? যে-মহাপাপ থেকে অর্জুনকে রক্ষা করেছিলেন ভগবদ্গীতার কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরকে তারই মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছিল, তিনি বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর স্বভাবকেই হত্যা করতে: কেমন ক'রে নিজেকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন?

'একশত পুত্র ছিলো আমার[১১০], তাদের মধ্যে একটিও কি ছিলো না যে তোমাদের কাছে অল্প অপরাধ করেছিলো? সেই একটিকে কেন নিস্তার দিলে না, ভীম?' গান্ধারীর এই সরল ও দারুণ প্রশ্নের ভীম কোনো উত্তর দিলেন না — দিতে পারবেন ব'লে আশাও করিনি আমরা — কিন্তু যুধিষ্ঠির এগিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ বললেন (স্ত্রী: ১৫): 'দেবী, আমি আপনার পুত্রহন্তা, আমি মিত্রদ্রোহী ও মূঢ়, আমিই এই পৃথিবীনাশের মূল হেতু, আপনি আমাকে অভিশাপ দিন।' তথ্য হিশেবে আমরা সকলেই জানি যে যুদ্ধের জন্য যুধিষ্ঠিরেরই সবচেয়ে অল্প দায়িত্ব — এবং যুধিষ্ঠিরও তা জানেন না তা নয়; কিন্তু তবু যে তিনি এই সর্বনাশের হেতু ব'লে ঘোষণা করলেন নিজেকে, এটা তাঁর এখনকার সব উক্তি ও আচরণের চাবির মতো কাজ করছে। পাপ — পাপ সংঘটিত হয়েছে পৃথিবীতে, কে অধিক এবং কে স্বল্প পরিমাণে পাপী সে-প্রশ্ন এখন অবান্তর; কাউকে নিতে হবে তার দায়িত্ব — বিনা তর্কে, স্বপ্রণোদিত-ভাবে — খ্রীষ্ট যেমন মানবজাতির সনাতন পাপের ভার নিজে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি; বিশ-শতকী হিন্দুসমাজের সব জড়ত্ব ও মূঢ়তার বোঝা গান্ধী যেমন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তেমনি; — কুরুক্ষেত্রের পরেও প্রয়োজন ছিলো প্রায়শ্চিত্তের, সেটা বিশ্বপ্রকৃতির দাবি, তা না-হ'লে পৃথিবী স্বাস্থ্য ফিরে পাবে না; — আর সেই প্রায়শ্চিত্ত, মানবিক পাদপীঠে দাঁড়িয়ে, ভুক্তভোগীদের মধ্যে যুধিষ্ঠির

ছাড়া আর কে করতে পারতেন? এই যে তিনি অন্যদের কৃত অপরাধও নিজের ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন, যেন দুর্যোধন-শকুনির সঙ্গেও একাত্ম হ'য়ে গেলেন মনে-মনে, সব পাপাত্মার মুখপাত্র হ'য়ে ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন আনতশিরে গান্ধারীর কাছে ও জগতের কাছে — এটাই উত্তরপুরুষের জন্য উপঢৌকন তাঁর — এবং কোনো রাজত্ব-পরিচালনার চাইতে এটাকে কোনোমতেই ন্যূন বলা যায় না, কেননা এতেই আছে চিত্তশুদ্ধির উপাদান, আছে যুদ্ধপরবর্তী মনোবৈকল্য থেকে সর্বজনের পরিত্রাণের উপায়।

কিন্তু তবু — যদি এক মুণ্ডিতশির অর্ধনগ্ন উপবাসী সন্ন্যাসীর রূপে সত্যি তাঁকে আমরা দেখতে পেতাম কখনো, যদি সত্যি তিনি ঔপনিষদিক নির্দেশ অনুসারে সব কর্ম থেকে বিরত হতেন[১১১], সেটাও আমাদের মতে হ'তো এক অপলাপ অথবা ব্যঙ্গচিত্র — ব্যাসদেবের পরিকল্পনার পক্ষে মারাত্মক। যুধিষ্ঠিরের সমগ্র পূর্বজীবন থেকে এটুকু আমরা নিশ্চিত বুঝে নিয়েছি যে তাঁর দ্বন্দ্বের সহজ কোনো সমাধান সম্ভব নয়, 'রথচক্রের মতো ঘূর্ণমান' সংসার থেকে কোনো প্রথাসিদ্ধ পথে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, তাই আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত বা আহত হই না, যখন শান্তিপর্ব অধিক দূর অগ্রসর হবার আগেই আমরা তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত দেখি (শান্তি : ৪০); তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়া যে দুঃসাধ্য নয়, এটা এতদিনে মামুলি কথা হ'য়ে গিয়েছে। অভিষিক্ত হলেন, কিন্তু উত্তরকাণ্ডের সীতা-বিরহিত রামের মতো রাজকার্যে নিবিষ্ট হ'তে পারলেন না — আরো, আরো, আরো প্রবোধনের জন্য কৃষ্ণ তাঁকে উপস্থিত করলেন কুরুবংশের সেই মহাযোদ্ধা ও জ্ঞানগুরুর কাছে, যিনি শরশয্যায় শয়ান অবস্থায় তখনও মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। অমিতবক্তা ভীষ্ম, অক্লান্তশ্রোতা যুধিষ্ঠির : এই দু-জনের সমবায়ে, বনপর্বের পুনরুক্তি ক'রে, রচিত হ'লো নতুন এক মহাবিদ্যালয় — শান্তিপর্বের

বিস্তার ছাড়িয়ে অনুশাসনপর্বের শেষ পর্যন্ত ধ্বনিত হ'লো একতার স্বরে একক আচার্যের কণ্ঠস্বর। রাজধর্ম, সতীধর্ম, কুলধর্ম, বিবাহরহস্য ও মাংসাহারবিধি, নিখিলভারতের দশদিক থেকে কুড়িয়ে-আনা কিংবদন্তী ও লৌকিক গল্প, অনেক কথা যা আমাদের মতে গর্হিত বা হাস্যকর, অনেক কথা যা আমাদের পক্ষেও শ্রদ্ধেয় এবং সুস্বাদু — জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক থেকে শুরু ক'রে ছত্র-পাদুকার উৎপত্তি বা জ্বরের জন্মকথা পর্যন্ত: পৃথিবীতে হেন বিষয় নেই যা সেই দ্বিমাত্রসম্বল অনন্যসাধারণ আকাদেমিতে উত্থাপিত ও আলোচিত না হ'লো। — কিন্তু ইতিমধ্যে প্রকৃতি নিঃশব্দে তার কাজ ক'রে যাচ্ছিলো, সূর্য উত্তরায়ণে আগতপ্রায়, ভীষ্মের বিদায় নেবার সময় হ'লো। আর যখন, পিতামহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে আরো একবার শোকবিহ্বল হলেন যুধিষ্ঠির, তখন ব্যাসদেব আর ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না — পৌত্রকে স্পষ্টভাষায় শুনিয়ে দিলেন যে তাঁর বুদ্ধি এখনো বালোচিত, এত উপদেশ শুনেও উপকৃত হ'তে পারেননি তিনি, অচিরাৎ অজ্ঞানতা পরিহার ক'রে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান তাঁর কর্তব্য (আশ্ব: ২-৩)। ব্যাসদেবের সমর্থন-কল্পে কৃষ্ণ এলেন কিছুক্ষণ পরে (আশ্ব: ১১-১৩); তাঁর মুখে তিন-অধ্যায়ব্যাপী হিতকথা শোনার পরে অবশেষে যুধিষ্ঠিরের হৃদয়-জ্বালা জুড়োলো — অন্তত পুঁথিতে তা-ই লেখা আছে, (আশ্ব: ১৪); যদিও আমরা তা ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি[১১২]।

রাজা হবার পরে রাজসূয়, তথাকথিত জয়লাভের পরে অশ্বমেধ — যুধিষ্ঠিরের জীবনে এই দুই বিন্দুর একবার তুলনা করা যাক। যদি ফিরে তাকাই সভা, বন, উদ্যোগ ও ভীষ্মপর্বের দিকে, যদি স্মরণে আনি যুদ্ধকালীন সব কথোপকথন, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হয় যে যুদ্ধের পরে শুধু যুধিষ্ঠিরই বদলে যাননি, তাঁর অভিভাবক-মণ্ডলীর মধ্যে — অপরিবর্তনীয় ব্যাসদেবকে বাদ দিয়ে — একজনও আর

আগের মতো নেই। জগৎ থেকে প্রেরণা যেন লুপ্ত হয়েছে, কোথাও কোনো প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত নেই, স্বভাবযোদ্ধার শৌর্য পর্যন্ত পাংশুতা-প্রাপ্ত। ধরা যাক শান্তি ও অনুশাসনপর্বে ভীষ্মের অপরিমেয় ভাষণ — কে না মানবে তার অনেক অংশ কৌতূহলজনক বা শিক্ষাপ্রদ বা চমৎকারী, কিন্তু তাতে ক্বচিৎ দেখা যায় সেই চিত্রকল্পের বিদ্যুৎচ্ছটা, সেই কবিতার দীপ্তি, যাতে বনপর্বে লোমশ মার্কণ্ডেয় বৃহদশ্বের কথকতা উদ্ভাসিত ছিলো। এর ব্যাখ্যা হয়তো এই যে সর্বত্র না হোক অনেক স্থলে ভীষ্মের উপদেশ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের রচনা; কিন্তু অপকর্ষের কারণ যা-ই হোক, আমি তার মধ্যে একটি ঔচিত্য ও প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করি। সব এখন পতনোন্মুখ — গৃহ, মানুষ, মেধা, ক্ষমতা, রাজ্যশ্রী; নেপথ্যে যে-মহাপাতন অপেক্ষমাণ, তারই জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ হ'য়ে গেছে। কৃষ্ণ, ভগবদগীতার প্রবক্তা, একবার যাঁর নেত্রকিরণে ত্রিলোকের রহস্য উন্মীলিত হয়েছিলো, যাঁর ইঙ্গিতে আমরা মুহূর্তের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তর পেরিয়ে এসেছিলাম, সেই কৃষ্ণের মুখে এখন শোনা যায় শুধু লজিক কপচানো, শুধু সেই ধরনের আক্ষরিক তত্ত্বালোচনা, যা নিতান্ত নিরানন্দ ব'লেই নিষ্ফল। যেন চেষ্টাকৃতভাবে কথা বলছেন এখন, কৃষ্ণ, তাঁর কোনো বাক্য আর উদ্দীপিত বা উদ্দীপক নয়; তাঁর তথাকথিত কামগীতা ও অতীব দীর্ঘ অনুগীতায় (আশ্ব : ১১-১৩ ও ১৬-৫১) যেটুকু বা হৃৎস্পন্দন শোনা যায় তা মূল গীতার ক্ষীণ ও ক্ষীণতর প্রতিধ্বনিমাত্র[১১৩]। রাজসূয় যজ্ঞের সময় চার পাণ্ডব চার ভিন্ন-ভিন্ন দিকে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু অশ্বমেধের অশ্ব নিয়ে বহির্গত হলেন একা অর্জুন — জয় করলেন ত্রিগর্ত ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও সিন্ধুদেশ, কিন্তু মণিপুরে এসে 'মৃত্যু' হ'লো তাঁর — কোনো ছদ্মবেশী দেবতার হাতে নয়, তাঁরই যুবক পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে, যাকে আমরা কোনোমতেই অর্জুনের সমকক্ষ যোদ্ধা ব'লে কল্পনা করতে পারি না। অন্য দু-বার তিনি ঔদ্ধত্যের

জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু যজ্ঞাশ্বরক্ষার মতো শ্লাঘনীয় কর্মে তাঁর ব্যর্থতা ও যুদ্ধে পরাজয়, এই ঘটনায় তাঁর বহুবিশ্রুত ক্ষাত্র বীর্য যেন উপহসিত হ'লো — তাঁর জীবনে এই প্রথম বার, যদিও শেষ বার নয়। বভ্রুবাহনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের বর্ণনা পড়তে-পড়তে আমাদের মনে হয়, অর্জুন শুধু বীরোচিত অঙ্গভঙ্গি ক'রে যাচ্ছেন, তাঁর পেশীসমূহ বহুকালের অভ্যাসবশত কাজ ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর মন আর উৎসাহিত হ'তে পারছে না — কৃষ্ণের বাগ্মিতার মতোই তাঁর বীরত্ব এখন বীতস্ফূর্তি ও ক্ষীণপ্রাণ। কী হয়েছে? এঁরা কি বৃদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছেন — কৃষ্ণ, অর্জুন, অন্যান্য কুরুনন্দনেরা — সকলেই?

বঙ্কিম তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে' বলেছেন যে মৌষলপর্বে কৃষ্ণের বয়স হয়েছিলো পুরো একশো, এবং জরা নামক যে-ব্যাধের শরক্ষেপে তাঁর মৃত্যু হয়, তা সাধারণ জৈব বার্ধক্যেরই একটি রূপকল্পমাত্র। যদুকুল-ধ্বংসের সময় কৃষ্ণের বয়স শতোত্তর হয়েছিলো, এ-কথা বিষ্ণুপুরাণেও উল্লিখিত আছে (৫ : ৩৭ : ১৯)। এদিকে কৌরবপক্ষের প্রথম সেনাপতি-পদে পিতামহ-ভীষ্ম বৃত হয়েছিলেন ব'লে শ্রীমতী কার্ভে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন[১১৪], কেননা সে-সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিলো 'অন্তত নব্বুই থেকে একশো বছরের মধ্যে।' মৃত্যুকালে দ্রোণের বয়স ছিলো পঁচাশি, এ-কথা মহাভারতেই উক্ত হয়েছে (দ্রোণ : ১৯৩)। এদিকে, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের গণনা অনুসারে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তিন কৌন্তেয়র বয়স হয়েছিলো যথাক্রমে বাহাত্তর, একাত্তর ও সত্তর, ও মাদ্রীতনয়দ্বয়ের উনসত্তর[১১৫] — এগুলোকেও ঠিক যুদ্ধোপযোগী বয়স বলা যায় না; তাছাড়া ভীষ্ম-দ্রোণের পূর্বোক্ত বয়সের সঙ্গে তুলনা করলে এই গণনাকে অবাস্তব ব'লে মনে হয়। শ্রীমতী কার্ভের উত্তরে সহজেই বলা যায় যে দ্বাপরযুগের লোকেরা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘায়ু ছিলেন — ত্রেতাযুগবাসী রামের মতো

'ষাট হাজার বছর' ধ'রে রাজত্ব না করুন, মাত্র একশো বছরেই তাঁদের যৌবন অবসিত হবার কথা নয়। কিন্তু দ্বাপরযুগের দোহাই মানলেও আমরা অন্য এক আক্ষরিকতার ফাঁদে প'ড়ে যাবো, আমাদের দৃষ্টি থেকে মহাভারতের সত্যকার পরিপ্রেক্ষণিকাটি হারিয়ে যাবে। আসল কথা, কৃষ্ণ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরাদির বয়সের হিশেব আমরা পাটিগণিত বা নক্ষত্রবিদ্যার সাহায্যে খুঁজে পাবো না, তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। মিকেলাঞ্জেলো তাঁর 'পিয়েতা' মূর্তি রচনা করার পর এক বন্ধু পরিহাসের সুরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'যীশু যুবক, তাঁর মাতাও তরুণী — এ কী ক'রে সম্ভব হয়?' দৃপ্ত স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন মিকেলাঞ্জেলো: 'পুণ্যাত্মারা চিরযৌবনের অধিকারী — আপনি কি তাও জানেন না?' ঠিক এই কথাটি মহাভারতের প্রধান চরিত্রদের বিষয়ে প্রয়োজ্য ব'লে আমি মনে করি। তাঁরা নিষ্পাপ না হোন কোনো-না-কোনো অর্থে বীর, কেউ-কেউ হয়তো কিয়ৎ পরিমাণে পুণ্যাত্মাও; — অন্তত তাঁদের ক্রিয়াকর্ম থেকে আমরা এই ধারণা আহরণ করেছি যে ভীষ্ম ও দ্রোণের সঙ্গে কৃষ্ণ কর্ণ অর্জুন ইত্যাদির বয়সের পার্থক্য থাকলেও এঁরা সকলেই দেহে-মনে সমানভাবে যৌবনসম্পন্ন। আমাদের অভ্যস্ত সৌর পঞ্জিকা অনুসারে আশ্বমেধিক পর্বে কৃষ্ণ অর্জুনের বয়ঃক্রম কত হয়েছিলো, তা নিয়ে গবেষণা করা নিষ্ফল; যে-বার্ধক্যে তাঁরা দষ্ট হয়েছেন সেটা কালানুক্রমিক নয়, চারিত্রিক, ইন্দ্রিয়ের নয়, আত্মার। কেউ নিস্তার পাননি, পেতে পারেন না; দুর্যোধন-দুঃশাসনেরা মৃত্যুর দ্বারা পাপের ঋণ শোধ ক'রে গেছেন; আর জীবিতদের মধ্যে যুধিষ্ঠির যা সচেতনভাবে বহন করছেন, সেই অপরাধের ভারে অর্জুনও আজ অবনত — যদিও তিনি নিজে তা জানেন না; সেইজন্যেই পুত্রের হাতে প্রতীকী মৃত্যু হ'তে হ'লো তাঁর — দেহের মৃত্যু নয়, কিন্তু তিনি যে তাঁর কীর্তির চূড়া থেকে ভ্রষ্ট হলেন এর

চেয়ে বড়ো মৃত্যু তাঁর পক্ষে আর কী হ'তে পারে। আমরা অস্পষ্টভাবে অনুভব করি যে ক্রান্তিকাল আসন্ন, যেন এক দিগন্ত-জোড়া বিশাল বিদায়ের সময় হ'য়ে এলো ; এবং আশ্বমেধিক পর্বের সমাপ্তিকালে এক তির্যগ্‌যোনি রহস্যময় প্রাণী এসে এই বার্তাই শুনিয়ে গেলো আমাদের।

তখন যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকর্ম সুসমৃদ্ধভাবে সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। 'যজ্ঞস্থলে ধনরত্ন ছিলো অন্তহীন, ছিলো ঘৃতের হ্রদ, অন্নের পর্বত, মদিরার সমুদ্র, অসংখ্য পশু নিহত হয়েছিলো, যুবতীরা ও মত্ত-প্রমত্ত [পুরুষেরা] সুপ্রীত হ'য়ে বিচরণ করেছিলেন। নিরন্তর উচ্ছ্রিত ছিলো মৃদঙ্গ ও শঙ্খনাদ ; "দান করো, ভোজন করো" ছাড়া অন্য কোনো বাক্য সেখানে শোনা যায়নি' (আশ্ব : ৮৯)। আশা করা যেতো, এই ধর্ম-অর্থ-কাম-যুক্ত মহোৎসব সমাপনের পর যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণরূপে গ্লানিমুক্ত হ'তে পারবেন, কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাতে সেই সম্ভাবনা চূর্ণ হ'য়ে গেলো। রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তিকালে যেমন ব্যাসদেবের মুখে (সভা : ৪৫), তেমনি একটি অমঙ্গলবাণী অশ্বমেধ যজ্ঞের পরেও শুনতে হ'লো যুধিষ্ঠিরকে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও নৃপতিগণ অজস্র উপহার নিয়ে ফিরে গেছেন, যুধিষ্ঠিরের দানকে অভিনন্দন জানিয়ে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করছেন তাঁর মস্তকে, ঠিক সেই সময়ে অকস্মাৎ এক অদ্ভুতমূর্তি নকুল যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হ'লো। তার চক্ষু নীলবর্ণ, মাথা ও দেহের অর্ধাংশ সুবর্ণময়, কণ্ঠস্বর বজ্রগম্ভীর। প্রবেশ করামাত্র, পশুপক্ষীদের ভীত এবং উপস্থিত রাজবৃন্দকে বিস্মিত ক'রে সে পরুষ বাক্যে ঘোষণা করলে যে এই অশ্বমেধ যজ্ঞ অতি তুচ্ছ, ধনবানের দান অশ্রদ্ধেয়, যে-দানের জন্য দাতাকে কোনো কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় না তার কোনো মূল্য নেই। প্রমাণস্বরূপ সে তার জীবনের একটি ঘটনা বিবৃত করলো (আশ্ব : ৯০–৯২)।

কুরুক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করতো এই নকুল। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র : কোনোদিন তাঁর কিঞ্চিৎ আহার জোটে, কোনোদিন তাঁকে সপরিবারে উপবাসী থাকতে হয়। একদিন দ্বারে-দ্বারে ঘুরে ব্যর্থ হ'য়ে তিনি দিনের শেষে এক মুঠো যব ভিক্ষা পেলেন। তা দিয়ে ছাতু তৈরী ক'রে আহারে উদ্যত হচ্ছেন এমন সময় এক অতিথির আবির্ভাব হ'লো। ব্রাহ্মণ তাঁকে তাঁর নিজের খাদ্যভাগ দান করলেন, অতিথির ক্ষুধা মিটলো না। তারপর ব্রাহ্মণের পত্নী ও পুত্র ও পুত্রবধূ, নিজেদের উপবাসক্লেশ গ্রাহ্য না-ক'রে, যথাক্রমে তাঁদের খাদ্যভাগও দান করলেন অতিথিকে। অতিথি তখন পরিতৃপ্ত হ'য়ে গৃহস্বামীকে বললেন, 'আমি ধর্ম, তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম, তোমার দানশীলতা তোমাকে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী করেছে ; এবারে তুমি ভার্যা, পুত্র ও পুত্রবধূ-সহ স্বর্গারোহণ করো।' ব্রাহ্মণ-পরিবার পরমগতি লাভ করার পরে নকুল তার বিবর থেকে বেরিয়ে এসে অতিথির ভুক্তাবশিষ্ট শক্তু কণার উপর গড়াগড়ি যেতে লাগলো — হঠাৎ দেখলো, তার মস্তক ও অর্ধশরীর কাঞ্চনময় হ'য়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট দেহ স্বর্ণমণ্ডিত ক'রে তোলার আশায় সে তার পর থেকে বহু তপোবনে ও যজ্ঞভূমিতে পরিভ্রমণ করেছে, কিন্তু কোথাও তার অভিলাষ পূর্ণ হয়নি। এই খবরটুকু জানিয়ে, জয়ী পাণ্ডবদের লজ্জা দিয়ে সে বললো, 'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গনে এসেও আমি ব্যর্থ হলাম, আমি তাই হাস্যসংবরণ করতে পারছি না।'— কাহিনীটির শেষ অংশ বড়ো দুর্বল, এখানে তা উপেক্ষা করলে ক্ষতি নেই, শুধু একটি তথ্যের উল্লেখ আবশ্যক। এই নীলচক্ষু অর্ধস্বর্ণাঙ্গ যজ্ঞনিন্দুক নকুলটি আর-কেউ নন — কাহিনী-কথিত অতিথির মতো তিনিও ছদ্মবেশী ধর্ম। পুঁথিতে বলা হয়েছে, ধর্ম কোনো-এক কারণে শাপগ্রস্ত হ'য়ে শাপমুক্তির আশায় যজ্ঞনিন্দা করেছিলেন — কিন্তু আমরা অন্য একটি ঘটনার সঙ্গে এর সংযোগ দেখতে পাই।

সেই দেবতা — যিনি হ্রদের প্রান্তে একবার বর দিয়েছিলেন পুত্রকে, তিনি যে এবার পুত্রের জন্য নিয়ে এসেছেন শুধ্ বিদ্রূপের ডালি, শুধু অবজ্ঞার তিক্ত উপচার — এই বৈপরীত্য কি অর্থহীন হ'তে পারে? আশ্বমেধিক পর্বের উপর যখন যবনিকা নেমে এলো তখন মনে হয় সব মৃদঙ্গ ও শঙ্খনাদ স্তব্ধ, যজ্ঞভূমি নির্জন, আর বাতাসে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এক বিষণ্ণ গান: 'ছেড়ে দাও — চ'লে যাও — ছেড়ে যাও।'

কিন্তু তবু যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরে অপেক্ষা করতে হ'লো, রাজপদে বিড়ম্বিত হ'য়ে, আরো ছত্রিশ বছর — যতদিন না ঈশ্বর তাঁর ঘনিষ্ঠ এই জগৎটাকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে ফেলে নিজে অবলুপ্ত হলেন — উত্তেজনাময় নাট্যাভিনয়ের শেষে অধিকারী যেমন স্বগৃহে প্রস্থান করেন, মঞ্চ হ'য়ে যায় অন্ধকার ও দৃশ্যপটরিক্ত, অভিনেতাদের চিহ্ন কোথাও থাকে না, ঠিক তেমনি।

১০৫। একশো ছেষট্টি কোটি কুড়ি হাজার (১৬৬,০০,২০,০০০) — স্ত্রী ২৬ দ্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় সারা পৃথিবীর জনসংখ্যাও অত ছিলো কিনা সন্দেহ, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সংখ্যাবাচক শব্দ প্রায় সর্বদাই অতীকৃত হ'য়ে থাকে, অতএব এ নিয়ে বিব্রত হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

১০৬। শান্তিপর্বে, ভীষ্ম যখন মুহূর্তের জন্য ভাষণবিরত, বিদুর ও পঞ্চপাণ্ডব একবার নিজেদের মধ্যে তত্ত্বালোচনা করেন (অ: ১৬৭)। বিদুর বললেন ধর্ম শ্রেষ্ঠ, অর্জুন বললেন কর্ম, ভীমসেন কামের ও নকুল-সহদেব অর্থের মাহাত্ম্য ঘোষণা করলেন। সকলের সব কথা শোনার পর যুধিষ্ঠির বললেন, 'তোমারা সকলেই ধর্মশাস্ত্র অবগত হয়েছো, কিন্তু আমি বলি: যিনি পাপানুষ্ঠান বা পুণ্যাচরণ কোনোটাই করেন না, তিনিই সুখদুঃখ থেকে মুক্ত হ'তে পারেন।...মোক্ষ যে কী-বস্তু আমরা তার কিছুই জানি না; তবু আমার মতে মোক্ষই সবচেয়ে ভালো।' যুধিষ্ঠিরের চোখের সামনে কোনো

স্পষ্ট পথ ভেসে ওঠেনি এখানো, শুধু কর্মপাশ থেকে বিচ্যুত হবার ইচ্ছেটা তাঁর মনে জেগেছে। কিন্তু কৃষ্ণের এই উক্তি অতি সত্য যে বিনাকর্মে মুহূর্তকাল কেউ থাকতে পারে না (গী : ৩ : ৫), যুধিষ্ঠিরের অবশিষ্ট জীবনে তারই প্রমাণ গ্রথিত হ'য়ে আছে।

১০৭। আদি হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে মঠের কোনো স্থান নেই — ধারণাটি পুরোপুরি বৌদ্ধ, বুদ্ধের মৃত্যুর এগারো শতাব্দী পরে হিউয়েন-সাং ভারতে এসে দেখেছিলেন শতাধিক বৌদ্ধ মঠ ও অসংখ্য শ্রমণ — বুদ্ধের নিকটতর সময়ে সংখ্যা আরো বহুগুণে বেশি ছিলো ধ'রে নেয়া যায়। পক্ষান্তরে, মনু প্রভৃতি বিধানকর্তাদের বচন অনুসারে সন্ন্যাসীর প্রধান লক্ষণ হলো অরণ্যবাস ও পরম নিঃসঙ্গতা — আলোচ্য অংশে যুধিষ্ঠিরের মতিগতিও সেই দিকে। অর্জুনের এই মন্তব্যে আমি শুনতে পাই বৌদ্ধ সংঘের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি; মঠাধিপতি বিষয়ে তীব্রতর বিদ্রূপের জন্য বাল্মীকি-রামায়ণ উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত সর্গ ১-২ অথবা রা-বসুর সারানুবাদ পৃ ৪৪ -৪৩ দ্র।

তত্রাচ, শংকরাচার্যের উদ্যোগে, পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মেও মঠের প্রথাটি গৃহীত হয়, আধুনিক সময় পর্যন্ত আমরা তার বিস্তীর্ণ ব্যবহার দেখছি। পক্ষান্তরে, সন্ন্যাসীর ব্রাহ্মণ্য ধারণাটিকে বৌদ্ধেরা যে উপেক্ষা করতে পারেননি, তার প্রমাণ তাঁদের 'প্রত্যেক-বুদ্ধ'রা — একটি আশ্চর্য উপমায় যাদের বলা হয়েছে 'গণ্ডারের মতো নিঃসঙ্গ'।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একটি বৌদ্ধ কাহিনীতেও মঠবাসী সন্ন্যাসীর জীবন কৌতুকে স্পৃষ্ট হয়েছিলো। যাকে বলা হয় অন্যতম আদি 'বিনয়ধর' (সংঘের নিয়মবন্ধনে বিশারদ), সেই উপালির বালক অবস্থায় তাঁর পিতামাতা ভেবে দেখলেন যে-কোনো কর্মই তাঁদের পুত্রের পক্ষে ক্লেশকর হ'তে পারে: লেখনীচালনায় অঙ্গুলিপীড়া, গণিতচর্চায় শ্বাসকষ্ট, চিত্ররচনায় দৃষ্টিশক্তিহ্রাস — এই ধরনের নানা সম্ভাবনা বিবেচনা ক'রে তাঁরা স্থির করলেন উপালিকে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করাবেন, কেননা সে-পথেই 'সবচেয়ে সহজে জীবিকার্জন করা যায়'। (কাহিনীটির মূল উৎস 'মহাবগ্‌গ', আমি পেয়েছি হিন্টারনিৎস-প্রণীত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে।)

বৌদ্ধধর্মকে পুরাণলেখকেরা কী-চোখে দেখেছিলেন, সে-বিষয়ে দু-একটি কথা এখানে অবান্তর হবে না। আমরা প্রথমেই লক্ষ করি মহাভারত ও

রামায়ণে 'নাস্তিক' শব্দের অর্থ সর্বদাই চার্বাকপন্থী বা বৌদ্ধ। কবিরা কখনো বা চার্বাকের নাম মুখে আনেন (অবশ্য সঘৃণভাবে): 'বাগ্‌বিশারদ পরিব্রাজক' চার্বাক দুর্যোধনের বন্ধু ব'লে কথিত, দুর্যোধন মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রতিহিংসা নেবার জন্য তাকে স্মরণ করলেন (শল্য : ৬৫); শান্তি : ৩৮-এ সেই 'রাক্ষস'কে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ পর্যন্ত হ'তে হ'লো! কিন্তু 'বুদ্ধ' বা 'বৌদ্ধ' শব্দ আমি মহাভারতে কোথাও পাইনি, রামায়ণে পেয়েছি একবারমাত্র — প্রক্ষিপ্ত ব'লে অনুমিত একটি অংশে। জড়বাদী জাবালির প্রতি রামের ভর্ৎসনা :

যথা হি চোরঃ তথা হি বুদ্ধ-
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।

অযোধ্যা : ১০৯ : ৩৪)

—'চোর যেমন [দণ্ডনীয়] বুদ্ধও তদ্রূপ। তথাগতকে নাস্তিক ব'লে জানবে।'

কণ্বমুনির আশ্রমবর্ণনা-প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নে 'বৌদ্ধমতাবলম্বী' শব্দ পাওয়া যায় (আদি : ৭০), কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মূলে আছে 'লোকায়তিক', যার প্রচলিত অর্থ চার্বাকদর্শন বা যে-কোনো অনাত্মবাদী মত। সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ — 'প্রধান-প্রধান নাস্তিকগণ', কিন্তু নীলকণ্ঠ 'লোকরঞ্জক' অর্থ দিয়েছেন। প্রসঙ্গ মনে রাখলে নীলকণ্ঠকেই মান্য মনে হয়; যে-আশ্রম চতুর্বেদপাঠে মুখর, যেখানে 'বিপ্রেন্দ্র' মুনিরা জপ, হোম, যজ্ঞ বিষয়ে আলোচনারত, এবং যাকে বলা হয়েছে 'ব্রহ্মলোকতুল্য', সেখানে বেদবিমুখ ব্রাহ্মণবিরোধী কোনো ধর্মের স্থানলাভ কেমন ক'রে হ'তে পারে? উপরন্তু যদি ধ'রেও নেয়া যায় নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা ভুল, কণ্বমুনির ধর্মীয় ঔদার্য দেখানোই উদ্দেশ্য, তবু লক্ষণীয় যে ভাষাব্যবহারে অস্পষ্টতা রেখে এই অংশের লেখক বুদ্ধের নামটি এড়িয়ে গিয়েছেন। ভাগবতপুরাণ তৃতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধের নাম উল্লিখিত হয়েছে — সেখানে তিনি বিষ্ণুরই এক অবতার, তাঁর জন্মস্থান গয়াপ্রদেশ, পিতার নাম অঞ্জন, আবির্ভাবের উদ্দেশ্য অসুরগণের মোহ উৎপাদন — অর্থাৎ, সজ্ঞানে ভ্রান্ত পথে টেনে দুর্জনের সংহার-সাধন। এই সূত্রটি আবার কাহিনীর আকারে পল্লবিত হ'লো বিষ্ণুপুরাণে (খণ্ড : ৩, অ : ১৮) — সেখানে যে-দৈত্যবিনাশী প্রচারকটিকে দেখা যায় তাঁকে চিনতে আমাদের এক মুহূর্ত দেরি হয় না, কেননা তাঁর দত্ত উপদেশগুলি

সবই বেদবিরোধী ও বৌদ্ধভাবাপন্ন। কিন্তু বুদ্ধের নাম সেখানেও উচ্চারিত হয়নি, 'মায়ামোহ'রূপ প্রকট নামে তিনি স্বচ্ছভাবে আচ্ছাদিত আছেন।

মহাভারতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রভাব বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, উপস্থিত নকুল-উপাখ্যানটি স্পষ্টত তার উদাহরণ। বৌদ্ধশাস্ত্রেও ব্রাহ্মণ্য সংযোগ অনেক পাওয়া যায়।

১০৮। যাদবনগর — দ্বারকা। স্মর্তব্য, উদ্যোগ : ২৬-এ সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে ঠিক এই পরামর্শই দিয়েছিলেন। — 'হে অজাতশত্রু, যদি কৌরবেরা আপনাকে বিনা যুদ্ধে রাজ্য ফিরিয়ে নাও দেয়, তবু আমি বলবো যে যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যলাভ করার চেয়ে আপনার পক্ষে অন্ধক-বৃষ্ণিদের দেশে ভিক্ষাচর্যা অনেক ভালো।'

১০৯। মহাভারতে 'গ্রাম্য' শব্দ গার্হস্থ্যেরই সমার্থক, যে-অবস্থায় কামের পরিতৃপ্তি ঘটে সেটাই গ্রাম্য। কালীপ্রসন্নর পাদটীকায় 'গ্রাম্য সুখে'র অর্থ দেয়া আছে স্ত্রীবিলাসাদি; জ্ঞানেন্দ্রমোহনে 'গ্রাম্যচর্যা'র একটি অর্থ স্ত্রীসঙ্গ, হরিচরণে 'গ্রাম্য' শব্দের নানা অর্থের মধ্যে একটি হ'লো কামবিষয়ক; মনিয়র-উইলিয়মস যৌনসংগম অর্থও দিয়েছেন। বিপরীত শব্দ — আরণ্যক।

স্মর্তব্য, দ্যূতপর্বাধ্যায়ে বিকর্ণ-কথিত চারটি রাজোচিত ব্যসনের একটি হ'লো 'গ্রাম্য' — বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত — যার অর্থ নীলকণ্ঠের মতে স্ত্রীভোগ (সভা : ৬৮ : ২০)। এই অংশেও কালীপ্রসন্নর অনুবাদ অস্পষ্ট।

১১০। ধৃতরাষ্ট্রের মোট পুত্রসংখ্যা একশো-এক, অতিরিক্তটি দাসীগর্ভজাত যুযুৎসু। আদিপর্বের বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, ধৃতরাষ্ট্রের যুযুৎস নামে দুই পুত্র ছিলো — একজন গান্ধারীগর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র, অন্যজন 'করণ' যুযুৎসু। মনু : ১০ : ২২ অনুসারে ব্রাত্য (উপনয়নহীন) ক্ষত্রিয়ের সবর্ণাজাত পুত্রের একটি অভিধা হ'লো 'করণ', কিন্তু নীলকণ্ঠ অর্থ দিয়েছেন বৈশ্যাগর্ভজাত ক্ষত্রিয়পুত্র — প্রসঙ্গের পক্ষে সেটাই গ্রহণীয়। ছোটো-যুযুৎসু পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন ও যুদ্ধের পরেও জীবিত ছিলেন। স্পষ্টত, তিনি জন্মদোষে গান্ধারীর পক্ষে গণ্য হননি — যদিও দারান্তর-প্রসূত স্বামীর পুত্রকেও স্বপুত্র ব'লে গণ্য করাটাই সতীধর্ম।

সভাপর্ব স্মরণ ক'রে বলা যায় যে গান্ধারীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্তত বিকর্ণকে বাঁচিয়ে রাখা যেতো, কিন্তু ভীম তাঁকেও নিস্তার দেননি।

১১১। বৃহদারণ্যক ৪ : ৪ : ২২-এ বলা হয়েছে : 'আমি পাপ করেছি, আমি পুণ্য করেছি, এই উভয় চিন্তা থেকে যিনি উত্তীর্ণ, তিনি কোনো কৃত বা অকৃতের জন্ত সন্তপ্ত হন না।' এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে —

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্থ
ন বর্ধতে কর্মণা নো কনীয়ান্।
তস্যৈব স্থাৎ পদবিৎ তং বিদিত্বা
ন লিপ্যতে কর্মণা পাপকেন॥

—'ব্রহ্মজ্ঞের নিত্য মহিমা এই : তা কর্মের দ্বারা বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। তা যাঁরা জানেন তাঁরা কর্মরূপ পাপে লিপ্ত হন না।'

এখানে সদসৎনির্বিশেষে যে-কোনো কর্ম পাপ ব'লে চিহ্নিত, যে-কোনো কর্ম মোক্ষের অন্তরায়। যুধিষ্ঠিরও পাপানুষ্ঠান ও পুণ্যাচরণ দুটোকেই বর্জন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর এবং আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তিনি সেই আদর্শ পালন করতে পারেননি। 'মোক্ষ যে কী-বস্তু আমরা তার কিছুই জানি না,' তাঁর এই স্বীকারোক্তিটি মূল্যবান।

১১২। রাজ্যভার গ্রহণ করার পর যুধিষ্ঠির তাঁর চার ভ্রাতাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন চারটি ভিন্ন-ভিন্ন প্রসাদে, যেগুলি ছিলো দুর্যোধনাদি ধার্তরাষ্ট্রদের বাসভবন (শান্তি : ৪৪)। ভাইয়েদের বললেন, 'তোমরা আমার জন্ত অনেক দুঃখ সহ্য করেছো, এবার স্বচ্ছন্দে বিজয়সুখ উপভোগ করো।' — কথাটায় ভাইয়েদের প্রতি তাঁর কিছুটা অবজ্ঞা যেন সূচিত হচ্ছে, কেননা তিনি মনে-মনে জানেন যে 'বিজয়সুখ' ব্যাপারটাই অলীক, এবং নিহত শত্রুর প্রাসাদে বাস ক'রে শুধু তারাই সুখী হ'তে পারে যারা বিবেকহীন ও মোহান্ধ।

১১৩। একটি উদাহরণ উপস্থিত করি। গীতা : ১৮ : ৫৯-এ কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন :

যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥

—'তুমি অহংকারকে আশ্রয় ক'রে ভাবছো যুদ্ধ করবো না — তোমার এই ব্যবসায় (প্রতীতি) মিথ্যা। তোমার প্রকৃতি তোমাকে প্রবৃত্ত করবে।'

কামগীতায় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকেও বোঝালেন যে তাঁর আত্মা বা অহংবোধরূপ

দুর্জয় শত্রু এখনো অবশিষ্ট আছে — এবং সেই শত্রুকে পরাস্ত ক'রে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন না-করলে তাঁর দুঃখের সীমা থাকবে না।

দুটো উক্তিকে সদৃশ ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু মস্ত তফাৎ দাঁড়িয়ে যায় এই কারণে যে অর্জুন এক স্বভাবযোদ্ধা, কিন্তু যুধিষ্ঠির সহজাতভাবে — গীতার ভাষায় প্রকৃতি-জ ভাবে — রাজা নন। তাই অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের আদেশে যে-অমোঘতার সুর ধ্বনিত হয়েছিলো, কামগীতায় আমরা তা শুনতে পেলাম না; এ যেন নেহাৎই একটি মুখস্থ বুলি, যা এর আগেও বহুবার আমরা শুনেছি — আর সত্যি বলতে আগে একবার শুনেওছিলাম। যখন শান্তিপর্বে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস নিয়ে তর্ক চলছে, ভীম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে'—কৃষ্ণের পরামর্শও ঠিক তা-ই, এবং অবিকল একই ভাষায় উচ্চারিত ('মনসৈকেন যোদ্ধব্যং তত্তে যুদ্ধমুপস্থিতম্')। বস্তুত, এই কামগীতাটি ভীমের উক্তিরই একটি বিস্ফারিত পুনর্লিখন মাত্র; দুই অংশের ভাবার্থ এক, দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি-সংক্রান্ত আলোচনায় অনেকগুলি শ্লোক পাওয়া যায় যা আক্ষরিকভাবে অভিন্ন বা প্রায় তা-ই (শান্তি: ১৬: ৮-২৭ ও আশ্ব: ১২: ১-১৬ দ্র)। কৃষ্ণের কথায় যুধিষ্ঠিরের মতি বদলেছিলো, তাঁর স্মরণে 'আসেনি যে কথাগুলি তাঁর পূর্বশ্রুত; নিশ্চয়ই কোনো অনুকারকের সৌজন্যেই এ-রকম ঘ'টে গেছে — কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে কৌতুকের; মহাত্মা বাসুদেবের মুখে অতিভোজী অমর্ষপরায়ণ ভীমের কথার পুনরুক্তি শোনার জন্য আমরা ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না।

১১৪। *Yuganta*, পৃ ৪১-৪৩।

১১৫। সিদ্ধান্তবাগীশ-মহাভারতে আদিপর্বের শেষে মুদ্রিত প্রবন্ধ, 'যুধিষ্ঠিরের সময়', পৃ ৩৬।

১৯ : কোন বীর, কোন দেবতা ···

আমার গান, বীণার প্রভুগণ,
কোন দেবতা, কোন বীর, কোন মর্ত্যমানুষকে আমরা বন্দনা করবো ?

পিন্দারোস : অলিম্পিয়া : ২

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে কৃষ্ণ ঈশ্বর নন, এক আদর্শ মনুষ্য। তাঁকে ও তাঁর যুক্তিবাদকে নমস্কার জানিয়ে এই পরিচ্ছেদের আরম্ভেই আমি বলতে চাই যে মহাভারতের পরিধির মধ্যে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব — যদি না আমরা স্বেচ্ছায় কোনো-কোনো সংগীতে বধির হ'য়ে থাকি, কোনো-কোনো জ্যোতি-লিখনে অন্ধ, কোনো-কোনো শিহরন বিষয়ে নিশ্চেতন। যাঁরা সরল চিত্তে মহাভারত পড়েছেন, কোনোরকম পূর্বার্জিত সংস্কারের বশবর্তী না-হ'য়ে, কৃষ্ণ চরিত্রের ঐতিহাসিকতা বা অবতারবাদের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত বিতর্ক থেকে বিচ্যুত হ'য়ে, কোনো মতবাদ বা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা অনুভবশক্তিকে ক্ষুণ্ণ না-ক'রে, তাঁদের কাছে একথা খুব স্পষ্ট যে মহাভারতে এমন অন্তত দুটি মুহূর্ত আছে — দুটি চরম ও অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, যখন কুন্তীর ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র, অর্জুনের ঐ সখা ও ভ্রাতা ও শ্যালক, ঐ যদুবংশজাত শ্যামবর্ণ সুদর্শন পরিহাস-প্রিয় যুবকটি দৃশ্যমান ও শ্রবণীয়ভাবে ঈশ্বররূপে প্রতিপন্ন হন। আর অন্য সময়ে ? অন্য সময়ে তিনি তাঁর জনার্দন নাম সার্থক ক'রে আমাদের শুভবুদ্ধিকে মর্দন করেন — অন্য সময়ে তিনি মানুষ, বঙ্কিম-কথিত আদর্শ মনুষ্য দূরে থাক, এক চতুর কপট নিগূঢ়ভাবুক রাজনীতিদক্ষ লোকনায়ক, যাঁর তুল্য দ্বিমুখী ও সুকৌশলী কূটকর্মা মহাভারতে আর একটিও নেই। কেননা দুর্যোধন অন্তত্তপক্ষে সরলভাবে দুষ্ক্রিয়, তাঁর কাজে ও মুখের কথায় কোনো গরমিল নেই, এবং আদিপর্বে ও সভাপর্বে তাঁর ঈর্ষার বিষ ধূমাক্তভাবে —

এবং একবার গৃহদাহকারী অগ্নিরূপে উদ্‌গীর্ণ হ'লেও যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কোনো বক্র উপায় অবলম্বন করেননি। এবং যুদ্ধে মৃত্যুলাভ ক'রে তিনি স্বর্গেও গিয়েছিলেন, ক্ষত্রধর্মের আক্ষরিক আদর্শ অনুসারে তাঁকে একজন বীর ব'লে আমরা মানতে বাধ্য। তাছাড়া, আদিপর্বের সূচনা থেকেই আমরা অনবরত শুনে আসছি যে দুর্যোধন এক 'মন্যুময় মহাদ্রুম', এক অমঙ্গলমূর্তি দুরাত্মা[১১৬], তাঁর কাছে কোনো সদাচারের প্রত্যাশা নেই আমাদের; কিন্তু যিনি তাঁর স্বভাবগুণে আমাদের আকর্ষণ করেন ব'লে কৃষ্ণ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছেন, এবং যিনি মহাভারতের সবচেয়ে উচ্চপ্রশংসিত পুরুষ — কেমন লাগে আমাদের, যখন দেখি তাঁর মনোমোহন হাসির পিছনে বঞ্চনা, তাঁর সুন্দর চোখের শ্বেত-কৃষ্ণ কটাক্ষপাতে বঞ্চনা, যখন শুনি তাঁর চারু-গঠিত ওষ্ঠাধর থেকে প্রফুল্লভাবে কুপরামর্শ নিঃসৃত হ'তে — তখন কেমন লাগে আমাদের? দৈবাৎ দান্তে যদি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ঘটনাবলির সঙ্গে পরিচিত হতেন, তাহ'লে হয়তো তিনি অদিসেয়ুস-দিওমেদেস-এর সঙ্গে কৃষ্ণকেও স্থাপন করতেন তাঁর নরকের সেই অষ্টম মণ্ডলে, যেখানে ধূর্তেরা অগ্নিশিখারূপে অনবরত ঘূর্ণিত হচ্ছে; কিন্তু যদি কোনো সুদক্ষিণ পুবালি বাতাসে উড়ে-উড়ে গীতার কয়েকটি লাতিনীকৃত ছেঁড়া পাতা তাঁর হাতে এসে পড়তো, তাহ'লে, সন্দেহ নেই, কৃষ্ণকে তিনি স্থান দিতেন তাঁর নিরয়ের বহির্বর্তী লিম্বোতে — যার চেয়ে বড়ো সম্মান দান্তের জগতে কোনো অখ্রীষ্টানের প্রাপ্য হ'তে পারে না — সব 'অধৌতপাপ' মহাত্মারা এবং 'মহত্তম গীতেশ্বরগণ' — হোমার ওভিদ হোরাস ইত্যাদি অমৃতভাষীরা, দান্তের পূজনীয় গুরু স্বয়ং ভার্জিল — যেখানে এক সপ্তদ্বারযুক্ত নদীবেষ্টিত উচ্চ প্রাসাদে বিরাজমান[১১৭]।

যেমন দুর্যোধনের পরিবাদ ও যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা, তেমনি কথারম্ভ-কালেই কৃষ্ণের মহিমাকীর্তনও আমরা শুনেছিলাম। যে-উনসত্তরটি

ত্রিষ্টুভ ছন্দের শ্লোক ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ নামে কথিত (আদি : ১ : ১৫০–২১৮), এবং যাতে মহাভারতের অধিকাংশ প্রধান ঘটনার চুম্বক সংকলিত আছে, তার মধ্যে চোদ্দটিতে কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। একদা যিনি একটি মাত্র বামন-পদক্ষেপে পৃথিবী অধিকার করেছিলেন, তিনিই কৃষ্ণ ; কৃষ্ণ অর্জুন ও গাণ্ডীবধনুর সংযুক্ত শক্তি অপ্রমেয় ও অপরাজেয় — এ-সব সংবাদ, এবং যা পরে বহুবার পুনরুক্ত হবে সেই নর-নারায়ণ-সম্পৃক্ত প্রবচনও[১১৮], ধৃতরাষ্ট্রের মাধ্যমে শোনানো হয়েছিলো আমাদের — মূল কাহিনী আরম্ভ হবার বহু পূর্বে। আধুনিক উপন্যাস যে-ধরনের লুকোচুরি খেলায় আমাদের অভ্যস্ত করেছে, তার কোনো লক্ষণ অবশ্য মহাভারতে নেই : ব্যাসদেবের সব তাস প্রথম থেকেই টেবিলের উপর উত্তান, পাণ্ডব-কৌরব স্পষ্ট শাদায়-কালোয় বিভক্ত, কৃষ্ণের রহস্য-কথাও রাষ্ট্র করা হ'লো সর্বসমক্ষে। অথচ আমাদের কাহিনী-সংক্রান্ত উৎকণ্ঠা এতে নিস্তেজ হ'লো না ; কেননা ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের পরবর্তী বিস্তীর্ণ জটিল ঘটনাপর্যায় পেরিয়ে আমরা যতক্ষণে যুধিষ্ঠির অর্জুন কৃষ্ণ ইত্যাদির সন্নিধানে উপনীত হই, ততক্ষণে এ-সব উক্তি আমাদের স্মৃতি থেকে স্খলিত হ'য়ে গেছে, কিংবা হয়তো গল্প শোনার অনাদি মোহে ম'জে পূর্বশ্রুত তথ্যগুলিকে আমরা উপেক্ষা ক'রে যাচ্ছি। বিশেষত, পাণ্ডব-ধার্তরাষ্ট্রদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন শুরু হ'লো, তখন থেকে প্রতিটি সদ্যপরিচিত ব্যক্তি তাঁর সব দোষ-গুণ নিয়ে নিজের কারণেই মূল্যবান হ'য়ে ওঠেন, তাঁদের বিষয়ে আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হ'তে থাকে — দেখা যাক ইনি কেমন মানুষ, এর পরে কোন কর্ম করেন দেখা যাক। কৃষ্ণকে নিয়েও সেই অভিজ্ঞতাই হ'লো আমাদের ; দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় তাঁকে যখন প্রথম দেখলাম তখন তাঁর বিষয়ে আমাদের মন রেখাপাতহীন স্লেটের মতো নির্বিকার, মনে হ'লো না তাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে কখনো কিছু শুনেছিলাম — অর্জুন কেন লক্ষ্যবেধের আগে কৃষ্ণকে-

স্মরণ করলেন সেটা আমাদের অবোধ্য থেকে গেলো। এই প্রথম আবির্ভাবে কৃষ্ণের কোনো অসামান্যতার চিহ্ন নেই : তিনি ভ্রাতাদের দেখামাত্র চিনতে পারলেন এবং মধ্যস্থ হ'য়ে ব্যর্থ রাজাদের সঙ্গে ভীম-অর্জুনের যুদ্ধ-ঘটনাটি মিটিয়ে দিলেন — এই পর্যন্ত তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখা গেলো ; তারপর বলরাম-সহ যুধিষ্ঠির ও কুন্তিকে অভিবাদন জানিয়ে তিনি ফিরে গেলেন দ্বারকায় (আদি : ১৮৭-৯১) — পাঞ্চালীর পঞ্চস্বামীকত্ব বিষয়ক আলোচনায় যোগ দেবার জন্যও অপেক্ষা করলেন না। এখানে কৃষ্ণ যেন পাণ্ডবহিতৈষী যে-কোনো একজন — তাঁর ভাবী ভূমিকার কোনো অঙ্কুর নেই এখানে, অর্জুনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের চিহ্নমাত্র নেই। প্রথম বনবাসকালীন পর্যটক অবস্থায় অর্জুন যেই প্রভাসতীর্থে এলেন, আমরা তখনই শুনলাম তিনি কৃষ্ণের প্রিয়সখা (আদি : ২১৮) — যদিও কখন এবং কী-ভাবে এই সখ্য গ'ড়ে উঠলো আমরা তার কিছুই জানতে পারলাম না। মহাভারতের সব প্রধান পুরুষের জীবন-কথা জন্ম থেকে আনুপূর্বিক বিবৃত হয়েছে — শুধু কৃষ্ণ-কাহিনীতে কবি যেন ইচ্ছে ক'রেই অনেক শূন্যস্থান রেখে দিয়েছেন ; এই ভারত-ইতিহাসের বহুবঙ্কিম অগ্রসরণের মধ্যে কৃষ্ণের উত্থান কেমন ক'রে ঘটলো, ব্যাসদেব তার কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দেননি। কৃষ্ণ-অর্জুনের সম্পর্কটিও ঈষৎ রহস্যময় ; রৈবত-উৎসবের সময় থেকে সুভদ্রাহরণ ও খাণ্ডবদাহন পেরিয়ে আদিপর্বের সমাপ্তি পর্যন্ত, এই যুগলকে আমরা দেখতে পাই দুই অবিচ্ছেদ্য বন্ধু, ক্রমশ আরো নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ : তাঁরা নর্মসখা ও সহকর্মী, পরস্পরের সহায় ও অবলম্বন, যদিও — এখনই বোঝা যাচ্ছে — কৃষ্ণের দিকে পাল্লা একটু ভারি, তিনি যেন সচেতনভাবে অর্জুনের জীবনে অংশিদার হ'য়ে উঠেছেন — নিজের উপর সম্পূর্ণ দখল বজায় রেখে — আর অর্জুন হ'য়ে পড়ছেন

নিজেরই অজান্তে কৃষ্ণের উপর অধিক ও অধিকতর নির্ভরশীল। ধরা যাক সুভদ্রাহরণের ব্যাপারটা — সত্যি কি তার প্রয়োজন ছিল? অর্জুন যথাবিহিতভাবে প্রার্থনা করলে কোন কন্যার বা কন্যাপক্ষের অমত হ'তো? কেন কৃষ্ণ বন্ধুকে দিয়ে ভগ্নীকে হরণ করিয়ে বলরাম ও জ্ঞাতিবর্গকে রুষ্ট করলেন? আর অর্জুনই বা কৃষ্ণের পরামর্শ বিনা-বাক্যে মেনে নিলেন কেন? আমরা পরে দেখবো মহাভারতে সুভদ্রার ভূমিকা অতি নগণ্য, অভিমন্যুর মাতা ও পরীক্ষিতের পিতামহীরূপেই তাঁর পরিচয়; অর্জুনের ভার্যা হিশেবে উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার যেটুকু বা প্রতিষ্ঠা আছে, সুভদ্রার সেটুকুও নেই — অথচ তাঁরই বিবাহ নিয়ে এই নাটকীয়তার আমদানি কেন করা হ'লো? সন্দেহ নেই, কৃষ্ণ চেয়েছিলেন এই বিবাহ সবিঘ্ন হোক, যাতে অর্জুন নতুন কুটুম্বদের কাছে তাঁর শৌর্যের প্রমাণ দিতে পারেন — এবং চেয়েছিলেন অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রণয়বন্ধনের সম্প্রচার। এই প্রথম — কিন্তু খাণ্ডবদাহনের সময় তাঁদের সম্পর্কটি উজ্জ্বলতরভাবে প্রকাশিত হ'লো; আমরা লক্ষ করি, যমুনাতীরবর্তী প্রমোদকুঞ্জে দ্রৌপদী-সুভদ্রাকে পরিহার ক'রে কৃষ্ণের সঙ্গেই সময় কাটাচ্ছেন অর্জুন, আর খাণ্ডবদাহনই কৃষ্ণ-অর্জুনের সহকর্মিতার প্রথম মহৎ দৃষ্টান্ত — কেননা সে-উপলক্ষে অর্জুন যেমন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ ও বিশ্বকর্মা-রচিত দিব্যরথ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি কৃষ্ণও পেয়েছিলেন তাঁর গদা ও সুদর্শনচক্র। তারপর সভাপর্বে এসে আমরা দেখলাম, কৃষ্ণ ইতিমধ্যে অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছেন — শুধু অর্জুনের পক্ষে নয়, যুধিষ্ঠিরের পক্ষেও, পাণ্ডবদের অমাত্য বান্ধব সকলের পক্ষেই। এটাও আকস্মিক — এর জন্য কোনো প্রস্তুতি আমরা পেরিয়ে আসিনি।

কৃষ্ণের কাপট্য ও বক্রতার প্রথম নিদর্শন জরাসন্ধবধ (সভা: ১৯-২৩)। এই হত্যাকাণ্ডটি তিনি যে শুধু পাণ্ডবদের হিতকামনায়

সম্পাদন করেছিলেন তা নয়, তাঁর নিজেরও স্বার্থ জড়িত ছিলো। জরাসন্ধের বিক্রম সইতে না-পেরে, বার-বার আক্রান্ত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে যদুকুল অগত্যা মথুরা ছেড়ে পশ্চিমতটের গিরিদুর্গে পালাতে বাধ্য হয়েছিল; সেই পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধ এবার নিতে চান কৃষ্ণ — তারই উপলক্ষস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকে ও উপায়স্বরূপ ভীম-অর্জুনকে তিনি ব্যবহার করলেন। প্রতিশোধ-স্পৃহাকে এমনিতে দূষ্য বলা যায় না — বরং সেটি ক্ষত্রিয়ের একটি চরিত্রলক্ষণ — আর জরাসন্ধও তখন এমন এক বীভৎস কর্মে উদ্যোগী হয়েছেন যার নিবারণ নিতান্তই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু কৃষ্ণকে কাপট্যের আশ্রয় নিতে দেখে আমাদের চিত্ত তাঁর প্রতি বিমুখ হ'য়ে ওঠে। জরাসন্ধ ছিলেন সরল যোদ্ধা, এবং সরল যুদ্ধেই তাঁকে বধ করা অসম্ভব ছিলো না; — তবু মিথ্যাচরণ বেছে নিলেন কৃষ্ণ; তিনজনেই স্নাতক-ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন, অর্ঘ্য প্রত্যাখ্যান ক'রে গায়ে প'ড়ে অপমান করলেন জরাসন্ধকে। আর ঐ যে তাঁরা নগরদ্বারে সুস্বন ভেরী তিনটিকে ভেঙে দিলেন, অভদ্রভাবে ছিনিয়ে নিলেন বিপণী থেকে পুষ্পমাল্য — এই ধরনের কলহকর্কশ উচ্ছৃঙ্খলতা কোনো বীরের যোগ্য কি হ'তে পারে কখনো? তাছাড়া, যে-কৃষ্ণ স্বল্পকাল পরেই প্রয়াসহীনভাবে শিশুপালের শিরশ্ছেদ করবেন, তিনি কি মগধরাজকে স্বহস্তে নিধন করতে পারতেন না — যাঁর হাতে সুদর্শন চক্র তাঁকে কেন মল্ল ভীমের সাহায্য নিতে হ'লো? আর যদি ভীমকে দিয়েই এই কার্যোদ্ধার তাঁর অভিপ্রেত ছিলো, তাহ'লে ঋজুভাবে যুদ্ধঘোষণার বাধা ছিলো কোথায়? কোনো উত্তর নেই — যদি না আমরা ধ'রে নিই এটা কৃষ্ণের এক খেয়ালমাত্র, অদিসেয়ুস-ধরনের কুটিল একটি কৌতুক; — যেমন অর্জুনের সঙ্গে ভগ্নীর বিবাহের ব্যাপারে তেমনি এখানেও একটি নাট্যানুষ্ঠান না-ক'রে তিনি পারলেন না।

তা, তিনি তো তাঁর নাটক দেখিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গেলেন (যাবার পথে জরাসন্ধের রথ অপহরণ ক'রে) ; কিন্তু আমাদের রসনায় লেগে রইলো এক তিক্তকটু আস্বাদ, অনুষ্ঠানটিকে এমন রুচিভ্রষ্ট ব'লে মনে হ'লো যে বন্দী রাজাদের মুক্তিলাভে মন খুলে আনন্দ করতেও পারলাম না। যিনি বধ্য ব'লে ঘোষিত এবং নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন, সেই জরাসন্ধ এখানে কৃষ্ণের চেয়ে শ্রদ্ধেয় হ'য়ে ওঠেন আমাদের চোখে, অনেক বেশি মর্যাদাবান ও উন্নতশির, অনেক বেশি রাজকীয় গুণে উজ্জ্বল[১১৯]।

'এই মহৎ সভায় একজন ভূপতিও নেই, কৃষ্ণ যাঁকে পরাস্ত না করেছেন।… জ্ঞানবৃদ্ধ মুনিদের মুখে বহুবার শুনেছি তিনি সর্বগুণাধার।… কৃষ্ণই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি ও সর্বভূতের অধীশ্বর। চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র পঞ্চভূত শুধু তাঁরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে' (সভা : ৩৭)। 'হে কেশব, তুমি সর্বভূতের আদি ও অন্ত, তুমি তপোনিধান ও নিত্যস্বরূপ। তুমিই নারায়ণ হরি ব্রহ্মা সোম সূর্য ধর্ম যম অনল রুদ্র কাল চরাচরগুরু ও স্রষ্টা' (বন : ১২)। 'হে মধুসূদন! তুমি সনাতন পুরুষ, তুমিই তাপসগণের একমাত্র গতি, তুমিই ধর্মাত্মা পুণ্যশালী রাজর্ষিদের একমাত্র আশ্রয়' (বন : ১২)। 'মহাত্মা বাসুদেব অপ্রমেয় … তিনি বৃহৎ, তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি অব্যয় ও অজ, তিনি ঐশ্বর্যবান ও সর্বভূতের পূরণকর্তা' (উদ্যোগ : ৬৯)। 'আমি সেই সনাতন ঋষি অনাদি অমধ্য অনন্ত কেশবের শরণাপন্ন হই' (উদ্যোগ : ৭০)। — শিশুপাল-বধের সময় থেকে উদ্যোগপর্ব পর্যন্ত এই ধরনের পরিস্ফীত কৃষ্ণ-স্তব মাঝে-মাঝেই শুনতে হয় আমাদের — ভীষ্মের মুখে, অর্জুন দ্রৌপদী সঞ্জয়ের মুখে, এমনকি একবার ধৃতরাষ্ট্রের মুখেও — প্রায় একই ভাষায়, একই ধরনের বিরাট বিশেষণে অলংকৃত ; — আমাদের মনে হয় যেন গ্যাস-ভর্তি বেলুনের ঝাঁক শূন্যে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে,

যেন অন্তঃসারহীন বাগাড়ম্বর খুব খানিকটা কলরোল তুলে মিলিয়ে গেলো। কেননা আমরা ভেবে পাই না এ-সবের কারণ কী হ'তে পারে, কৃষ্ণকে কোনো লোকোত্তর কর্ম করতে আমরা এখন পর্যন্ত দেখিনি; ভীষ্ম অর্জুন সঞ্জয় ইত্যাদিরা তাঁর দেবত্ব বিষয়ে কেমন ক'রে অবগত হলেন তাও আমাদের ধারণাতীত[১২০]। উদ্যোগপর্বে সন্ধিস্থাপনের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ এখন পর্যন্ত, কিন্তু সেখানে একজন তীক্ষ্ণধী কর্মিষ্ঠ পুরুষরূপেই আমরা দেখতে পেয়েছি তাঁকে — বুদ্ধিতে ও বাগ্মিতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক কূটনৈতিক, যিনি হয়তো পৃথিবীর সম্রাট হবার যোগ্য, কিন্তু ন্যায় অথবা নীতির দিক থেকে 'আদর্শ' যাঁকে বলা যায় না! তাই তাঁর পরমেশ্বর-প্রবাদ আমরা কানে শুনে যাই কিন্তু বিশ্বাস করি না, খ্রীষ্টীয় নববিধানোক্ত সংশয়ী থোমা-র মতো আমরাও প্রমাণ চাই; — কৃষ্ণ যে একবার এক কণা শাকান্ন দিয়ে দশ সহস্র শিষ্যসমেত দুর্বাসা মুনির উদরপূর্তি করিয়েছিলেন (বন: ২৬২), সেই ক্ষীণশ্রুত ঘটনাটুকু আমাদের প্রত্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট হয় না, আমরা চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই। আর সেই প্রমাণ আমাদের সামনে উপস্থিত হ'লো, আমাদের সমস্ত দেহ-মনকে অভিভূত ও প্রব্যথিত ক'রে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে, অকস্মাৎ। কে আছেন আমাদের মধ্যে, এই ঈশ্বরের গান শুনতে-শুনতে যিনি ঝড়ের ঝাপটে তরুশ্রেণীর মতো আন্দোলিত ও কম্পিত না হবেন; কে আছেন, যিনি নিখিল প্রাণীকুলকে কৃষ্ণের মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হ'তে দেখে — 'যেমন পৃথিবীর সব নদী সমুদ্রে লীন হ'য়ে যায়, যেমন পতঙ্গেরা মৃত্যুর জন্যই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে,' তেমনি সবেগে ও অনিবার্যভাবে প্রবিষ্ট হ'তে দেখে অর্জুনের মতোই ব'লে না-উঠবেন (গী: ১১: ২৮-২৯, ৪০) — 'আমি আপনাকে নমস্কার করি, আমি আপনাকে সম্মুখে ও পশ্চাতে ও সর্বদিকে নমস্কার

করি।'? কে আছেন, এর পরেও যাঁর অনাস্থার অস্থায়ী অপনোদন না হবে?

'অস্থায়ী' কথাটার উপর আমি একটু জোর দিতে চাই। কেননা, যারা ক্ষীণবল মানুষমাত্র সেই আমাদের পক্ষে শুধু নয়, ত্রিলোক- ও ত্রিকালব্যাপী ঈশ্বরের পক্ষেও (এই আখ্যা এতক্ষণে প্রামাণিক হ'য়ে উঠলো) অভিজ্ঞতাটি অস্থায়ী, এবং তাঁর এই দ্বিমুখিতার উপরেই কৃষ্ণের সব গভীর ও গভীরতর রহস্য প্রতিষ্ঠিত। গীতা বিষয়ে প্রথম কথা এই যে সেটি কোনো তৈরি-করা বক্তৃতা নয়, শান্ত ঔপনিষদিক অরণ্যচ্ছায়ায় উচ্চারিত ও শ্রুত কোনো সংলাপ নয় — মহাভারতের তুমুল ঘটনাবলীর বাষ্পচাপেই সব শঙ্খনাদ-ছাড়ানো এই আহ্বানধ্বনি উচ্ছ্রিত হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত আগেও কৃষ্ণ ভাবেননি তাঁকে এ-সব কথা বলতে হবে: বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের এক পুত্র, দৈবক্রমে বা আত্মীয়তানিবন্ধনে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন — এসেছিলেন শুধু অর্জুনের সারথি হ'য়েই রণক্ষেত্রে, কল্পনাও করেননি পাণ্ডবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীর যুদ্ধ শুরু হবার আগেই অকস্মাৎ মূর্ছিত হ'য়ে পড়বেন। অর্জুনকে জাগরিত করার দায়িত্ব তিনি যে সেই মুহূর্তেই নিজের উপর নিয়ে নিলেন, এতে বোঝা যায় কৃষ্ণের মধ্যেও উল্টো দিক থেকে পরিবর্তন ঘটছে; অর্জুনের আত্মবিস্মৃতির বিরুদ্ধে তাঁর আত্মচেতনা সহস্র দলে উন্মীলিত হ'লো। নয়তো, অর্জুনের কাতর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি প্রথমেই কেমন ক'রে বলতে পারলেন (গী: ২: ১১): 'কখনো আমি ছিলাম না এমন নয়, তুমি এবং এই রাজারা কখনো ছিলেন না এমন নয়, পরে আমরা কখনো থাকবো না এমনও নয়।'? কেমন ক'রে, কিছুক্ষণ পরেই, নিজের সঙ্গে অর্জুনের একটি স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে, অমোঘ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন (গী: ৪: ৫): 'তুমি আর আমি জন্ম-জন্মান্তর পেরিয়ে এসেছি;

আমি তা জানি কিন্তু তুমি জানো না।'? 'আমি মায়ার দ্বারা সৃষ্টি করি নিজেকে ··· আমি যুগে-যুগে অবতীর্ণ হই, যিনি আমাকে জানেন তিনি জন্ম থেকে নিষ্কৃতি পান ··· মানুষেরা যে যা-ই করুক আমারই পথ অনুসরণ করে' (গী : ৪ : ৬, ৮–৯, ১১)। — কী শুনছি আমরা, জরাসন্ধ-শিশুপালের হত্যাকারীর মুখ থেকে, যুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রণাসভার সমর্থতম বক্তার মুখ থেকে এ-সব কী অদ্ভুত কথা নিঃসৃত হচ্ছে ! মনে হয় যেন মরুদ্‌বর্গ তাকে ঊর্ধ্বলোকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছে, তাঁর সত্তার মধ্যে কোনো অচিন্তনীয় বিস্ফোরণ ঘটলো, কোনো-এক অতিমানবিক অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার দ্বারা তিনি অধিকৃত হয়েছেন ; তাই এত বড় একটা কথা বিশ্বাস করতে ও ঘোষণা করতে তাঁর বাধলো না যে তিনিই পরমেশ্বর — এবং অর্জুনের ও আমাদের মনেও অতি সহজে সেই বিশ্বাস সঞ্চারিত করলেন। এই আবেশেরই নাম প্রেমিকের ভাষায় উন্মাদনা, কবিরা একে প্রেরণা ব'লে থাকেন, আর ধর্মের ভাষায় একেই বলা হয় প্রত্যাদেশ।

কোথায় এই প্রেরণার উৎস, এই প্রশ্নটি আমাদের মনে জাগে। খ্রীষ্ট যখন দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত হন তখন তাঁর শিষ্যেরা ছিলেন ঘুমিয়ে (লুক : ৯ : ২৮–৩২) ; গেৎশিমানির জলপাই-উদ্যানে তাঁর পরম প্রার্থনা ও যন্ত্রণাভোগের সময়েও, তাঁর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, শিষ্যেরা তন্দ্রাবেশ কাটিয়ে জেগে থাকতে পারেননি (মার্ক : ১৪ : ৩২–৪১)। এই দুই ঘটনায় বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যীশুর ঐশী মহিমা তাঁরই নিজের তপস্যাবলে লব্ধ হয়েছিলো — তাঁর মর্ত্যরূপ থেকে অমৃতরূপে পৌঁছবার জন্য কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন তাঁর ছিলো না। এবং শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান — মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরপুত্রের ব্যবধান — ছিলো অসেতুসম্ভব। কিন্তু গীতার কৃষ্ণ অর্জুনের উপর নির্ভরশীল ; ভক্তের দর্পণে নিজেকে অবলোকন করতে-করতেই তিনি হ'য়ে উঠলেন —

তাঁকে হ'তে হ'লো — সংশয়াতীতভাবে ভগবান; এমনও বলা যায় যে অর্জুনের এই অবসাদ কবি-কৃত একটি কৌশলমাত্র, যাতে কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে উপনিষদের অবাচ্য ব্রহ্ম অবশেষে মূর্ত, শ্রুত ও প্রকাশিত হ'তে পারেন। যে-কারণে বিশ্বের প্রয়োজন ছিলো সেই প্রথম নারীর, যাকে এক-ব্রহ্মা তাঁর নিজের দেহ থেকে উৎপন্ন করেছিলেন, সেই কারণেই কৃষ্ণের পক্ষে অর্জুন অপরিহার্য; এখানে অর্জুনই সেই দ্বিতীয়, সেই উপায়, সেই আধার, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে দেখতে পাবেন ও জ্ঞাত হবেন, এবং পারবেন নিজের স্বাদগ্রহণ করতে, এবং সেই স্বাদগ্রহণের পুলকে নিজেকে অনন্ত ও শাশ্বত ব'লে অনুভব করবেন। তাঁর বিশ্বরূপ দেখার অধিকার — যা তিনি অন্য কাউকে দেননি [১২১] — তা অর্জুনকে দান ক'রে তিনি মুহূর্তের জন্য মানুষকে টেনে তুললেন ঈশ্বরের প্রায় সমস্তরে, অর্জুনের বিশেষ কোনো যোগ্যতা ছিলো ব'লে নয় — তাঁর নিজেরই প্রয়োজনে। অর্জুন এখানে বৃত, বরণকারী নন; শুধু বিষয়, বিষয়ী নন; শুধু গ্রহীতা, দাতা নন — কিংবা যদি বা বিনিময়ে কিছু দানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন তা কৃষ্ণই সঞ্চারিত করেছেন তাঁর মধ্যে। গীতার গূঢ়তম ও চতুরতম শিক্ষা এই যে মানুষের জীবনে ঈশ্বরের যেটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় ঈশ্বরের পক্ষে মানুষ।

কিন্তু যে-মুহূর্তে অর্জুন বললেন, 'করিষ্যে বচনং তব,' তখনই এই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলো, কৃষ্ণ তাঁর মরত্বে প্রত্যাবৃত্ত হলেন। মহাভারতের সংলগ্নতায় এটা অনিবার্য ছিলো — কেননা তা না-হ'লে জীবনের স্রোত রুদ্ধ হ'য়ে যায়, ইতিহাস অসম্পন্ন থাকে, ভবিষ্যৎকে বিনষ্ট করা হয়। এবং এও আমরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝি যে নিজেকে নিরন্তর ঈশ্বর ব'লে অনুভব করলে মানুষের মধ্যে মানুষিকভাবে জীবনযাপন আর সম্ভব হয় না। সেটি কৃষ্ণের অভিপ্রেত নয়; তিনি

নাট্যামোদী, তিনি পরিহাসরসিক — পৃথিবীর মঞ্চে যে-ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ, সেটি শেষ পর্যন্ত সম্পাদন করবেন তিনি, তাঁর নিজের কোনো কর্ম করার প্রয়োজন না-থাকলেও স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হবেন কর্মজালে। তাই, যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি ভুলে গেলেন তাঁর ঈশ্বরত্ব, অর্জুন এবং আমরাও তা ভুলে গেলাম — অতি মধুর এই বিস্মৃতি, এই করুণাশীল অজ্ঞানতার জন্যই মহাভারতের ঘটনাগুলিকে এত বাস্তব ও এত স্বাভাবিক ব'লে মনে হয় আমাদের। গীতায় কৃষ্ণের মুখে শুনেছিলাম, 'আমি জানি কিন্তু তোমার তা মনে নেই' — কিন্তু অনুগীতা-অধ্যায়ে এসে দেখলাম, শুধু যে অর্জুন সব ভুলে গিয়েছেন তা নয়, কৃষ্ণও আর মনে করতে পারছেন না ভীষ্মপর্বে অর্জুনকে তিনি কী বলেছিলেন। এতেও আমদের মন সম্মতি জানায়, কেননা আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে মানুষের জীবনে এই রকমই ঘ'টে থাকে, এবং কৃষ্ণ এখন আমাদের চোখে একজন মানুষমাত্র — অসাধারণ মানুষ তা সত্য, কিন্তু ইতিহাস-শ্রুত অন্য অনেক অসাধারণের মতোই স্খলনপ্রবণ — অন্তত পূণ্যপ্রভ বা শুদ্ধশীল তাঁকে বলা যায় না — কেননা যুদ্ধকালীন নিকৃষ্টতম কর্মগুলি তাঁরই দ্বারা সাধিত বা প্ররোচিত হয়েছিলো।

১১৬। দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥

(আদি : ১ : ১১০-১১১)

—'দুর্যোধন এক ক্রোধময় মহাবৃক্ষ; তার স্কন্ধ কর্ণ, শাখাসমূহ শকুনি,

দুঃশাসন পরিপুষ্ট পুষ্পফল, আর অমনীষী (নির্বোধ) রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার মূল।

'যুধিষ্ঠির এক ধর্মময় মহাবৃক্ষ, তার স্কন্ধ অর্জুন, ভীম শাখাসমূহ, মাদ্রীপুত্রদ্বয় পরিপুষ্ট পুষ্পফল, আর কৃষ্ণরূপী ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণেরা তার মূল।'

১১৭। ইনফের্নো : ৪। এই প্রাসাদটি জ্ঞানচর্চার একটি প্রতীক, এ-রকম অর্থ কেউ-কেউ ক'রে থাকেন।

১১৮। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। সমুদ্রমন্থনের পরে দেবাসুরের ভীষণ সংগ্রামের সময় নর ও নারায়ণ অজেয় যোদ্ধারূপে আবির্ভূত হলেন (আদি : ১৯); এবং শান্তি : ৩৩৫ অনুসারে সত্যযুগে কোনো-এক অস্পষ্ট 'সনাতন নারায়ণ' নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ-রূপে চার ভিন্ন-ভিন্ন অংশে অবতীর্ণ হন। খাণ্ডবদাহনের প্রাক্কালে ব্রহ্মা অগ্নিকে বললেন যে 'আদিদেব' নর ও নারায়ণ অর্জুন ও কৃষ্ণের রূপে মর্ত্যলোকে বিরাজমান (আদি : ২২৪); আদি : ২২৮-এ যুদ্ধপরায়ণ ইন্দ্রের উদ্দেশে দৈববাণী হ'লো যে নর ও নারায়ণ নামক 'পুরাণ মহর্ষিদ্বয়' সম্প্রতি অর্জুন ও কৃষ্ণ নামে আবির্ভূত হয়েছেন। আবার, বন : ১২-তে আমরা কৃষ্ণের স্বমুখে শুনলাম যে তিনি নারায়ণ ও অর্জুন নর, এবং তাঁরা অভিন্নাত্মা। তবু, এতবার শুনেও কথাটা আমরা মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারি না—অর্জুনকে একজন 'মহর্ষি'-রূপে কল্পনা করতেও আমাদের হাসি পায়, আর কৃষ্ণের মধ্যেও ঋষিত্ব বা দেবত্বের লক্ষণ দেখা যায় শুধু কালেভদ্রে।

'নারায়ণ' শব্দের গূঢ় অর্থটি কৃষ্ণ নিজেই প্রকাশ করেছেন (বন : ১৮৯): 'আমিই পূর্বে জলের নাম "নার" দিয়েছিলাম, জলসমূহ আমার অয়ন (আশ্রয়) ব'লে আমি নারায়ণ নামে উক্ত হ'য়ে থাকি।' (সংস্কৃত শব্দটি বহুবচনে আছে—'নারাঃ'—তাই 'জলসমূহ' বলা হ'লো।) মনু : ১ : ১০ ও বিষ্ণু : ১ : ৪ : ৬-এও এই ব্যুৎপত্তি নির্দিষ্ট হয়েছে—শ্লোক দুটি প্রায় আক্ষরিকভাবে এক। কিন্তু যে-পুরুষ প্রলয়ের জলে ভাসমান থাকেন, যাঁর চিত্তহারী বর্ণনা আমরা বনপর্বে মার্কণ্ডেয় মুনির মুখে শুনেছিলাম, তাঁর সঙ্গে মহাভারতীয় কৃষ্ণের—এবং বিশেষত গীতার কৃষ্ণের আত্মিক সম্বন্ধ খুব স্পষ্ট হ'লেও চিত্ররূপগত সাদৃশ্য প্রায় কিছুই নেই, এবং যেটুকু বা আছে তাও চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রধারণের মতো গৌণ লক্ষণেই আবদ্ধ। স্মর্তব্য, বেদে বিষ্ণু কোনো

প্রধান দেবতা নন — দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ও ইন্দ্রের এক সহায়কারী মাত্র; আর গীতায় কৃষ্ণ নিজেকে বিষ্ণু বলছেন ঠিক সেই অর্থেই — 'আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু' (১০ : ২১)। বিশ্বরূপদর্শনের সময় অর্জুন যে কৃষ্ণকে দু-বার 'বিষ্ণু' ব'লে সম্বোধন করলেন (১১ : ২৪, ৩০), তাও খুব সম্ভব 'সর্বব্যাপী' অর্থে, কেননা কৃষ্ণের মধ্যে সর্বদেবতার সমাবেশ তিনি সেই মুহূর্তেই প্রত্যক্ষ করেছেন। পৌরাণিক বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণের যে-সমীকরণে আমরা অভ্যস্ত, তা গীতা-গ্রন্থের মধ্যে সাধিত হয়নি; আর মহাভারতের অধিকাংশ স্থলে তিনি এমন সর্বাঙ্গীণভাবে মানুষ যে তাঁর উপর চতুর্ভুজের আরোপণও আমাদের অলীক ব'লে মনে হয়।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে 'নার' শব্দের অভিধানগত প্রাথমিক অর্থ নর-সম্বন্ধীয়, মনিয়র-উইলিয়মস 'নারায়ণ'-এর অর্থ করেছেন আদিমানব— এমন অনুমান করলে অন্যায় হয় না যে বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্যই পূর্বোল্লিখিত ব্যুৎপত্তিটি উদ্ভাবিত হয়েছিলো। মনুর বচনেও এই ভাবটি নিহিত আছে: 'আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ—জলসমূহ "নারা" নামে কথিত হয়, [কেননা] জলসমূহ নরের অপত্য।' প্রশ্ন ওঠে: 'নর' তাহ'লে কী অথবা কে? হরিচরণ 'নর' শব্দের প্রথম অর্থ দিয়েছেন মানুষ অথবা পুরুষ নয় — নায়ক; জ্ঞানেন্দ্রমোহন কর্তৃক উদ্ধৃত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মত অনুসারে ('নারী' দ্র) বেদের প্রাচীনতম অংশে 'নর' শব্দ পাওয়া যায় না, এবং 'নারী'ও তার স্ত্রীলিঙ্গ রূপ নয়। 'নারী'র আদি অর্থ যেহেতু নেত্রী, তাই 'নর' (নায়ক) শব্দকে তারই পুংলিঙ্গ প্রকরণ ব'লে ধ'রে নেবার বাধা নেই। কবে রাষ্ট্র হ'লো এই প্রবচন যে নর ও নারায়ণ সত্যযুগে ধর্মের পত্নী মূর্তির (বা অহিংসার) গর্ভে জন্মেছিলেন, আর কেমন ক'রেই বা নর-নারায়ণ সংযুক্ত হ'য়ে এক গভীর অর্থ ধারণ করলো, সেই ইতিহাস অতীতের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে; তবে পুরাণ-কথা অনুধাবন করলে মনে হয় যে 'নর' ও 'নারায়ণ' প্রথমে ছিলো দুটি নাম-শব্দ, দূরশ্রুত আদিম দুই পুরুষের নাম; অর্জুন ও কৃষ্ণের সঙ্গে এঁদের শনাক্তীকরণ পরবর্তী ঘটনা, মহাভারতীয় কাহিনীর মধ্যে যার সত্যিকার কোনো তাৎপর্য নেই।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'এসেজ অন দি গীতা'য় (পৃ ১১, ১৬) 'নর-নারায়ণ'কে বলেছেন জীবাত্মা ও পরমাত্মার চিত্রকল্প, উপনিষদের দুই পাখির সঙ্গে

তুলনাও করেছেন। তাত্ত্বিক দিক থেকে এটা মেনে নেয়া যেতে পারে; কিন্তু লক্ষণীয়, গীতায় এর কোনো ব্যবহার নেই; কৃষ্ণ নিজেকে একবারও অভিহিত করেননি 'নারায়ণ' ব'লে, সঞ্জয়ের উল্লেখে বা অর্জুনের সম্বোধনেও 'নারায়ণ' শব্দ পাওয়া যায় না, অথবা কোনো পরোক্ষ ইঙ্গিতেও অর্জুনকে কোনো 'নরে'র সঙ্গে শনাক্ত করা হয়নি।

১১৯। যেমন অধ্যাত্ম-রামায়ণে ও তুলসীদাসে রামচন্দ্র, তেমনি ভাগবত-পুরাণেও কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান ছাড়া আর-কিছু নন; কিন্তু তবু — হয়তো কবির অনভিপ্রেতভাবে — সেখানে জরাসন্ধের কৌলীন্য আরো দীপ্তিশালী, এবং কৃষ্ণের শাঠ্য কৃষ্ণতর বর্ণে প্রস্ফুট হয়েছে (১০ : ৭২)। তিন ছদ্মবেশী অতিথির কিণাঙ্কচিহ্নিত বাহু দেখে জরাসন্ধ তাঁদের ক্ষত্রিয় এবং পূর্বদৃষ্ট ব'লে চিনতে পারলেন, এবং মুহূর্তকালমাত্র চিন্তা ক'রে বললেন, 'হে বিপ্রগণ, আপনারা যথেচ্ছ প্রার্থনা করুন, আমার মস্তক আপনাদের ঈপ্সিত হ'লে আমি তাও দান করবো।' কৃষ্ণের উত্তর: 'আমরা ক্ষত্রিয় — যুদ্ধ প্রার্থনা করি, অন্য কিছু নয়।' শুনে সশব্দে হেসে উঠলেন জরাসন্ধ: 'কৃষ্ণ, তুমি ভীরু, তুমি নিজ ভূমি ছেড়ে সমুদ্রতটে আশ্রয় নিয়েছো — তোমার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো কী! আর এই অর্জুনও আমার বয়সে ছোটো, আমার তুল্য বলবানও নয় — শুধু ভীমসেনই আমার যোগ্য!' এই ব'লে ভীমের হাতে নিজে একটি 'মহতী গদা' অর্পণ করলেন তিনি।

যখন দেখা গেলো এই দ্বৈতযুদ্ধ ঋজুভাবে চললে ভীমের জয়ের কোনো আশা নেই, তখন কৃষ্ণ একটি গাছের কাণ্ড বিদীর্ণ ক'রে ইঙ্গিত করলেন ভীমকে, আর ভীম মুহূর্তকাল বিলম্ব না-ক'রে মগধরাজের সন্ধিযুক্ত দেহকে বিশ্লিষ্ট ক'রে ফেললেন। স্মর্তব্য, ভীমের দ্বারা দুর্যোধনবধও সম্ভব হয়েছিলো কৃষ্ণের ঠিক এমনি একটি অন্যায় আচরণের জন্য (শল্য : ৫৯ দ্র)। ভাগবতে তবু নির্বাক ইঙ্গিতমাত্র আছে, কিন্তু শল্যপর্বে কৃষ্ণ একটি আঠারো-শ্লোক-ব্যাপী উপদেশ শোনালেন অর্জুনকে, যার সার কথা হ'লো — 'ভীমসেনস্তু ধর্মেণ যুধ্যমানো ন জেষ্যতি। অন্যায়েন তু যুধ্যন্ বৈ হন্যাদেব সুযোধনম্ ॥ — ভীমসেন ন্যায়যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারবেন না, অন্যায় যুদ্ধেই দুর্যোধনকে সংহার করতে হবে।'

মহাভারত অনুসারে জরাসন্ধ ও ভীম বিনা ভোজনে ও বিনা বিশ্রামে

একটানা তেরো দিন ধ'রে যুদ্ধ করেন, এবং পরিশ্রান্ত হন জরাসন্ধই প্রথম। শ্রান্ত শত্রুকে আঘাত করতে নেই — এই ক্ষাত্রনীতিটি কৃষ্ণচালিত পাণ্ডবেরা তিনবার লঙ্ঘন করেছিলেন : জরাসন্ধ-, কর্ণ-, ও দুর্যোধনবধের সময়ে। পক্ষান্তরে, জরাসন্ধ ও দুর্যোধন দু জনেই দ্বৈত যুদ্ধে আহূত হ'য়ে সবচেয়ে বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেছে নেন।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন জরাসন্ধ বিষয়ে সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন—'বৃহৎ বঙ্গ', খণ্ড : ১, পরি : ৬ দ্র।

১২০। না কি এই মহত্ত্ব সেই অন্য কৃষ্ণের, যিনি রাখাল হ'য়ে বনে-বনে বাঁশি বাজাতেন? জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর; এখানে মহাভারতের সঙ্গে ভাগবত ও হরিবংশের একটি যোগসূত্র দেখতে পাই; শিশুপালের কৃষ্ণবিরোধী ভাষণেও (সভা : ৪০) হরিবংশে বর্ণিত কোনো-কোনো ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু তা থেকে আমরা ধ'রে নিতে পারি না যে গোপাল-কৃষ্ণের কীর্তিকথার সঙ্গে ভীষ্ম ইত্যাদিরা পরিচিত ছিলেন। বস্তুত, গোবর্ধনধারী কালীয়দমনকারী বালক-দেবতাটির বিষয়ে তাঁদের কারো মুখে একটি কথাও শোনা যায় না; যে-গীতা এখনো উদগীত হয়নি তারই অগ্রিম প্রতিধ্বনি তাঁরা ক'রে যাচ্ছেন। এই দুই কৃষ্ণ পুরাতত্ত্ববিদের চোখে অভিন্ন হোন বা না-ই হোন, রসজ্ঞ পাঠকের কাছে এঁরা নির্ভুলভাবে দুই স্বতন্ত্র পুরুষ, এবং সে-ভাবে এঁদের গ্রহণ করলে আমরা উভয়েরই প্রতি সুবিচার করবো। যে-অজ্ঞাতনামা সম্পাদক মহাভারত ও হরিবংশকে বিশ্লিষ্ট করেন, তিনি বোদ্ধা এবং রুচিবান ছিলেন সন্দেহ নেই।

আমি এ বিষয়ে অবহিত আছি যে মহাভারতের সব প্রকরণে এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়নি। আর্যশাস্ত্র-সংস্করণের সম্পাদক দক্ষিণভারতীয় লেখক থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন : সভাপর্বে শিশুপালবধের পূর্বক্ষণে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে শোনাচ্ছেন কৃষ্ণের (বিষ্ণুর) মহিমা—কিঞ্চিদধিক সাতশো শ্লোক জুড়ে, একেবারে সৃষ্টিকাণ্ড থেকে শুরু ক'রে দশাবতার বর্ণন ও বৈষ্ণব কৃষ্ণের জীবনী পেরিয়ে, দ্বারকা-নিমজ্জনের ভবিষ্যদ্বাণী পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় প্রকরণগুলিতে এই অংশটি নেই; আর্যশাস্ত্রেও এটি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত আছে। আমার এই আলোচনা সর্বত্রই বঙ্গীয়-প্রকরণ-নির্ভর।

১২১। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি স্মর্তব্য :

মযা প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥

(গী : ১১ : ৪৭-৪৮)

—'হে অর্জুন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে স্বীয় সামর্থ্যে তোমাকে এই তেজোময় অনাদ্যন্ত পরম বিশ্বরূপ দেখালাম ; পূর্বে এটি অন্য কারো দ্বারা দৃষ্ট হয়নি।

'দানের দ্বারা, বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা, ধর্মাচরণ বা উগ্র তপস্যার দ্বারা আমার এই রূপ নরলোকে কেউ দেখতে পায় না। কুরুশ্রেষ্ঠ, শুধু তুমিই দেখলে।'

অতি স্পষ্ট উক্তি, কিন্তু দুঃখের বিষয় মহাভারতীয় পুঁথির মধ্যে এর সমর্থন নেই — সেই পুনরুক্তি-নির্ভীক সমবায়-নির্মিত বিরাট কলেবরে ঘটনাটি আরো কয়েকবার গ্রথিত হয়েছে, গীতাকথনের পরে, এবং পূর্বেও। তপস্যার দ্বারা, প্রশস্তিকথনের পুরস্কারস্বরূপ, নারদ একবার শ্বেতদ্বীপে গিয়ে বিশ্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন (শান্তি : ৩৪০) — তখন সময়টা ছিলো সত্যযুগ, কুরুক্ষেত্রের বহু, বহু পূর্বে — সেখানেও দৃষ্ট পুরুষটি 'সহস্র হস্তপদনয়ন- ও শতমস্তকধারী'। উদ্যোগ : ১২৯-এ, দুর্যোধন যখন কৃষ্ণকে বন্দী করতে সচেষ্ট তখনও কৃষ্ণ বিশ্বরূপে প্রকাশিত হন, তা দেখার জন্য দিব্যদৃষ্টি দেন ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সঞ্জয় ও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে — অন্যেরা সেই ভীষণ মূর্তির সামনে চোখ বুজে ফেলেছিলেন। আরো একবার, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পরে কৃষ্ণ যখন হস্তিনা ছেড়ে দ্বারকার পথে যাত্রী (আশ্ব : ৫৫), তখন কোনো-এক মহর্ষি উতঙ্ক বা উতঙ্ককে (অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে উল্লিখিত উতঙ্ক নন) তিনি হঠাৎ বিশ্বরূপ দেখিয়ে দিলেন — এক

মহান উন্মোচন প্রায় ভেল্কির স্তরে নেমে এলো। বঙ্কিমচন্দ্র এই পুনরুক্তি-গুলির তীব্র সমালোচনা করেছেন ('কৃষ্ণচরিত্র' : ৫ : ৭ ও ৬ : ১২), এবং যে-কোনো সংবেদনশীল পাঠকের পক্ষেই বিশ্বরূপের এই বহুলীকরণ পীড়া-দায়ক — কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আমাদের ভাবনায় ও কল্পনায় গীতার একাদশ অধ্যায়টি অনন্য থেকে যায়, অন্যগুলিকে চোখ দিয়ে পড়লেও আমরা মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারি না।

পূর্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে উপনিষদের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট :

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্‌॥
(কঠ : ১ : ২ : ২৩ ও মুণ্ডক : ২ : ৩)

—'মেধা, অধ্যয়ন বা বহু [শাস্ত্র] শ্রবণের দ্বারা এই আত্মা লভ্য নন। ইনি যাকে বরণ করেন সে-ই [শুধু] জানতে পায়; তারই কাছে ইনি পরম রূপে প্রকাশিত হন।'

গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে মার্কণ্ডেয়-দৃষ্ট বিশ্বরূপের উল্লেখ করেছি (টী : ১৩ দ্র); কিন্তু সেই ঘটনার স্থান, কাল, প্রকরণ, ও চিত্রকল্প সবই ভিন্ন ব'লে গীতার উক্তিকে তা খণ্ডন করে না।

২০ : বৃদ্ধ কাণ্ডারী

'হে মৃত্যু, বৃদ্ধ কাণ্ডারী, সময় হ'লো।'
— শার্ল বোদলেয়ার : "ভ্রমণ"

কোনো পাঠককে কি মনে করিয়ে দিতে হবে কৃষ্ণ কতবার সত্যভঙ্গ করেছিলেন, কত অকথ্য অন্যায়ের তিনি অনুষ্ঠাতা? কৌরবপক্ষের

একটিমাত্র সামরিক কলঙ্ক অভিমন্যুবধ, আর অপ্রধান শল্য ছাড়া প্রতিটি কুরুপক্ষীয় বীরকে পাণ্ডবেরা নিপাতিত করেন অন্যায় উপায়ে, কৃষ্ণের সাহায্যে। যখন যুদ্ধের গুরুগুরু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে তখন থেকেই আমরা কৃষ্ণকে দেখি এমন একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ, যা পরিকল্পিতভাবে কুটিল। উদ্যোগপর্বের প্রারম্ভে তিনি বললেন পাণ্ডব-কৌরবের সঙ্গে তাঁর সমান সম্বন্ধ (অ: ৪), কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই, যখন দুর্যোধন ও অর্জুন এলেন একই সময়ে তাঁর সাহায্য চাইতে, তাঁর ব্যবহারে স্পষ্ট ফুটলো অসাম্য (অ: ৬) — লৌকিক স্তরে কৃষ্ণের 'কপট নিদ্রা' নামে আখ্যাত এই ঘটনাটি আশা করি সব পাঠকেরই মনে পড়বে। আর তারপর, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ামাত্র এই নিরপেক্ষতার ভানটুকুও আর রইলো না: কী বাক্যে, কী আচরণে, কী চিন্তায়, কৃষ্ণ হ'য়ে উঠলেন তর্কাতীতভাবে পাণ্ডবদের এবং বিশেষত অর্জুনের সাহায্যকারী, তর্কাতীতভাবে কৌরবঘাতক ও পাণ্ডবদের রক্ষাকর্তা[১২২]। তিনি থাকবেন নিরস্ত্র ও অযুধ্যমান, এই প্রতিশ্রুতিও ভীষ্মের বাণে আচম্বিতে চূর্ণ হ'য়ে গেলো: যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেই, পিতামহের প্রচণ্ড তেজে পাণ্ডবচমূ যখন দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, আর সাত্যকির উত্তেজনা সত্ত্বেও অর্জুনকে দেখা গেলো প্রণম্যকে প্রহার করতে অনিচ্ছুক, তখন কৃষ্ণ — অর্জুনাদির প্রীতিসাধনের জন্য[১২৩] — নিজেই কৌরব-নিধনে কৃতসংকল্প হ'য়ে লাফিয়ে পড়লেন রথ থেকে, সুদর্শনচক্র হাতে নিয়ে ভীষ্মের দিকে ছুটে গেলেন 'জীবধ্বংসী ধূমকেতুর মতো' (ভীষ্ম: ৫৯)। ভীষ্ম জানালেন মধুর স্বরে তাঁকে অভ্যর্থনা, আর অর্জুন ব্যাকুলভাবে তাঁর পায়ে লুটিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। ভীষ্ম: ১০৭-এ আবার এই একই ঘটনা — 'রোষতাম্রচক্ষু' বাসুদেব ভীষ্মকে কশাঘাত করতে উদ্যত হলেন, এবারেও অর্জুন তাঁর পা জড়িয়ে ধ'রে বললেন, 'কেশব, আপনার সত্যভঙ্গ করবেন না, লোকেরা যেন

আপনাকে মিথ্যাবাদী না বলে।' অস্ত্র শুধু উত্তোলিত হয়েছিলো, প্রযুক্ত হয়নি — এতে অবশ্য প্রমাণ হয় না যে কৃষ্ণ তাঁর সত্যরক্ষা করেছিলেন। কেননা তাঁর হননেচ্ছা এখানে জাজ্বল্যমান ; যুধিষ্ঠিরকে এমন কথা বলতেও তাঁব বাধেনি যে অর্জুন পরাঙ্মুখ হ'লে তিনি একাই মহাস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে বধ করবেন কুরুবৃদ্ধকে, দেখিযে দেবেন যুদ্ধে তাঁর বিক্রম কেমন ইন্দ্রতুল্য (ভীষ্ম : ১০৮)! তাছাড়া অবশ্য বুদ্ধিও এক অস্ত্র — শরাগ্র বা খড়্গের চেয়ে কিছুমাত্র কম তীক্ষ্ণ নয় — এবং সেই নিপটতম অস্ত্র নিয়ে কৃষ্ণ ছিলেন সর্বদাই প্রস্তুত। অন্য কারো মাথায় এই কথাটা খেলেনি যে ভীষ্মবধের উপায় ভীষ্মেরই কাছে জেনে নিতে হবে — এই অদ্ভুত ও অভ্রান্ত পরামর্শটি কৃষ্ণই দিয়েছিলেন (ভীষ্ম : ১০৮)। অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ রটনার ব্যাপারে তিনিই উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা — যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে মিথ্যা বলাবার জন্য সর্বশেষ যে-যুক্তিটি তিনি উপস্থিত করলেন, ধর্মনীতি ও যুদ্ধনীতির আদর্শে তার চেয়ে গর্হিত কিছু হ'তে পারে না[১২৪]। কৌরবপক্ষের প্রতিটি প্রধান বীর হত হলেন যুদ্ধে, আর লক্ষ শরে জর্জর হ'য়েও অর্জুন রইলেন অটুট — কৃষ্ণের অনৃতাচার ছাড়া এই অস্বাভাবিক ঘটনার আর-কোনো ব্যাখ্যা নেই। ভগদত্তের অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্রে অর্জুনের মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত ছিলো, কিন্তু কৃষ্ণ সেটি নিজে বুক পেতে প্রতিহত করলেন (দ্রোণ : ২৯) :— আরো একবার অর্জুন তাঁকে 'ক্লিষ্ট চিত্তে' স্মরণ করিয়ে দিলেন যে এর দ্বারা তাঁর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'লো। ইন্দ্র-দত্ত যে-শক্তি-অস্ত্রটি কর্ণ বহুযত্নে অর্জুনবধের জন্য সঞ্চিত রেখেছিলেন, কৃষ্ণের চাতুরীর ফলে তা অপব্যয়িত হ'লো ঘটোৎকচের উপর (দ্রোণ : ১৭৪, ১৮০); আর তবু, ঐ দিব্যাস্ত্র ব্যতিরেকেও কর্ণকে অজেয় জেনে তিনি তখনই অর্জুনকে ব'লে দিলেন কোন কৌশলে সূতপুত্রকে বধ করতে হবে (দ্রোণ : ১৮১)। অর্জুনের প্রতি তিনি যত স্নেহশীল, কৌরবপক্ষীয়দের প্রতি ততই

তিনি নিষ্ঠুর, এই কথাটা যুদ্ধপর্বগুলির পাতায়-পাতায় অনপনেয় রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। মনে করা যাক সেই মুহূর্তটি, ভূরিশ্রবার সঙ্গে দৈতযুদ্ধে সাত্যকি যখন পরাস্তপ্রায়, আর অর্জুন — ভূরিশ্রবার রণদক্ষতাকে মনে-মনে বহু সাধুবাদ জানিয়েও — অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত বীরের বাহু অতর্কিতে ছিন্ন ক'রে দিলেন: এই ক্ষাত্রনীতিবিরোধী কদাচার কৃষ্ণের নির্দেশেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো[১২৫]। কেউ এতে আহ্লাদিত হ'তে পারেনি — কবি আমাদের জানিয়েছেন যে 'সমুদয় সৈন্যগণ' কৃষ্ণ-অর্জুনের নিন্দা ও ভূরিশ্রবার প্রশংসা করেছিলো (দ্রোণ: ১৪২-৪৩)। জয়দ্রথবধের ব্যাপারে কৃষ্ণের ভূমিকা আরো সক্রিয়: অর্জুনের শপথ ছিলো সূর্যাস্তের পূর্বে এই কর্ম সম্পাদন করবেন, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাপূরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'তো না যদি-না কৃষ্ণ মায়াবলে ঢেকে দিতেন সূর্যকে, আর সূর্য অস্ত গেছে ভেবে কৌরবদের সতর্কতা হ'তো শিথিল। কিন্তু অভিমন্যু-হন্তা জয়দ্রথের মৃত্যুতেই এই ঘটনার সমাপ্তি হ'লো না, তাঁর নিরপরাধ ও ধ্যানাসীন পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও শতধা দীর্ণ ক'রে দিলেন অর্জুন — তাও কৃষ্ণের পরামর্শে (দ্রোণ: ১৪৬)। কর্ণ-অর্জুনের শেষ দ্বৈতযুদ্ধকালে কর্ণ একটি আশাতীত মিত্র পেয়েছিলেন: তাঁর একতূণীরশায়ী জ্বালামুখী বাণের মধ্যে, অর্জুনের উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য[১২৬], প্রবিষ্ট হয়েছিলেন দারুণ সর্প অশ্বসেন: কিন্তু অস্ত্রটি যখন দিঙ্‌মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত ক'রে শূন্যে উঠে অর্জুনের প্রতি কালান্তকভাবে অবরোহমাণ, ঠিক তখনই রথটিকে নমিত ক'রে দিয়ে কৃষ্ণ সেই বলীয়ান বাণ ব্যর্থ ক'রে দিলেন। এটাকে বলা যায় না সারথ্যবিদ্যায় তাঁর দক্ষতার নিদর্শনমাত্র, কেননা আমরা অনেক আগেই জেনে গিয়েছি যে অর্জুনের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীর অপসারণে তিনি বদ্ধপরিকর, আর তার জন্য যে-কোনো উপায়

অবলম্বনে তিনি প্রস্তুত। তখন কর্ণের রথের চাকা মাটিতে ডুবে যাচ্ছে, রথের পুনরুদ্ধার-চেষ্টায় তিনি ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত, মুহূর্তকাল বিরতির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন অর্জুনকে (কর্ণ : ৯১) — অর্জুন স্ববশে থাকলে নিশ্চয়ই তাতে সম্মত হতেন, কিন্তু কৃষ্ণের আজ্ঞা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হ'লো : 'অর্জুন, অস্ত্র হানো ! এই তোমার সুযোগ !' 'গৃহস্থ যেমন অতি কষ্টে ধনে-রত্নে পূর্ণ গৃহ ছেড়ে চ'লে যায়', তেমনি যখন কর্ণের মস্তক তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে 'শরতের আকাশ থেকে স্খলিত সূর্যের মতো' মাটিতে প'ড়ে গেলো (কর্ণ : ৯২), আমরা তখন অনুভব করলাম এটা যুদ্ধে শত্রুবধের কোনো ব্যাপার নয়, বিশুদ্ধ একটি নরহত্যা, কোনো আততায়ীর[১২৭] অনুষ্ঠিত পাপকর্ম। আর দুর্যোধন — তিনি ছিলেন কর্ণের চেয়েও আরো বেশি অবসন্ন, ছিলেন বিক্ষত ও নিঃসহায় ও বিশ্রামপ্রার্থী, যখন কৃষ্ণ-সনাথ পাণ্ডবেরা বাক্যবাণে বিদ্ধ ক'রে-ক'রে তাঁকে দ্বৈপায়ন হ্রদের আশ্রয় থেকে টেনে তুললেন (শল্য : ৩২-৩৩)। পরবর্তী বৃত্তান্তটি প'ড়ে বোঝা যায় ভীম সরল যুদ্ধ ক'রে যাচ্ছিলেন, উরুভঙ্গ-সম্পৃক্ত প্রতিজ্ঞা তাঁর স্মরণে ছিলো না, অন্য কোনো পাণ্ডবেরও তা মনে পড়েনি ; কিন্তু যথাকালে যথোচিত মন্ত্রণা দিতে কৃষ্ণের ভুল হ'লো না। ন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনকে হারানো যাবে না বুঝে, তিনি অর্জুনকে উরুভঙ্গের কথা মনে করিয়ে দিলেন, আর অর্জুন তা শোনামাত্র নিজের উরুতে চপেটাঘাত ক'রে সংকেত জানালেন ভীমসেনকে (শল্য : ৫৯)। আর এমনি ক'রে, কৃষ্ণ-কৃত অপরাধপুঞ্জের শিখরদেশে, পাণ্ডবেরা তাঁদের হৃত রাজ্য ফিরে পেলেন — মুমূর্ষু দুর্যোধনের ভাষায় 'নিহতসংকল্প ও শোকার্তভাবে (শল্য : ৬২) ; — এমন নিরানন্দ ও ব্যর্থ রাজ্যপ্রাপ্তি ইতিহাসে আর লিপিবদ্ধ হয়নি।

আশ্চর্য এই বিরোধ, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়, যা মানুষ-কৃষ্ণ ও ঈশ্বর-কৃষ্ণের মধ্যে জাজ্বল্যমান, এবং যা অনেকেই মানতে চান না,

মানতে পারেননি। বুদ্ধিমান বঙ্কিম, অক্ষরের পর আইনের অক্ষর গেঁথে-গেঁথে, কৃষ্ণকে পরিণত করেছিলেন নিছক একটি সুনীতিনির্ভুল দোষস্পর্শহীন মনুষ্যে; আর পক্ষান্তরে, রূপকের জাদুদণ্ড ছুঁইয়ে, কৃষ্ণকে সর্বত্র এবং সর্ব সময়ে পরমেশ্বর-রূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাও আমরা চিরকাল ধ'রে দেখেছি। কিন্তু ও-দুয়ের যে-কোনো পথে পা বাড়ালে ব্যাসের প্রতি ঘোর অবিচার করবো আমরা, বৈয়াসিক কৃষ্ণের এপিকধর্মী বিশালতাকেও ক্ষুণ্ণ করবো। 'আদর্শ মনুষ্যে'র আঁটোসাঁটো ফ্রেমের মধ্যে তিনি ছোটো হ'য়ে যান, শতকরা-একশো পরিমাণে ঈশ্বর বললেও হ'য়ে পড়েন অবাস্তব ও ভূমিস্পর্শহীন। মনে রাখতে হবে, তিনি মহাভারতের মূল কাহিনীর একটি প্রধান চরিত্র; কুরুক্ষেত্রে, ও যুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে, বহু ভিন্ন-ভিন্ন ভূমিকা সম্পাদন ও উৎক্রমণ ক'রে, আমাদেরই চোখের সামনে তিনি বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছেন। এও মনে রাখা চাই যে বীরচরিতের আলেখ্যকার ব্যাসদেব, আমাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হৃদয়বৃত্তিকে গ্রাহ্য না-ক'রে, কৃষ্ণের স্খলনগুলিকে ধবলীকরণের চেষ্টামাত্র করেননি, নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন তাঁর সেই মা নু ষি ক রূপটিকে, যা অনেক অশংসনীয় আচরণে চিহ্নিত ব'লেই প্রাণধর্মী — এবং, এই বহুপল্লবিত গ্রন্থের সব অসংলগ্নতা সত্ত্বেও, আমাদের অনুভূতির পক্ষে সত্য। কৃষ্ণ আমাদের অনেক তর্কে আন্দোলিত করেছেন, পীড়ন করেছেন অনেক বিক্ষোভে — আর সেটাই কারণ, যে-জন্য তাঁর ক্বচিৎ-প্রকাশিত ঈশ্বরত্ব এমন অব্যর্থ ও প্রামাণিক। মহাভারতের পাঠক হিশেবে, তাঁর চরিত্রের সেই বিবর্তন-প্রক্রিয়া লক্ষ করাই আমাদের কর্তব্য।

কিন্তু দুর্জনের বিনাশ, সাধুজনের ত্রাণ, ধর্মের সংস্থাপন — গীতার এই সর্বজনশ্রুত সূত্রটি খাটিয়ে কৃষ্ণের যুদ্ধকালীন ক্রিয়াকলাপের

সমর্থন করা কি যায় না? তা সম্ভব হ'তো, যদি সাধুতাসম্পন্ন পাণ্ডবদের জয়লাভের পরে আমরা কৃষ্ণকে দেখতাম সত্যি আনন্দিত, অথবা সেই জয় হ'তো সর্বাঙ্গীণ, যদি যুদ্ধ শেষ হবার পরে, অষ্টাদশ দিনের মধ্যরাত্রে, কৌরবপক্ষের অবশিষ্ট তিন বীর কৃষ্ণকে এক লোমহর্ষক প্রত্যুত্তর দিতে না-পারতেন। আমরা লক্ষ করি, গীতাকথন হ'য়ে যাবার পরেও কৃষ্ণ মাঝে-মাঝে তাঁর দৈবশক্তি ফিরে পান — ক্ষণিকের জন্য ও দুর্বলভাবে, আমাদের চিত্তে কোনো ভাবতরঙ্গ না-তুলে। ভগদত্তের বৈষ্ণবাস্ত্র তাঁর কণ্ঠে প'ড়ে বৈজয়ন্তী মালায় রূপান্তরিত হ'লো, সূর্যকে তিনি সাময়িকভাবে অপসৃত করলেন আকাশ থেকে, আর শেষ পর্যন্ত উত্তরার মৃতজাত পুত্রকেও পুনর্জীবিত করলেন তিনি (আশ্ব: ৬৯)। কিন্তু এগুলোকে আমাদের মনে হয় আদ্যিকালের জাদুবিদ্যার টুকরো-টাকরা, এদের পিছনে কোনো আত্মিক শক্তি আমরা অনুভব করি না, কুরুক্ষেত্রের অধিনায়ক সারথির তেজঃপ্রভা এখানে ম্লান হ'য়ে এলো। আশ্চর্য নয় কি, যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও, আর অশ্বত্থামার দুরভিসন্ধি বিষয়ে পূর্বজ্ঞান প্রাপ্ত হ'য়েও[১২৮], সৌপ্তিকপর্বের হত্যাকাণ্ড তিনি নিবারণ করতে পারলেন না — করতে চেয়েছিলেন এমনও কোনো প্রমাণ নেই — এমনকি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রহন্তার প্রাণসংহার পর্যন্ত সম্ভব হ'লো না তাঁর পক্ষে; শুধু অশ্বত্থামার মুকুটমণি এনে দিয়ে দ্রৌপদীকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিলেন (সৌপ্তিক: ১৬)? আসল কথা, শল্যপর্বের পর থেকে কৃষ্ণ কেমন সংকুচিত হ'য়ে আসছেন, পরিণত হচ্ছেন নিজেরই একটি ভগ্নাংশে — এখন তাঁর সেটুকুও সামর্থ্য নেই যাতে কুরুপক্ষের শেষ অবশিষ্ট বীর অশ্বত্থামাকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করা যায়। আর কেমন ক'রেই বা তা থাকতে পারে — দুর্জনের বিনাশ ঘটাতে গিয়ে তিনি যে নেমে এসেছিলেন দুর্জনেরই সমতলে, লিপ্ত হয়েছিলেন প্রবঞ্চনায়, মিথ্যার দ্বারা দূষিত করেছিলেন বীরত্ব: হোন তিনি

সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তবু দণ্ডভোগ থেকে তাঁর নিস্তার নেই, এবং তিনি ঈশ্বর ব'লেই তাঁকে হ'তে হবে নিজেই নিজের দণ্ডদাতা। তাঁর সেই শেষ কৃত্যের প্রক্রিয়াটি দুর্যোধনবধের 'পরে আরম্ভ হ'য়ে মৌষলপর্বে সমাপ্ত হ'লো।

এতদিন আমরা কৃষ্ণকে দেখেছি অম্লেয়ভাবে প্রফুল্ল: সুভদ্রাহরণ থেকে দুর্যোধনবধ পর্যন্ত ন্যায়-অন্যায় যা-কিছু তিনি করেছেন, তারই মধ্যে এক অটুট আত্মবিশ্বাস আমরা লক্ষ করেছি; কিন্তু দুর্যোধন নিপাতিত হবার পরমুহূর্তে তাঁর কণ্ঠস্বর তিক্ত হ'য়ে উঠলো, তাঁর বাক্যে ধ্বনিত হ'লো ভর্ৎসনার সুর — তাঁর প্রিয় পাণ্ডবদের উদ্দেশে, হয়তো বা নিজেরও উদ্দেশে (শল্য : ৬২)। 'শোনো, পাণ্ডবগণ — কৌরবেরা ছিলেন মহাযোদ্ধা, তোমরা ধর্মযুদ্ধে কিছুতেই তাঁদের হারাতে পারতে না; আমি তাই তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য ("ভবতাং হিতমিচ্ছতা"), ছলে কৌশলে ও মায়াবলে তাঁদের সংহার করেছি। …দুর্যোধনকে ধর্মযুদ্ধে পরাস্ত করা কৃতান্তেরও অসাধ্য ছিলো, অতএব ভীম যে উপায়ে[১২৯] তাঁকে বধ করেছেন তা নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।…আমরা কৃতকার্য হয়েছি, সায়ংকালও উপস্থিত — এবার চলো স্বগৃহে ফিরে বিশ্রাম করি।' — কৃষ্ণের এই কটুস্বাদ, শুভজ্ঞানহীন ও অবশেষে-কাপট্যচ্যুত স্বীকারোক্তি শুনে আমাদের মন পরিতৃপ্ত হয়, কেননা যুদ্ধের আঠারো দিন ধ'রে আমরা অনুভব করেছি যে আমাদের বহুবার শ্রুত 'যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' কথাটা এমন একটি ব্যাসকূট যার অর্থোদ্ধার করতে গণেশঠাকুরকেও মাথা চুলকোতে হয়েছিলো।

কিন্তু আশ্চর্য এই, সব সত্ত্বেও আমরা কখনো কৃষ্ণের প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলি না, বরং তাঁকে প্রীতিমিশ্রিত কৌতূহলের চোখে অবলোকন করি — এত গভীর তাঁর চরিত্র, এত দুরধিগম্য; তাঁর সব কুটিল কর্মেও তাঁর ভঙ্গি এমন নিষ্কুণ্ঠ ও সহজ।

তাঁর বিষয়ে একটি রহস্যবোধ কাটাতে পারি না আমরা; তাঁকে কখনো মনে হয় নীটশে-কথিত সদসৎ-অতিক্রান্ত অতিমানব, যাঁর কাছে তাঁর ইচ্ছার উপরে কিছু নেই এবং ইচ্ছাশক্তির প্রেরণাই যাঁর পরিচালক ; — আবার কখনো দেখি কৃষ্ণ নিজেও সনাতন বিশ্ববিধানের অধীন, কোনো নামহীন নিয়ন্তার বশবর্তী। শল্যপর্বের পর থেকে আরো একটি অনুমান জাগে আমাদের মনে : সেটি এই যে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন মনের মধ্যে এক নিগূঢ় অভিপ্রায়, তাঁর আশ্রিত ও ঘনিষ্ঠ পাণ্ডবদেরও যে-বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। আর এই অনুমান সমর্থন পায়, যখন গান্ধারীর অভিশাপের উত্তরে তিনি মৃদু হেসে বলেন (স্ত্রী : ২৫): 'দেবী, আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করবো, আমি তা বহুকাল ধ'রে পরিজ্ঞাত আছি। আমার যা অবশ্যকরণীয় আপনি আমাকে তা-ই বললেন।' তাঁর এই কথা শোনামাত্র পাণ্ডবেরা 'ভীত ও উদ্বিগ্ন' হ'য়ে পড়লেন, কিন্তু আমাদের মনে গীতার কৃষ্ণ ঝলক দিয়ে গেলেন আরো একবার। 'উগ্রমূর্তি দেব, আপনি কে?' — অর্জুনের এই কাতর জিজ্ঞাসার উত্তরে কৃষ্ণের মুখে আমরা শুনেছিলাম : কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ — আমি লোকক্ষয়কারী বৃদ্ধ কাল, অধুনা লোকসংহারে প্রবৃত্ত হয়েছি' (গী : ১১ : ৩২)। শুনেছিলাম, কিন্তু অর্জুন বা আমরা তার অর্থ বুঝিনি তখন : এবারে কৃষ্ণ তা বুঝিয়ে দেবেন, কথা দিয়ে নয়, চিত্ররূপ দিয়ে, আমাদের পক্ষে এখনো-কল্পনাতীত এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে — কুরুক্ষেত্র থেকে দূরে, পশ্চিমসমুদ্রের তীরবর্তী তাঁর দ্বারকায়।

মৌষলপর্বটি কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের এক সংক্ষেপিত ও ভীষণতর পুনর্লিখন, অথবা এক মর্মভেদী মন্তব্য, সেই দীর্ঘায়িত ঘটনাবলির সারাৎসার — তার ব্যাখ্যা, তার সর্বশেষ পরিণাম। যে-যুদ্ধ বিধিবদ্ধ-ভাবে ঘোষিত হয়েছিলো, এবং যাকে অনেকবার 'ধর্মযুদ্ধ' বলা

হয়েছে — তা প্রকৃতপক্ষে কী এবং কেমনতরো, তা মৌষলপর্বের ক্ষুদ্রাকৃতি পটের উপরে পিঙ্গল আলোয় প্রতিফলিত হ'লো। দুয়ের মধ্যে প্রতিসাম্য অনেক : যেমন ধার্তরাষ্ট্র, পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা ছিলেন পরস্পরের শোণিত-জ্ঞাতি বা কুটুম্ব, তেমনি এখানেও ভুক্তভোগীরা একই বংশোদ্ভূত অন্ধক, ভোজ ও বৃষ্ণিগণ। উভয় ঘটনাই মত্ততার ফলে উৎপন্ন : দ্যূতক্রীড়া বা মদিরা, কোনো নারী অথবা ঋষির সঙ্গে কুৎসিত ব্যবহার, ক্রোধের অথবা ঈর্ষার উদ্গিরণ — যে-কোনো ভাবেই তা প্রকাশিত হ'য়ে থাক, আসলে সেটা বিশুদ্ধ উন্মত্ততা ছাড়া কিছু নয়, চূড়ান্ত বুদ্ধিলোপ ছাড়া কিছু নয়। এই সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে লক্ষ না-ক'রে উপায় নেই, তবু মহাভারতের কবি বার-বার কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ ক'রে এ-দুয়ের মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। দ্বারকার আকাশে রাহুগ্রস্ত হ'লো সূর্য, যেমন হয়েছিল হস্তিনাপুরে কুরুক্ষেত্রের প্রাক্কালে (মৌষল : ২) ; কুরুক্ষেত্রকে উপলক্ষ ক'রেই যদুকুলের মধ্যে হননস্পৃহা প্রজ্বলিত হ'লো। মদ চলছে পাত্রের পর পাত্র, প্রভাসতীর্থ মারাত্মক প্রমোদে মুখর — হঠাৎ সাত্যকি তীক্ষ্ণ স্বরে ব'লে উঠলেন : 'হার্দিক্য, তুমি ছাড়া এমন নিষ্ঠুর আর কে আছে যে নিদ্রিতকে বধ করতে পারে?' সেই বিখ্যাত নৈশ অভিযান, কৌরব পক্ষের শেষ দারুণ প্রতিহিংসা — তার নিন্দা শুনে সরোষে উত্তর দিলেন কৃতবর্মা (মৌষল : ৩) : 'শৈনেয়! [১৩০] মনে নেই তুমি ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করেছিলে? তুমি নৃশংস নও?' তিক্ত, আরো তিক্ত হ'য়ে উঠলো কলহ, আরো অনেক পুরোনো ক্ষোভ উন্মথিত হ'লো নতুন ক'রে, সাত্যকি খড়্গের আঘাতে কৃতবর্মাকে ভূরিশ্রবার পথে পাঠিয়ে দিলেন — ছড়িয়ে পড়লো জন থেকে জনে অন্ধ অসংবরণীয় জিঘাংসা, ভোজ ও অন্ধকদের হাতে প্রাণ হারালেন সাত্যকি ও কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন। বেদনার সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে রৈবতক-উৎসবের দৃশ্যটি, যেখানে এই ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণিরা প্রায় একই ভাবে

তাঁদের নারী ও সুরাপাত্র নিয়ে গোষ্ঠীসুখে মেতেছিলেন, এবং যেখানে অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহের ও পাণ্ডব-যাদবের সেই মৈত্রীর সূত্রপাত হয়েছিল, যার ফলে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন পাণ্ডবেরা, এবং আজ যদুবংশ উৎসন্ন হ'লো। যুদ্ধাবশিষ্ট দশজনের মধ্যে[১৩১] পাণ্ডবপক্ষে যেমন সাত্যকি, তেমনি কৌরবপক্ষে একজন ছিলেন কৃতবর্মা — কী দুর্ভাগ্য এঁদের, এঁরা ক্ষত্রোচিত-গরীয়ানভাবে প্রাণ দিতে পারলেন না; যুদ্ধের হাজার বিপদ থেকে বাঁচিয়ে মৃত্যু এঁদের হাতে রেখে দিয়েছিলো এমন এক অবসানের জন্য, যা বিলাপবেদনার ন্যূনতম উচ্চারণেরও যোগ্য নয়: যেমন শুঁড়িখানার মনিব ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয় ভোরবেলা দোরগোড়া থেকে জঞ্জালের সঙ্গে দুটো-একটা বেঘোর বেহুঁশ মাতালকেও হয়তো, ঠিক তেমনি।

মহাযুদ্ধের অন্তিম দিনে, শল্যের মৃত্যুর 'পরে কুরুক্ষেত্রেও নেমে এসেছিলো মত্ততা। আর ছিলো না কোনো সামরিক শৃঙ্খলা বা প্রকল্প, ছিলো না কোনো সুচিন্তিত আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা; যুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলো এক নির্বোধ ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড — কে আত্মপক্ষ আর কে-ই বা পরপক্ষ তাও বোধগম্য হয়নি; যোদ্ধারা রক্তের গন্ধে মাতাল হ'য়ে হাতের কাছে পাওয়ামাত্র বধ করেছেন শত্রুকে এবং মিত্রকেও (শল্য: ২৩-২৬)। কিন্তু আরো ব্যাপ্ত এবং আরো ভীষণ সেই মত্ততা যা যদুবংশকে আচ্ছন্ন ক'রে দিলো; — শুধু কোনো কীর্তিমান অভিজাত-গৃহের অবক্ষয় নয়, কোনো-একটি মহৎ বংশের বিলুপ্তিও নয় শুধু — একটি সম্পূর্ণ সভ্যতার ধ্বংস, মানুষিক বুদ্ধি ও চেতনার সার্বিক ও প্রতিকারহীন নির্বাপণ: তার বর্ণনা এত অল্প কথায় এবং এমন ভয়াবহভাবে অন্য কোন কাব্যকাহিনীতে লেখা হয়নি। প্রাচীন রোমকেরা যাকে বলতেন শনিপার্বণ, আর আমাদের তান্ত্রিক ভাষায় যাকে বলে ভৈরবী চক্র, এমনি একটি অনুষ্ঠান দিয়ে আরম্ভ হ'লো। প্রথমে

নামলো এক ভ্রান্তি, যাতে সুসংস্কৃত অন্নের মধ্যে দৃষ্ট হয় গণনাতীত কীট, অনুভূত হয় সুখশয়ান সুপ্তির মধ্যে মূষিকদংশন, ছাগ ডাকলে শৃগালের চীৎকার শ্রুত হয় : — আর তারপর, ঐ সব দুর্লক্ষণ পিছনে ফেলে, কিন্তু অনতিক্রম্য কালের বশীভূত হ'য়ে যাদবেরা চ'লে এলেন সেই সমুদ্রের তীরে, যার জলে শাম্ব-প্রসূত প্রথম মুষলটি চূর্ণাকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। প্রচুর মদ্য ও মাংস, নারী ও ভোগসামগ্রী — এই সব নিয়ে, যেন পূর্বদৃষ্ট দুঃস্বপ্নগুলিকে ভুলে থাকার মরীয়া চেষ্টায়, এক উৎকট উল্লাসে তাঁরা গা ঢেলে দিলেন। লিপ্ত হ'লো যৌন ব্যভিচারে নির্লজ্জভাবে স্ত্রী ও পুরুষ; মদ্য শুধু পান করা হলো না, বানরদের মধ্যে বিলোনো হ'লো; যেন যমুনাতীরবর্তী অন্য এক অতীত প্রমোদের ব্যঙ্গানুকৃতি ক'রে ঘটনাস্থল ধ্বনিত হ'তে লাগলো সুরাবিহ্বল নৃত্যে গীতে বিতণ্ডায় — সবই কৃষ্ণের সামনে। এতক্ষণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন তিনি, অবিচল ও তূষ্ণীভূত এক দর্শকমাত্র, কিন্তু সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত ও পূর্বজ্ঞাত সংহারক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হলেন — 'প্রবৃত্ত' কথাটায় বড্ড যেন বেশি বলা হ'লো, কেননা তিনি আর রথারূঢ় নন এখন, তাঁর হাতে নেই গদা বা কশা বা সুদর্শনচক্র, তাঁর চিত্ত এখন বীতরাগ ও বীতমন্যু — পুনরাবৃত্ত তরঙ্গের মতো প্রাণোচ্ছ্বাস তিনি পেরিয়ে এসেছেন। আর তাই, মনে-মনে 'কালপর্যায়' বুঝে নিয়ে, যেন হাতের মৃদুতম একটি ভঙ্গি ক'রে তিনি তুলে নিলেন সেই ঈষিকা তৃণ, পাণ্ডবদের ধ্বংসের জন্য সৌপ্তিকপর্বে অশ্বত্থামা যা নিক্ষেপ করেছিলেন। সে-যাত্রায় পাণ্ডুপুত্রদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন কৃষ্ণ[১৩২], কিন্তু তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে তিনি দয়া করলেন না : তাঁর হাতে প্রতিটি তৃণ অপ্রতিরোধ্য মুষল হ'য়ে উঠলো, যে-কোনো লোকের হাতে প্রতিটি তৃণ বজ্রতুল্য মুষল হ'য়ে উঠলো ; কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শ্মশানভূমিতে পরিণত হ'লো সেই রঙ্গালয়।

আমরা পড়েছি ঈস্কিলসের নাটকে অয়দিপৌসের দুই পুত্রের কাহিনী[১৩৩] — প'ড়ে কম্পিত হয়েছি আতঙ্কে ও করুণায় : দুই সহোদর ও একপিতৃজাত ভ্রাতা, প্রকৃতি-দত্ত সবচেয়ে নিকট ও সবচেয়ে হিংসাগর্ভ সম্পর্কে আবদ্ধ, যাঁরা থেবাই নগরীর সিংহদ্বারে পরস্পরকে হত্যা করেছিলেন। আর এখন দেখছি এই প্রভাসতীর্থে এতেওক্লেস-পলিনাইকেস ভ্রাতারা সংখ্যায় বহুগুণে বর্ধিত হ'লো; পিতা পুত্রের ও পুত্র পিতার মস্তকচূর্ণনে নিযুক্ত : — এখানে করুণার কোনো অবকাশ পর্যন্ত নেই, নেই কোনো অবশিষ্ট হোরেশিও যার মুখে একটি বিদায়-বাণী শুনে আমরা সান্ত্বনা পেতে পারি। একজন ছিলেন বভ্রু, এই উন্মত্ততা যাঁকে স্পর্শ করেনি; কিন্তু কুলধ্বংস ঘ'টে যাবার পর তিনিও এক আকস্মিক মুষলের আঘাতে নিহত হলেন — যেমন হয়েছিলেন, ঘোষিত যুদ্ধ থেমে যাবার পরে, অতর্কিতে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। শুধু রইলেন প্রধানতম দুই বার্ষ্ণেয় পুরুষ — কিন্তু তাঁরাও আর বেশিক্ষণ থাকবেন না।

পুঁথির মধ্যে সব কথাই স্পষ্ট বলা আছে। সবই কৃষ্ণের দ্বারা কৃত হয়েছিলো, তিনি চেয়েছিলেন যদুবংশের ধ্বংস এবং তা সচেতন-ভাবে সাধন করেছিলেন — গান্ধারী ও নারদ-কণ্ব প্রদত্ত অভিশাপের মূল্য শুধু প্রতীকী। কিন্তু একটি কথা কবি মুখ ফুটে বলেননি, বলার কোনো প্রয়োজনও ছিলো না। আনুপূর্বিক মহাভারত প'ড়ে আসার পর কোন পাঠক না অনুভব করবেন ও বিশ্বাস করবেন যে মৌষলপর্বে আবার তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করলেন — অদ্ভুতভাবে রূপান্তরিত এক ঈশ্বর : আর নন 'দিব্যবসনে মাল্যে কিরীটে অলংকৃত,' নন 'সহস্র সূর্যের চেয়েও দীপ্তিশালী তেজঃপুঞ্জ,' 'অনেক বাহুবক্ত্র-নেত্রসম্পন্ন জগৎব্যাপী' সত্তা আর নন (গী : ১১) — কিন্তু এক ভূষণরিক্ত জীবনক্লান্ত পুরুষ, যিনি তাঁর ঈশ্বরত্বের লক্ষণস্বরূপ গ্রহণ করেছেন প্রকট মরত্ব — যথাসময়ে, স্বেচ্ছায়। এখনো তিনি 'লোক-

ক্ষয়কারী,' কিন্তু তাঁর 'কালাগ্নিসদৃশ' রূপ এখন নির্বাপিত, তাঁর সংহারকর্মেও তিনি অনুগ্র ও উদাসীন। যেন নিজের সঙ্গে গোপন একটি চুক্তি ছিলো তাঁর, কৌরব-পাণ্ডবদের উপলক্ষ ক'রে এতদিন ধ'রে তা-ই তিনি পূরণ করলেন: তাঁর সেই কর্মপরায়ণ মানুষিক ভূমিকার এবারে অবসান ঘটলো। 'ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই, তবু আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি। যদি আমি কর্ম না করি তাহ'লে লোকেরাও কর্মত্যাগ করবে। ··· লোকসংগ্রহের জন্য — সৃষ্টিরক্ষার জন্যই — কর্ম করণীয়' (গী: ৩: ২২-২৩, ২০, ২৫)। কিন্তু কৃষ্ণ জানেন — এবং মৌষলপর্বে তা প্রমাণ করলেন — যে বিরতিরও প্রয়োজন ঘটে মাঝে-মাঝে, আসে মাঝে-মাঝে সন্ধিলগ্ন যখন কালের ঘূর্ণন যেন মুহূর্তের জন্য থেমে যায় — যখন সব যুদ্ধ সমাপ্ত, সব উদ্যম নিঃশেষ, পৃথিবীর বীরবংশ লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায়, কোথাও নেই কোনো সংকট বা সংঘর্ষ, এবং কোনো নতুন সূচনারও ইঙ্গিত নেই। আসে এমন সময়, যখন 'সংগ্রহ' ও 'সংহার' সমার্থক হ'য়ে ওঠে, পূর্ণ হয় কোনো-এক বৃত্ত, বিশ্বসংসারে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্যরক্ষার জন্যই প্রয়োজন ঘটে ধ্বংসের। আর সে-রকম সময়ে ঈশ্বরকেও অপসৃত হ'তে হয় — অন্তত ইতিহাস থেকে, প্রপঞ্চময় সংসার থেকে। যে-বিশাল প্রয়াসের জালে কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছিলেন এবং সমগ্র ক্ষত্রকুলকে বন্দী করেছিলেন, সেটি অনেক আগে থেকেই আস্তে-আস্তে গুটিয়ে আনছিলেন তিনি, দুর্ধর্ষ মহামৎস্যদের একে-একে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন মহাসমুদ্রে; — এবার তাঁকেও ফিরে যেতে হবে, তিনি প্রস্তুত।

তিনি প্রয়োগ করেছিলেন সাংখ্য যোগ বেদান্ত থেকে প্রতিটি সম্ভবপর যুক্তি, নিখিলজ্ঞানের ভিত্তির উপর তাঁর কর্মবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, দেখিয়েছিলেন অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ; — কত কল্পনার দ্যুতি, কত চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য, জীবন-মৃত্যুর কত রহস্যের কত

উদ্‌ঘাটন ; আর তবু, যেন অর্জুনের মন থেকে শেষ সংশয়বিন্দুটি বিমোচনের জন্য তিনি ঘোষণা করেছিলেন সেই মাভৈ-বাণী, উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত সেই আশ্বাস, যেখানে ভারতবর্ষীয় ভক্তিবাদের আরম্ভ, এবং যার দ্বারা তথাকথিত হিন্দুজাতি[১৩৪] আজ পর্যন্ত অভিভূত হ'য়ে আছে : 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' (গী: ১৮ : ৬৬)। — কিন্তু এই বার্তা কি বিশ্বের বাতাসে উড়িয়ে-দেয়া একটি ভাবস্পন্দন শুধু, না কি মহাভারতের ঘটনার প্রতিও প্রয়োজ্য ? আমরা তো জানি, আমরা তো চোখে দেখেছি, 'ধর্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্রে তিনি কেমন পাপের পর পাপে লিপ্ত করেছিলেন অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠিরকে ; — আমরা তাই প্রশ্ন না-তুলে পারি না : কৃষ্ণ কি তাঁর মহান প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন ?

এই প্রশ্নেরই উত্তর হ'লো মৌষলপর্ব।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে, এবং উদ্যোগপর্বেও — শুধু যুধিষ্ঠিরের নয়, অন্যদেরও দুর্বল মুহূর্ত এসেছিলো। অর্জুন, কৃষ্ণের আদেশে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের পরেও, ভীষ্মবধে ছিলেন স্নেহবশত অনিচ্ছুক (ভীষ্ম : ১০৮), এবং দ্রোণবধজনিত মনঃপীড়ায় মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছিলেন (দ্রোণ : ১৯৭)। শুধু যে ভীমের মুখেই আমরা 'অভাবনীয় সান্ত্ববাদ' শুনেছিলাম, তা নয় (উদ্যোগ : ৭৩); স্বয়ং দুর্যোধন, 'জয় অথবা মৃত্যু' ছাড়া যাঁর মুখে কখনো কথা ছিলো না, তিনিও একবার, এক আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে, যুধিষ্ঠিরের মতোই ধিক্কার দিয়েছিলেন ক্ষাত্রধর্মকে[১৩৫]। কিন্তু কৃষ্ণ ছিলেন অব্যাকুল ও অব্যথিত, আদ্যন্ত একই ভাবে ক্ষমতাপন্ন ও ক্ষমতার ব্যবহারকারী : যে-ভীষ্ম তাঁর প্রধানতম বন্দনাকারী তাঁর জন্য কোনো বেদনা তিনি প্রকাশ করেননি ; যে-কর্ণের সঙ্গে একবার তিনি মর্ম-কথা বিনিময় করেছিলেন — বন্ধুর মতো, প্রীতিস্নিগ্ধভাবে[১৩৬], সেই কর্ণের হত্যা তিনি কুৎসিত উপায়ে ঘটিয়েছিলেন। আর এখন,

মৌষলপর্বের ভয়াবহ ঘটনাপর্যায়ে — মনে হয় তাঁর প্রতিটি আবেগবিন্দু নিষ্কাশিত হ'য়ে গেছে, অনাচারমত্ত যাদবদের প্রতি তাঁর ক্রোধের উদ্রেক পর্যন্ত হ'লো না, ওষ্ঠ থেকে নিঃসৃত হ'লো না কোনো তিরস্কার — যেন নিষ্পলক চোখে চেয়ে দেখলেন সব, মুখের একটি পেশী কুঞ্চিত না-ক'রে — যেন গাছ থেকে খ'সে-পড়া শুকনো পাতার চেয়েও তাঁর আত্মীয় ভ্রাতা পুত্রের জীবন তাঁর কাছে মূল্যহীন। এ-ই তাঁর প্রক্ষালন ও প্রতিদান, এই হ'লো কৃষ্ণের প্রায়শ্চিত্ত — তাঁর স্বকৃত এবং কুরুবংশের সব পাপের জন্য — যুধিষ্ঠিরের ধরনে নয়, বিলাপের উচ্ছ্বাসে নয় (কেননা তিনি শোক অথবা মনস্তাপের অতীত) — এক প্রত্যক্ষ ও চরম উপায়ে, স্বহস্তে তাঁর স্ববংশকে সংহার ক'রে। 'এখন তাঁর একটিমাত্র কৃত্য অবশিষ্ট আছে — কিন্তু সেটা আসলে কোনো কর্ম নয়, সেটা কর্মের নিরসন, ঘটনা থেকে প্রস্থান।

প্রণাম করি সেই কবিকে, মহাভারতীয় কৃষ্ণ-কাহিনীর শেষ কয়েকটি মুহূর্ত যিনি কল্পনার চোখে দেখতে পেয়েছিলেন[১৩৭]। আমরা দেখেছি কয়েকটি গরীয়ান মৃত্যু মহাভারতে : ছাপান্ন দিন শরশয্যায় শুয়ে থাকার পরে, দেবগণের জয়কার-ধ্বনিত আকাশের তলায় ভীষ্ম তনুত্যাগ করলেন; কর্ণের প্রাণ একটি অগ্নিপুঞ্জের মতো ঊর্ধ্বাকাশে উত্থিত হ'য়ে সূর্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হ'লো; এদিকে যদুবংশ-ধ্বংসের পরেও একটি গম্ভীর ও মনোমুগ্ধকর চিত্র এঁকে দিলো বলরামের মৃত্যু — যখন তাঁর মুখ থেকে এক সহস্রফণা বিশাল সর্প নিঃসৃত হ'য়ে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেলো সমুদ্রে (মৌষল : ৭)। কিন্তু কৃষ্ণ, সেই অপ্রহার্য অঘাতনীয় পুরুষ যাঁকে স্বাস্থ্য শক্তি যৌবনের এক অফুরন্ত উৎসরূপে চিরকাল ধ'রে দেখেছি আমরা : তিনি প্রাণত্যাগ করলেন বনের মধ্যে ভূমিশয়নে যে-কোনো ক্ষুদ্র পশুর মতো এক ব্যাধের নিক্ষিপ্ত একটিমাত্র বাণের আঘাতে — তাও কোনো মর্মস্থলে নয়, পদতলে — এই ঘটনায় এক আশ্চর্য সুবিচার সাধিত হ'লো, অন্তর্নিহিত

ভাবের দিক থেকে সম্পূর্ণ হ'লো মহাভারতে কৃষ্ণের ভূমিকা ঃ ভগবদ্গীতায় যত উঁচুতে তিনি উঠেছিলেন, এবারে ঠিক তত নিচেই তাঁর অবতরণ ঘটলো : তাঁকে মেনে নিতে হ'লো দেহধারণের সব দৌর্বল্য, রক্তমাংসের সব বিষাদ ও সহায়হীনতা — যাতে আমরা তাঁকে সর্বক্ষম পরমেশ্বর অ্যাখ্যা দিয়ে চিন্তাহীনভাবে অর্চনা না করি, যাতে ভুলে না যাই আমাদের সব দৈন্যেরও তিনি অংশিদার। কিন্তু কৃষ্ণের এই মৃত্যু — মানবেতিহাসের হীনতম এই মৃত্যু — এও তাঁর ঈশ্বরত্বেরই একটি ব্যঞ্জনা : ভীষ্মের বা বলরামের মতো কোনো মহিমান্বিত অবসান অশোভন হ'তো তাঁর পক্ষে, এমনকি ঠিক রুচিসংগত হ'তো না ; কেননা ইতিপূর্বে নানা দিক থেকে নানাভাবে তাঁর প্রতিভাকে বিচ্ছুরিত ক'রে, তিনি প্রায় আমাদের বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিলেন। আর তাই, সব পূর্বপ্রকাশিত গৌরবের সংশোধক ও সম্পূরকরূপে, এমনি একটি লৌকিক অথবা জান্তব মৃত্যুরই তাঁর প্রয়োজন ছিলো ; তারই জন্য তিনি আবার হ'য়ে উঠলেন আমাদের হৃদয়ের কাছে বিশ্বাস্য ও বাস্তব এক দেবতা : যিনি 'লোকসংগ্রহে'র জন্য কর্ম ক'রে থাকেন, তিনিই 'লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল' — গীতায় উক্ত এই সূত্রটি আমাদের সামনে প্রত্যক্ষভাবে দর্শনীয় হ'লো। কথা ছিলো তিনি 'ধর্মরাজ্য' স্থাপন করবেন ; কিন্তু কুরুক্ষেত্রের মতো ধর্ম-নাশকারী যুদ্ধের পরে তা যে আর সম্ভব নয়, নীলচক্ষু নকুলের মুখে সে-কথা আমরা আগেই শুনেছিলাম ; — এখন যা প্রয়োজন ও যথোচিত তা শুধু বিসর্জন, শুধু প্রত্যাহরণ : আর সেই প্রক্রিয়াটিকেই কৃষ্ণ অত্যন্ত দ্রুত ক'রে তুললেন মৌষলপর্বে। ছায়াছবির মতো মিলিয়ে গেলো তাঁর যদুবংশ, তিনি বিদ্ধ করলেন ব্যাধের বাণে নিজেকে, ঈশ্বরের অন্তর্ধান ঘটলো। আমরা অবাক হই না, এর পরে অর্জুন এসে যখন গাণ্ডীব উত্তোলন করতে পারেন না, মৃত্যু-সম্মুখীন

কর্ণের মতোই তাঁর দিব্যাস্ত্রসমূহ বিস্মৃত হন, যখন অর্জুনের চোখের সামনেই যাদবনারীদের হরণ ক'রে নেয় দস্যুরা, এবং অনেক কুলনারী স্বেচ্ছায় দস্যুর হাতে আত্মদান করেন। আমরা অবাক হই না, কোনো বেদনাও বোধ করি না, যখন বেলাতিক্রান্ত সমুদ্র গ্রাস ক'রে নেয় দ্বারকাপুরীকে, এবং দুর্দাশ্রিত দুর্যোধনের চেয়েও চরমতরভাবে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত এক অর্জুনকে দেখি নতশিরে ব্যাসদেবের সামনে দণ্ডায়মান (মৌষল : ৭-৮)। এই সব-কিছুর মধ্যে এক মহান ঔচিত্য অনুভব ক'রে আমরা স্তব্ধ হ'য়ে যাই ; আমাদের হৃদয়ে এমন একটি আস্বাদ ছড়িয়ে পড়ে যা শান্ত ও পবিত্র ও সুখদুঃখ-বিস্ময়ের অতীত।

১২২। কৃষ্ণ পাণ্ডব-কৌরবের মধ্যে 'সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য' ('কৃষ্ণচরিত্র' : খণ্ড : ৫, পরি : ১), বঙ্কিমের এই উক্তিটি প'ড়ে আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়েছি। কেন না মহাভারতে কৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব অসংখ্যবার ঘোষিত হয়েছে — যেমন ঘটনার মধ্য দিয়ে, তেমনি পুঁথির লিখনের মধ্যে, ধৃতরাষ্ট্রের, সঞ্জয়ের, যুধিষ্ঠিরের, এবং কৃষ্ণের নিজের মুখ দিয়েও। এ নিয়ে অধিক আলোচনা বাহুল্য হবে, আমি শুধু কৃষ্ণের কয়েকটি উক্তি তুলে দিচ্ছি :

সঞ্জয়ের প্রতি কৃষ্ণ : 'তেজোময় দুর্ধর্ষ গাণ্ডীব যাঁর ধনু এবং আমি যার সহায়, সেই সব্যসাচীর সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা' (উদ্যোগ : ৫৮)।

যুধিষ্ঠীরের প্রতি কৃষ্ণ : 'যে-ব্যক্তি পাণ্ডবের শত্রু সে আমারও শত্রু, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা আপনাদের সুহৃৎ তাঁরা আমারও সুহৃৎ — যঃ শত্রু পাণ্ডুপুত্রাণাং মচ্ছত্রুঃ স ন সংশয়ঃ। মদর্থা ভবদীয়া যে যে মদীয়াস্তবৈব তে' (ভীষ্ম : ১০৭ : ৩২)।

অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণ : 'আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য নানা উপায়ে জরাসন্ধ শিশুপাল ও অন্যান্য নিষাদ রাক্ষসকে বধ করেছি' (দ্রোণ : ১৮১)।

এ-প্রসঙ্গে বন্দনামুখর ভাগবত উল্লেখ্য ; সেখানে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে দিয়ে বলানো হয়েছে (১ : ৯) : 'ভগবান (কৃষ্ণ) সমদর্শী হ'লেও ভক্তের প্রতি তাঁর কতদূর পক্ষপাত দ্যাখো। আমার অন্তিমকাল উপস্থিত জেনে

তিনি আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন।… সখা অর্জুনের প্রতি তাঁর কী অসাধারণ পক্ষপাত! … তিনি শত্রুপক্ষীয় (কৌরবপক্ষীয়) বীরগণকে দর্শনমাত্র সকলেরই বল হরণ করেছিলেন।… আমার বাসনা ছিলো আমি তাঁকে দিয়ে অস্ত্রধারণ করাবো; তাই ভক্তবৎসল ভগবান আমারই বাঞ্ছাপূরণের জন্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছিলেন।'— কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গও এখানে তাঁর মহত্ত্বেরই নিদর্শন; ভক্তির শক্তি অসীম।

১২৩। কৃষ্ণের মূল উক্তিটি উদ্ধৃত করছি:

'নিহত্য ভীষ্মং সগণং তথাজৌ
দ্রোণঞ্চ শৈনেয় রথপ্রবীরৌ।
প্রীতিং করিষ্যামি ধনঞ্জয়স্য
রাজ্ঞশ্চ ভীমস্য তথাশ্বিনোশ্চ॥

(ভীষ্ম: ৫৯: ৮৬)

—'সাত্যকি! আমিই সেনাসমেত মহারথী ভীষ্ম দ্রোণকে নিধন ক'রে ধনঞ্জয়, ভীম, রাজা (যুধিষ্ঠির) ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রীতিসাধন করবো।'

১২৪। অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ: 'তোমরা ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে কৌশল দ্বারা দ্রোণবধের চেষ্টা করো; নচেৎ আচার্য তোমাদের সকলকেই সংহার করবেন, সন্দেহ নেই। আমি নিশ্চয়ই জানি অশ্বত্থামা হত হয়েছেন জানলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করবেন না।' যুধিষ্ঠিরের প্রতি (দ্রোণ: ১৯১): 'মহারাজ, দ্রোণাচার্য আর অর্ধদিন যুদ্ধ করলে আপনার সমুদয় সৈন্য বিনষ্ট হবে। আপনি মিথ্যা কথা ব'লে আমাদের পরিত্রাণ করুন। প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না।' এই 'আমাদের' সর্বনাম থেকেও বোঝা যায় কৃষ্ণ কতদূর পর্যন্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে একাত্ম।

১২৫। ঘটনাটি রাম-কর্তৃক বালীবধের অনুরূপ, অথচ অর্জুনই রামের সেই উপাংশুহত্যাকে এক 'চিরস্থায়িনী অকীর্তি' ব'লে ঘোষণা করেছিলেন (দ্রোণ: ১৯৭ ও গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ দ্র)।

১২৬। খাণ্ডবদাহনের সময় অর্জুন অশ্বসেনের মাতাকে বধ করেছিলেন।

১২৭। সংস্কৃতে 'আততায়ী' শব্দের অর্থ শুধু নরহন্তা নয়: যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষপ্রয়োগ করে, ভূমিহরণ, ধনহরণ ও পরস্ত্রীহরণ যার ব্যবসা — এরা সকলেই আততায়ী।

১২৮। শল্য : ৬৪ দ্র। কথিত আছে, এই নৈশ অভিযান বিষয়ে পূর্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ামাত্র কৃষ্ণ গাত্রোত্থান করলেন, কিন্তু কেন তিনি নিবারণের কোনো চেষ্টাও করলেন না, তার কোনো ব্যাখ্যা কোথাও দেয়া হয়নি।

১২৯। সংস্কৃতে 'উপায়' শব্দের এক অর্থ কার্যোদ্ধারের কৌশল — তা ন্যায়-অন্যায় যা-ই হোক না — এবং কৃষ্ণের দ্বারা সেটি সেই অর্থেই প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে। দুর্যোধনবধের প্রাক্কালে তিনি 'উপায়'কে বললেন 'সর্বাপেক্ষা বলবান'; শল্য : ৩২-এ তাঁর সম্পূর্ণ ভাষণটি শিক্ষাপ্রদ, এবং তাঁর মুখে এই কথাটিও আমরা শুনলাম যে দুর্যোধনকে ন্যায়যুদ্ধে জয় করা অসম্ভব হ'তো। কৃষ্ণের এ-সব উক্তি মনে রাখলে ভীমকে মনে হয় নির্বোধ অথবা অনৃতভাষী, যখন ভগ্নজানু ভূলুণ্ঠিত অশক্ত দুর্যোধনের মাথায় বাঁ পায়ে লাথি মেরে তিনি হুংকৃতরবে ব'লে ওঠেন (শল্য : ৬০) — 'আমরা বাহুবলে শত্রুপাত করি, শাঠ্য অবলম্বন করি না।' স্মর্তব্য, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলরাম দুর্যোধনবধের ক্রূরতা সইতে না-পেরে লাঙল তুলে ভীমসেনকে মারতে গিয়েছিলেন, ভীমের প্রতি তাঁর ভর্ৎসনার ভাষা তীব্র ও তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছিলো। উত্তরে কৃষ্ণ যা বলেছিলেন তা এত নিষ্প্রাণভাবে শাস্ত্রিক যে পাঠকের পক্ষে বলরামের সঙ্গে একমত হওয়া স্বাভাবিকমাত্র।

১৩০। কৃতবর্মার পিতার নাম হৃদিক, সাত্যকি শিনির পৌত্র; তাই তাঁদের 'হার্দিক্য ও 'শৈনেয়' নাম।

১৩১। কষ্টং যুদ্ধে দশ শেষঃ শ্রুত্বা মে
ত্রয়োঽস্মাকং পাণ্ডবানাঞ্চ সপ্ত।
(ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ : আদি ১ : ২১৮)

— 'আমি শুনেছি এই যুদ্ধে দশজন মাত্র অবশিষ্ট আছে: আমাদের পক্ষে তিন ও পাণ্ডবপক্ষে সাতজন।' — কৌরবপক্ষের তিনজনকে আমরা সৌপ্তিকপর্বে চিনে নিয়েছিলাম; পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চভ্রাতা ছাড়া সাত্যকিকে সহজেই মনে পড়ে, কিন্তু সপ্তমজনকে শনাক্ত করতে ঈষৎ বিলম্ব হয়। আমাদের মন বলে তিনি কৃষ্ণ, কিন্তু তা মেনে নিতে আমরা দ্বিধা বোধ করি; কেননা সব সত্ত্বেও ঠিক যুযুধানবৃন্দের অন্যতম ব'লে আমরা ভাবি না তাঁকে, বা ভাবতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু কৃষ্ণ নিজের মুখেই আমাদের সংশয়ের

নিরসন ক'রে দেন, যখন যুদ্ধের শেষে দ্বারকায় ফিরে তিনি বসুদেবকে বলেন (আশ্ব : ৬০) : 'হতপুত্র হতমিত্র হতবল পাণ্ডবদের অবশিষ্ট আছেন শুধু তাঁরা পাঁচজন, আর যুযুধান (সাত্যকি), আর আমি।' ধৃতরাষ্ট্রের উক্ত শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠও বলেছেন যে পাণ্ডবপক্ষীয় সপ্তমজন কৃষ্ণ। দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণ নিজেই নিজেকে পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধা ব'লে গণ্য করেছেন, অন্যেরাও চিরকাল তাঁকে সেইভাবেই দেখেছেন; বঙ্কিমের অপক্ষপাতী কৃষ্ণ বঙ্কিমের কল্পনায় ছাড়া কোথাও নেই।

১৩২। ভীম-অর্জুনকে লক্ষ্য ক'রে অশ্বত্থামা 'ঈষিকাস্ত্র' নিক্ষেপ করেছিলেন; প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় সেটি ব্রহ্মাস্ত্রগর্ভ ঈষিকাতৃণ। কৃষ্ণ ও ব্যাসদেব মিলেও সেই অস্ত্রকে পুরোপুরি ব্যর্থ করতে পারেননি; পঞ্চভ্রাতা প্রাণে বেঁচে গেলেও উত্তরার গর্ভস্থ পুত্র নিহত হয়েছিলো (সৌপ্তিক : ১৩-১৫ দ্র)।

'ঈষিকা' অর্থ শরতৃণ, আমরা যাকে কাশ বলি তা-ই। মনিয়র-উইলিয়মস-এর অভিধান অনুসারে 'ঈষ' ধাতুর একটি অর্থ আক্রমণ বা আঘাত করা। এই তৃণাস্ত্রের ধারণাটি কোনো বৈদেশিক পুরাসাহিত্যে আমি পাইনি, কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত জাপানি নো-নাটক 'ইক্কাকু সেন্নিন'-এ এর উল্লেখ আছে।

১৩৩। নাটকটির নাম 'থেবাই-এর বিরুদ্ধে সাতজন'। কাহিনীর চুম্বক এই :

রাজা অয়দিপৌসের মৃত্যুর পরে স্থির হ'লো, তাঁর দুই পুত্র পলিনাইকেস ও এতেওক্লেস পালা ক'রে-ক'রে তিন-বৎসর-কাল রাজত্ব করবেন। রাজত্ব প্রথম পেলেন এতেওক্লেস, কিন্তু নির্দিষ্ট তিন বৎসর কেটে যাবার পর তিনি রাজ্য ছেড়ে দিলেন না; ক্রুদ্ধ পলিনাইকেস সেনাসংগ্রহ ক'রে তাঁর পৈতৃক নগর আক্রমণ করলেন। প্রাচীরবেষ্টিত থেবাইতে ছিলো সাতটি সিংহদ্বার; তার প্রত্যেকটিতে একজন ক'রে আক্রমণকারী ও প্রতিরক্ষক নিযুক্ত হ'লো — একটি দ্বারে দুই ভাই দ্বৈতযুদ্ধে সংহার করলেন পরস্পরকে। গ্রীক পুরাণে এও কথিত আছে যে অয়দিপৌস-দত্ত অভিশাপের ফলেই এই বীভৎস যুগল-হত্যা ঘটেছিলো।

১৩৪। 'তথাকথিত' বলছি এইজন্য যে ভারতবর্ষীয় ব্যবহারে 'হিন্দু' শব্দটি অর্বাচীন; প্রাচীনেরা ঐ শব্দ জানতেন না। তাঁরা নিজেদের বলতেন

'আর্য' বা 'সনাতনধর্মাবলম্বী', অথবা বর্ণ অনুসারে পরিচয় দিতেন নিজেদের। 'হিন্দু' শব্দটি 'সিন্ধু'র পারসিক উচ্চারণ, গ্রীকরা তা গ্রহণ ক'রে ঐ নদীর নাম ভারতবর্ষের উপর অর্পণ করেন, এবং তা-ই থেকে 'ইণ্ডিয়া' শব্দের উদ্ভব। ভারতবর্ষের পুরাতন ধর্মের নাম হিশেবে 'হিন্দু' শব্দের প্রচলন করেন নবাগত তাতার-মোগল মুসলমানগণ (A. L. Basham : *The Wonder that was India* , Grove Press, New York, ১৯৫৪, পৃ ১ টী দ্র)।

তত্রাচ, বর্তমান সময়ে 'হিন্দু' শব্দটি এত বেশি ব্যাপক যে প্রাচীন ভারত বিষয়ে লিখতে গিয়েও তা ব্যবহার না-ক'রে উপায় নেই। যিনি ভাবতীয় তিনিই হিন্দু — তাঁর ধর্ম অথবা গোষ্ঠীগত পরিচয় যা-ই হোক না — রবীন্দ্রনাথের এই ধারণাটিকে আমরা অতীতকালেও প্রয়োগ করতে পারি। (এ-প্রসঙ্গে 'পরিচয়' গ্রন্থে "আত্মপরিচয়" প্রবন্ধ দ্র।)

১৩৫। যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনে, দ্রোণবধের পূর্বে সংগ্রাম যখন সংকুল, আর রণস্থলে ঘূর্ণিত হ'তে-হ'তে সাত্যকি ও দুর্যোধন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছেন, তখন একটি সুন্দর অবকাশের মুহূর্ত আছে (দ্রোণ : ১৯০)। দুই বিরোধী 'নর-শার্দূল' থমকে গেলেন হঠাৎ, 'সহাস্যে' দেখতে লাগলেন পরস্পরকে, অনেক বাল্যস্মৃতি তাঁদের মনে পড়ে গেলো। প্রথম কথা বললেন দুর্যোধন: 'সাত্যকি, এককালে আমরা ছিলাম প্রণয়াবদ্ধ বন্ধু, আর এখন পরস্পরকে বাণবিদ্ধ করছি। ক্ষত্রিয়ের লোভ, ক্রোধ ও পরাক্রমকে ধিক।' কালীপ্রসন্নে পর্বাধ্যায়-শিরোনামায় এটিকে বলা হয়েছে 'সাত্যকিকে স্ববশে আনার জন্য দুর্যোধনের কৌশল', কিন্তু মূলে সে-রকম কোনো ইঙ্গিত নেই; বীরদ্বয়ের সহাস্যতা বরং মনে হয় গোপন কোনো দুর্বলতাসূচক। 'হে রাজন্, যদি আমি তোমার প্রিয়পাত্র হই তবে আর বিলম্ব কেন — এসো, শীঘ্র বধ করো আমাকে' — সাত্যকির এই উত্তরটিকেও কালীপ্রসন্ন বলেছেন 'শ্লেষোক্তি': কিন্তু এটা ব্যঙ্গ না বেদনাকম্পন সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থেকে যায়; রণোৎসাহীদের বর্মাচ্ছাদিত হিংসাপূর্ণ বুকের তলাতেও হঠাৎ কখনো মানবিক হৃদয় স্পন্দিত হ'য়ে থাকে, এই সরল অর্থ গ্রহণ করার আমি কোনো বাধা দেখতে পাই না।

অংশটির দুর্বলতা এই যে দুর্যোধন-সাত্যকির বাল্যবন্ধুতার উল্লেখ ইতিপূর্বে একবারও করা হয়নি।

১৩৬। উদ্যোগ : ১৩৮-১৪১ দ্র। এই অংশে কর্ণ-কৃষ্ণের মধ্যে এমন একটি অতরঙ্গতা বর্ণিত হয়েছে, যা পাণ্ডব অথবা কৌরবশিবিরে কারোরই জানা ছিলো না ; তাঁদের এই সাক্ষাৎ ও সংলাপও অন্য কারো কখনো গোচর হয়নি। ঘটনাটি গোপন থাকবে, তা কর্ণ-কৃষ্ণের মধ্যে সেই সময়েই স্থির হয়েছিলো।

১৩৭। যদুবংশধ্বংসের কাহিনী বিষ্ণুপুরাণেও বিবৃত আছে ; তার সঙ্গে মৌষলপর্বের তুলনা করলে বোঝা যায় কেন মহাভারত 'পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র' ব'লে আখ্যাত হ'য়ে থাকলেও পারিভাষিক অর্থে পুরাণসাহিত্যের অন্তর্ভূত হয়নি। হেনরি জেমস যাকে বলেছিলেন 'গালিচার অন্তরালবর্তী মূর্তিরূপ'— যা বহুক্ষণ পর্যন্ত দৃশ্যাতীত থেকে কাব্যের শেষাংশে এসে প্রস্ফুটিত হয়, এবং মৌষলপর্বে আমরা যা আভাসিত দেখতে পাই, বিষ্ণুপুরাণে (এবং ভাগবতেও) তা অব্যর্থ ঘোষণায় পারণত হয়েছে। ঘটনাগুলি প্রায় সবই এক, কিন্তু কোনো ঘটনাই আমাদের মনকে মন্থন করে না। যাদবদের পারস্পরিক হত্যা, বলরাম ও কৃষ্ণের মৃত্যু, দ্বারকাপুরীর নিমজ্জন — সবই খুব সাধারণ ব্যাপার ব'লে মনে হয় আমাদের। তার কারণ, কৃষ্ণ সেখানে প্রথম থেকেই অনাবৃত ও তর্কাতীতভাবে পরমেশ্বর ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছেন ; তাঁর চরিত্রে কোনো উচ্চাবচতা নেই, সাহিত্যের অর্থে কোনো 'চরিত্র' তিনি প্রাপ্ত হননি। তিনি পরমেশ্বর, এই কথাটা শোনামাত্র আমরা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ি ; তাঁর কোনো ক্রিয়াকর্মে উত্তেজিত হওয়া দূরে থাক, সেগুলিকে স্পষ্টভাবে অনুভব করতেও পারি না — কেননা পরমেশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব। পক্ষান্তরে, মহাভারতীয় ঈশ্বর-কৃষ্ণকে আমরা প্রায় সর্বদাই তাঁর মানবিক প্রচ্ছদে দেখতে পাই, প্রায় সর্বদাই তিনি অর্জুন ভীম যুধিষ্ঠির বা ধৃতরাষ্ট্রের মতোই কাব্যের একটি 'চরিত্র'রূপে প্রতিভাত হন — আর তাই, যখন তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে — তাও ঘটনার চক্রান্তে, তাঁর খেয়ালখুশি-মতো নয় — তখন আমরা মুগ্ধ বিষয়ে তাকিয়ে থাকি। মৌষলপর্ব বিষয়েও সেই কথা : তার পিছনে আছে সমগ্র অতীত ঘটনাবলির চাপ, আছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গুরুভার দুঃস্মৃতি : মহাভারতের সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে তা আন্তরিক বিধৃত হ'য়ে আছে। ঘটনার এই সুসংবদ্ধ পারম্পর্য বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবতের কবির চেষ্টারও অতীত।

ভাবতে কৌতুক বোধ হয় যে ভাগবতের পঞ্চম অধ্যায়ে মহাভারতের ন্যূনতাপ্রমাণের একটি চেষ্টা আছে। 'আমি মহর্ষি বেদব্যাসের মুখে ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদির ধর্মকথা অনেকবার শুনেছি —' (শুকদেব বলছেন মৈত্রেয় মুনিকে)— 'তৃপ্তি পেয়েছি তাতে তুচ্ছ-সুখাবহ কাহিনী শুনে, আর শোনার অভিলাষ আমার নেই। কিন্তু তাতে উদ্গত কৃষ্ণকথামৃতে আমি তেমন সন্তুষ্ট হ'তে পারিনি। ··· বেদব্যাসও ভগবানের গুণবর্ণনকামনায় মহাভারত রচনা করেন; ··· যারা হরিকথায় আনন্দিত না হয়, তারা ভারতাখ্যানের তাৎপর্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ থেকে যায়।··· অতএব, হে আর্তবন্ধু মৈত্রেয়, ভ্রমর যেমন ফুলে-ফুলে ঘুরে মধুসঞ্চয় করে, আপনিও তেমনি নানা কথার সারসংকলন ক'রে ভগবানের পুণ্যলীলা কীর্তন করুন।' — স্পষ্টত, এই উক্তির প্রণেতা মহাভারতকে ভুল বুঝেছিলেন — ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য আর যা-ই হোক 'ভগবানের গুণকীর্তন' নয় (পুঁথির মধ্যেও সে-রকম কথা উল্লিখিত নেই) এবং অন্য কবিদের অপরিমিত ভক্তিপ্রলেপও কৃষ্ণের সেই রহস্যময় দ্বৈত রূপটিকে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে পারেনি, যা মহাভারতের দ্বন্দ্বময় বিপুল নাটকের মধ্য দিয়ে ঘটনার আঘাতে-সংঘাতে বিবর্তিত ও উন্মোচিত হয়েছে।

কৃষ্ণ-কাহিনীর একটি বৌদ্ধ প্রকরণ রচিত হয়েছিলো, তার মূল তথ্যগুলি ভাগবত ও মহাভারতের সঙ্গে মিলে যায়; অনেক নামও এক অথবা অনুরূপ। কাহিনীর সমাপ্তিও যদুবংশধ্বংসে (জাতকে তাঁরা অন্ধক-বিষ্ণুদাসের বংশ ব'লে কথিত); এখানেও আছে ঋষির অভিশাপ ও রাজপুত্রের কুক্ষি-প্রসূত কাষ্ঠখণ্ড; আছে সমুদ্রতীরে এরকা-তৃণ দ্বারা পরস্পর-সংহার, কিন্তু মহাভারতীয় অনিবার্যতার আভাসমাত্র নেই — সাধারণত শিথিলগঠন জাতকপর্যায়েও এই ঘট-জাতকটি বিশেষভাবে অসংলগ্ন।

২১ : ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য : দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য

'গ্যেটের ছিলো ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য, আর হেল্ডার্লিন-এর — দারিদ্র্যেব ঐশ্বর্য।' —নর্বার্ট ফন হেলিনগ্রাথ

'আমাদের বান্ধবগণ বিনষ্ট হয়েছে, পাঞ্চালগণ উৎসন্ন, চেদি ও মৎস্যবংশ নিঃশেষ।' — এই ব'লে আক্ষেপ করেছিলেন যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর সঙ্গে তাঁদের আরণ্যক আশ্রমে তাঁর সাক্ষাৎ হ'লো যখন (আশ্রম: ৩৬)। তাঁর যুদ্ধপরবর্তী নির্বেদ তাঁকে তখনও ছেড়ে যায়নি, বানপ্রস্থাবলম্বী প্রাচীনদের সান্নিধ্যে এসে তাঁর নতুন ক'রে অভিলাষ জেগেছে বৈরাগ্যে, মনে হচ্ছে তাঁর নিজের পক্ষেও অরণ্যবাস সবচেয়ে ভালো; তাঁর মুখে আমরা আরো একবার শুনলাম এই লোকশূন্য পৃথিবীর প্রতিপালনে তাঁর কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। একটিমাত্র সান্ত্বনা তবু আছে তাঁর: বাসুদেবের কৃপায় বৃষ্ণিকুল এখনো আয়ুষ্মান, শুধু তাঁদেরই কথা ভেবে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যবাস সার্থক মনে হয়। প্রাচীন-প্রাচীনাদের নির্বন্ধাতিশয্যে, আর হয়তো কৃষ্ণের পুনর্দর্শন-কামনায়, যুধিষ্ঠির ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে, ছ-মাস পরে কুরুপিতা ও মাতৃদ্বয়ের মৃত্যুসংবাদ পেলেন নারদের মুখে — তারপব মৌষলপর্ব। 'কৃষ্ণের কৃপায় বৃষ্ণিবংশ এখনো স্বস্থ —' ব্যঙ্গে ও বেদনায় মিশ্রিত হ'য়ে এই আশ্বাস-বাক্য এক নতুন অর্থে প্রতিভাত হ'লো।

গীতাকথনের মতোই, যতুবংশধ্বংসের ঘটনাটিও নাটকীয়ভাবে প্রবর্তিত হয়েছে। 'যুদ্ধের পরে ছত্রিশ বছর কেটে গেলো, যুধিষ্ঠির নানা তুর্লক্ষণ দেখতে লাগলেন —' এই সংবাদটুকু জানিয়ে আরম্ভ হ'লো মৌষলপর্ব, আর তারপর — 'কিছুদিন পরে' — যুধিষ্ঠির শুনতে পেলেন যে 'বৃষ্ণিবংশ মুষলপ্রভাবে বিনষ্ট হয়েছে, বলরাম ও বাসুদেব উভয়েই "বিমুক্ত" — অর্থাৎ মৃত।' বিনা ভূমিকায় বলা হ'লো

কথাটা ; যেমন গীতাকথন শুরু হবার আগে সঞ্জয় স্বপ্নচালিতের মতো ব'লে উঠেছিলেন, 'মহারাজ, ভীষ্ম নিহত হয়েছেন!', তেমনি আকস্মিক ও অনলংকৃতভাবে — কিন্তু এখানে ধরনটা অত্যন্ত কেজো ও দ্রুত, যেন কারোরই হাতে আর বেশি সময় নেই, অবিলম্বে দু-একটা জরুরি খবর উক্ত এবং শ্রুত হওয়া দরকার। যুধিষ্ঠির 'শুনতে পেলেন'; কিন্তু কার মুখে কখন শুনলেন, বার্তাবহটি কে এবং কতদূর পর্যন্ত বিশ্বস্ত, অথবা কবে, কোন সময়ে, কেমন ক'রে ঘটলো এই ধ্বংস — এই সবই অনুল্লিখিত রইলো, যুধিষ্ঠিরও কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না ; শুধু কঙ্কালসার তথ্যটুকু যেন হাওয়ায় ভেসে পৌঁছলো তাঁর কানে, এবং সেটুকুই যথেষ্ট, আর প্রয়োজন নেই। 'এখন উপায়?' যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্ন যখন শূন্যে ঝুলে আছে, তাঁর ভাইয়েরা নির্বাক এবং হতবুদ্ধি, আমরা আশা করছি এর পরে কোনো আলোচনা, বা সমাধানের *জন্য* নারদ বা ব্যাসদেবের আবির্ভাব — *ঠিক সেই মুহূর্তে দৃশ্য* বদল হ'লো নৈমিষারণ্যে, আমরা শুনলাম সৌতির মুখে যদুকুলধ্বংসের বিবরণ। বলা বাহুল্য, এখানে আমাদের সহশ্রোতা যুধিষ্ঠির নন, তাঁকে অপেক্ষা করতে হ'লো যতক্ষণ না অর্জুন দ্বারকা থেকে ফিরে এলেন।

মৌষলপর্বের আরম্ভ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে, তার শেষ উক্তিটিও এই যে অর্জুন হস্তিনায় ফিরে যুধিষ্ঠিরকে 'যথাবৃত্ত' নিবেদন করলেন। কিন্তু এখানেও ঐ তথ্যটি শুধু জানানো হ'লো ; অর্জুনের মুখের ভাষা উদ্ধৃত হ'লো না, শোনা গেলো না যুধিষ্ঠিরের কোনো প্রশ্ন বা খেদোক্তি বা বিস্ময়ধ্বনি — শতযোজনব্যাপী কথকতার পর এখানে এসে কবি ব্যয় করলেন ন্যূনতম শব্দ, অর্ধোচ্চারিত অব্যক্তি। অর্জুন-কথিত ঐ বৃত্তান্ত — সত্যি তা 'যথাবৃত্ত' বা আনুপূর্বিক কিনা, বা তা হ'তে পারে কিনা, সে-বিষয়েও সন্দেহ জাগে আমাদের, কেননা অর্জুন যদুকুলক্ষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না — তিনি চোখে দেখেছিলেন

শুধু দ্বারকাপুরীর নিমজ্জন, আর বসুদেবের মুখে যা শুনেছিলেন তা একটি খণ্ডিত বিবরণ মাত্র। মনে রাখা দরকার, বসুদেব নিজেও শুধু সেটুকুই জানতেন যেটুকু কৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন বা বলা দরকার ব'লে ভেবেছিলেন: তিনি ছিলেন তাঁর বার্ধক্যের বিশ্রাম-লালসা নিয়ে অন্তঃপুরে, যখন সমুদ্রতীরে তাঁর পুত্রগণ হত্যা করছে পরস্পরকে, যখন বলরামের সর্পরূপী প্রাণ বহির্গত হ'লো, আর কৃষ্ণ যখন অরণ্যে মৃত্যুশয়ন পেতেছেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ পুত্রদ্বয় যে মৃত, তাও বসুদেব জেনেছিলেন কিনা সন্দেহ[১৩৮]। সঞ্জয়ের মতো কোনো বরপ্রাপ্ত সংবাদজ্ঞাপক তাঁর কাছে ছিলো না, এবং অর্জুনের আগমন পর্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকার মতো প্রাণশক্তি শুধু অবশিষ্ট ছিলো তাঁর; অর্জুনের প্রতি তাঁর ভাষণে বিস্তার বা স্পষ্টতা নেই। মোটের উপর আমরা ধ'রে নিতে পারি যে যুধিষ্ঠির এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ তথ্য অবগত হ'তে পারেননি; নিশ্চয়ই অর্জুনের বর্ণনা থেকে বহু অনুপুঙ্খ বাদ পড়েছিলো, কৃষ্ণ-বলরামের মৃত্যু ঠিক কী-ভাবে ঘটলো তাও খুব সম্ভব উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু যুধিষ্ঠির যেন নিজের মনে সব বুঝে নিয়েছিলেন, সব ধারণা ক'রে নিতে পেরেছিলেন, যেন এর জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন তিনি। এবং, যা আমাদের পক্ষে আশাতীত, এই মর্মবিদারক বার্তাটি যে-মুহূর্তে তিনি শুনতে পেলেন তখন থেকেই এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটলো তাঁর মধ্যে।

এতদিন তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেশি শোকপ্রবণ, অতি সহজে ক্রন্দনের বশবর্তী, এবং সন্তাপের বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধহীন যে কচিৎ-দৃষ্ট ঘটোৎকচের মৃত্যুতেও তাঁর বেদনাবেগ উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিলো (দ্রোণ: ১৮৪)। এবং ছিলেন — দুঃখের বিষয় বিশেষণসমূহের পুনরুক্তি না-ক'রে উপায় নেই এখানে — অতিমাত্রায় দ্বিধান্বিত ও অব্যবস্থিত, অতিমাত্রায় সাহায্যপ্রার্থী ও পরামর্শলিপ্সু।

শান্তিপর্বের শুরুতে তাঁর বিলাপ আমাদের যতই না শ্রদ্ধেয় ব'লে মনে হ'য়ে থাক, তাঁর রাজ্যাভিষেকের পর থেকে, শান্তিপর্ব ও সারা অনুশাসনপর্ব জুড়ে, তাঁকে ভীষ্মের কাছে দীনভাবে উপদিষ্ট হ'তে দেখে আমাদের মনে হয়েছিলো তিনি বুঝি চিরজীবন শুধু ছাত্র থেকে যাবেন, কখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন না। তাঁর এই সব দুর্বলতার এত নিদর্শন আমরা এ-পর্যন্ত দেখে এসেছি যে এ-নিয়ে অধিক আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। আর এখন কৃষ্ণের তিরোধান ঘটেছে, তাঁর চিরকালীন বন্ধু ও অপরিহার্য উপদেষ্টাকে আর কখনো চোখে দেখবেন না যুধিষ্ঠির, আঠারো-দিন-ব্যাপী মহাযুদ্ধে এমন একটি ক্ষতিও তাঁর হয়নি যা কোনো দিক থেকেই এর সঙ্গে তুলনীয় : আমরা ভেবেছিলাম এই আঘাতে তিনি একেবারে এলিয়ে পড়বেন, খ'সে যাবে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি, জগৎসংসার শূন্য হ'য়ে যাবে। কিন্তু — আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি — এ-মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠে কোনো বিলাপ নেই, চক্ষুতে নেই লেশমাত্র সজলতা, মুখে নেই বেদনার কোনো চিহ্ন : মনে হয় তিনি এখন শোকাতিক্রান্ত ও আত্মসমাহিত ; মনে হয় এতদিনে, এতকাল পরে, তাঁর জীবনের সর্বশেষ সংকটের সময় তিনি অর্জন করলেন স্বাবলম্বিতা ও কর্তৃত্ব ; তাঁকে সান্ত্বনার জন্য ম্লান মুখে নানা জনের দিকে তাকাতে হয় না আর — সত্যি বলতে, তাঁর সান্ত্বনার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। এখন তিনি নিজেই আদেশকর্তা, তাঁর অব্যবহিত কর্তব্য বিষয়ে মনস্থির করতে তাঁর মুহূর্তকাল দেরি হ'লো না ; তাঁর জীবনে এই প্রথমবার — কিংবা বলা যাক তাঁর সভাপর্বের দ্যূতোন্মাদনার পরে প্রথমবার — তিনি অন্য কারো পরামর্শ না-নিয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন। যেমন কৃষ্ণ ছিলেন আত্মীয়নিধনের সময়, তেমনি শান্ত এখন যুধিষ্ঠির, এবং তিনি যে-কর্মপন্থাটি বেছে নিলেন সেটি কর্মবিরতিরই নামান্তর — তাও কৃষ্ণেরই মতো।

'কালঃ পচতি ভূতানি সর্বাণ্যেব মহামতে। কালপাশমহং মন্যে ত্বমপি দ্রষ্টুমর্হসি॥' (মহা: ১: ৩) — সংস্কৃতের আশ্চর্য সংহতি বাংলাভাষার অগম্য[১৩৯]; কালীপ্রসন্নর বাহুল্যগুলি ছেঁটে ফেলে হয়তো বলা যায়: 'কালই বিনষ্ট করে সর্বপ্রাণীকুল, আমিও সেই কালের কবলে পতিত হবো। অর্জুন, তুমি যথাকর্তব্য স্থির করো।' যুধিষ্ঠিরের এই কথাটি শোকার্ত মানুষের উচ্ছ্বাস নয় — এখানে একটি সুচিন্তিত স্থির সংকল্পের ঘোষণা শোনা গেলো; পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে যে কৃষ্ণও 'কালপর্যায়' লক্ষ ক'রে যাদবদের ব্যভিচারে কোনো বাধা দেননি। আমাদের কানে এখনো ধ্বনিত হচ্ছে ভীম-অর্জুনাদির রূঢ় প্রতিবাদ, শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির যখন সন্ন্যাসের পথে নিষ্ক্রান্ত হ'তে চেয়েছিলেন; কিন্তু এ-মুহূর্তে কারো মুখ থেকে একটি বিরুদ্ধ বাক্য বেরোলো না, তাঁরাও যুধিষ্ঠিরের মতো প্রাণত্যাগের সংকল্প নিলেন। — কিন্তু ঘটনাটা সত্যি কি প্রাণত্যাগ, আক্ষরিক অর্থে মৃত্যু, না কি আসক্তিমোচন, বন্ধনছেদন, মুক্তি-অভিযান? আমরা তা জানি না এখনো, কোথায় তাঁরা চলেছেন তা জানি না; শুধু দেখছি যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে তাঁরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন — দ্রৌপদী ও চার ভাই, বিনা তর্কে ও নিঃশব্দে, যেন এই যাত্রা এমন অমোঘ যে এ-বিষয়ে কারোরই কিছু বলার নেই; প্রজারাও কেউ মুখ ফুটে বলতে পারলো না, 'মহারাজ, ফিরে চলুন।' কিছুদূর পর্যন্ত তাঁদের সহযাত্রী হ'য়ে নাগরিকেরা একে-একে ফিরে এলো স্বগৃহে; যেমন রামের বনযাত্রার সময়ে অযোধ্যায়, ও পাণ্ডবদের দ্যূত-পরবর্তী নির্বাসনের প্রাক্কালে হস্তিনাপুরে বিলাপধ্বনি তুলেছিলো জনগণ, পাণ্ডবদের এই শেষ বিদায়ের সময়ে সে-রকম কিছুই শোনা গেলো না; বাতাস এখন অফেন ও অনার্দ্র, নম্রতম স্বর ও মৃদুতম ভঙ্গি ছাড়া আর-কিছুরই স্থান নেই, জড় জগৎ যেন তার আত্মিক নির্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং সেই নির্ভার

জগতে, অতি লঘু পা ফেলে-ফেলে নগরসীমা পেরিয়ে এগিয়ে চললেন পাঁচটি পুরুষ ও একটি নারী — এবং একটি কুকুর তাঁদের পিছন-পিছন চললো।

মহাভারতের অন্তিম পর্বগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র[১৪০], কিন্তু ঘটনায় ও ইঙ্গিতে খুব ঘন ; তাদের পরতে-পরতে অনেক পূর্বস্মৃতি কাজ ক'রে যাচ্ছে : আমরা যা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম তা নতুন অর্থ নিয়ে আঘাত করছে আমাদের মনের উপর ; মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে জগতের যে-সব সম্বন্ধ আমরা বুঝে নিয়েছি ব'লে ভেবেছিলাম, এখন দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে আরো রহস্য লুকিয়ে ছিলো। এ-রকম একটি রহস্য হলেন আমাদের চিরচেনা অর্জুন ; কেননা এই শেষ ধাপে এসে তাঁরও মধ্যে পরিবর্তন ঘটলো — যুধিষ্ঠিরের মতো উদ্বর্তন নয়, বরং বলা যায় পতন অথবা দরিদ্রীকরণ। যুধিষ্ঠির এমন-কিছু অর্জন করলেন যা পূর্বে তাঁর অধিকারভুক্ত ছিলো না, আর অর্জুন হারাতে-হারাতে চললেন যা-কিছু তাঁর জীবন-জোড়া সম্পদ ছিলো। দুই ভ্রাতার মধ্যে প্রতিতুলনার সূত্রটিকে ব্যাসদেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লুপ্ত হ'তে দেননি ; তাঁদের মুখে বিভিন্ন সময়ে প্রায় একই কথা বসিয়ে সেটি আরো স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন।

'কেশব, আমি স্থির থাকতে পারছি না, আমার মন ঘূর্ণিত হচ্ছে, আত্মীয়বধে কোনো শ্রেয়োলাভ আমি দেখতে পাচ্ছি না।' কার কথা এ-সব ? উত্তর দিতে কোনো পাঠকের দেরি হবে না, কেননা গীতার শ্লোকগুলি কাব্যের এমন উঁচু পর্দায় বাঁধা যে একবার শুনলেও ভুলে যাওয়া সহজ নয়। 'আমি চাই না জয়, চাই না রাজ্য, চাই না সুখ। জীবনধারণেরই বা কী-প্রয়োজন আমাদের, কেননা যাঁদের জন্য রাজ্যসুখ আমাদের কাম্য, সেই আত্মীয়গণ স্বজনগণ ও আচার্যগণই প্রাণের আশা পরিত্যাগ ক'রে এখানে উপস্থিত। ··· মধুসূদন, আমি কী ক'রে ভীষ্ম-দ্রোণকে অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করবো ? এর চেয়ে ভিক্ষান্ন খেয়ে

বেঁচে থাকলেও আমাদের মঙ্গল হবে। এই যুদ্ধে আমরা যদি জয়লাভ করি, অথবা এঁরা আমাদের পরাজিত করেন — এ-দুয়ের মধ্যে কোনটা শ্রেয় বুঝতে পারছি না। শত্রুহীন সমৃদ্ধ রাজ্য এবং এমনকি স্বর্গের আধিপত্য পেলেও আমার এই ইন্দ্রিয়শোক নিবারিত হবে কী ক'রে?' (গী: ১ : ৩০-৩৪, ২ : ৪-৬, ৮)। — এমনি সব কথা বলেছিলেন অর্জুন, এক প্রবল উত্তাল আলোড়নের মুহূর্তে নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেন; আর যুধিষ্ঠির, যিনি গীতা শোনেননি, তাঁরও মুখ থেকে কোনো-এক সময়ে এই ভাষাই নিঃসৃত হয়েছিলো।

যুধিষ্ঠির-বিলাপের অংশটি ইতিপূর্বে উল্লিখিত ও আলোচিত হ'য়ে গেছে[১৪১], তবু তুলনার সুবিধের জন্য দু-একটি কথা আবার উদ্ধৃত করছি। 'এই যে আমরা জয়ী হলাম সেটাই আমাদের পরাজয়, আর জয়ী হ'লো তারাই, যারা পরাজিত। ··· আমরা আত্মঘাতী, কৌরবদের সংহার ক'রে নিজেরাই বিনষ্ট হয়েছি; আমাদের জয়লাভ হয়নি, তারাও জয়ী হ'তে পারলো না। জ্ঞাতিবর্গকে নিঃশেষ ক'রে বান্ধব-হীন অবস্থায় ত্রিলোকের কর্তৃত্ব পেলেই বা কী-লাভ হবে আমাদের? চলো, অর্জুন, চলো আমরা ভিক্ষার জন্য পর্যটন করি।'— কথাগুলো এক, কিন্তু দুই ভ্রাতার অবস্থার মধ্যে তফাৎটা খুব স্পষ্ট। ভীষ্মপর্বে অর্জুনবিষাদের কারণ ছিলো তাঁর কল্পনা — তখন পর্যন্ত একটিও বাণ নিক্ষিপ্ত হয়নি: যেমন কোনো সংকটের সময় আমরা ক্ষুদ্রজনেরা বিহ্বল হ'য়ে পড়ি আতঙ্কে, হারিয়ে ফেলি দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করার শক্তি, উপস্থিত কর্তব্য ভুলে সংকট আরো কঠিন ক'রে তুলি, অর্জুনের যুদ্ধবিমুখতাকেও তেমনি মনে হয় স্নায়বিক বৈকল্য শুধু — বীরোচিত নয়, তাঁর পক্ষে বস্তুতই ধর্মভ্রংশ, অপস্মার। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের উক্তির পিছনে বিস্তীর্ণ হ'য়ে আছে কুরুক্ষেত্র; তাঁর যুদ্ধ-পরবর্তী শোচনায় তিনি প্রত্যাবৃত হলেন তাঁর স্বভাবে, যাকে তিনি উদ্যোগ থেকে শল্যপর্ব পর্যন্ত নিপীড়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এবং শুধু কৃতকর্মের জন্য শোচনাই নয় — যেহেতু অনেক হত্যা ও অনেক মৃত্যু তিনি পেরিয়ে এসেছেন, তাই তাঁর দুঃখের তলায় লুকোনো আছে দুটি-একটি উপলব্ধিও, যা তিনি চান তাঁর নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে, যদিও যথাযোগ্য অবকাশ তাঁকে দেয়া হচ্ছে না এখনো ; এখনো অনেক প্রহরী তাঁকে ঘিরে আছে। কিন্তু তবু, অর্জুন যেমন কৃষ্ণের কথা শুনে শোকমুক্ত হয়েছিলেন (এবং অবিলম্বে ভুলেও গিয়েছিলেন সেই কথাগুলো), সে-রকম কোনো চিকিৎসা বা বিস্মৃতি থেকে বঞ্চিত রইলেন যুধিষ্ঠির ; তাঁর শোক চললো তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে — ভীষ্মের সব উপদেশের মধ্য দিয়ে ব'য়ে যেতে লাগলো অস্পষ্ট-শ্রুত দীর্ঘশ্বাসের মতো, ঝরা পাতার নিস্বন তুলে ছড়িয়ে পড়লো যজ্ঞের প্রাঙ্গণে, এক গর্তবাসী বেজির বিদ্রূপে আমরা যুধিষ্ঠিরের মনের কথারই প্রতিধ্বনি শুনলাম। 'প্রয়োজন নেই — আর প্রয়োজন নেই !' স্পন্দিত হ'লো বাতাসে এই অব্যক্ত নির্দেশ, এই প্রত্যাহরণের ঘোষণা। তা শুনতে পেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, বহুদিন ধ'রে মনে-মনে শুনছিলেন : সেই কারণেই রাজ্যভার আরো দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিলো তাঁর পক্ষে ; সেই কারণেই তাঁর চিরপ্রিয় গার্হস্থ্য থেকে তিনি চ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুন তা শুনতে পাননি, শুনে থাকলেও বুঝতে পারেননি, কখনো বুঝে থাকলেও মনে রাখতে পারেননি ; অনুগীতা-কথনের আগে কৃষ্ণ যে তাঁকে 'শ্রদ্ধাহীন ও নির্বোধ' বলেছিলেন (আশ্ব : ১৬), সেই তিরস্কার অর্জুনের প্রাপ্য ছিলো বলা যায়। আমরা লক্ষ করি, শল্যপর্বের পর থেকেই কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব যেমন খণ্ডিত, তেমনি অর্জুনের ভূমিকাও সংকুচিত হ'য়ে আসছে, আর যুধিষ্ঠিরের সত্তার ঘটছে সম্প্রসারণ ; কোনো-এক অন্ধকার অর্জুনকে ঘিরে ফেলছে মনে হয়, এদিকে যুধিষ্ঠির এক নিষ্কম্প্র অন্তর্নিঃসৃত প্রভায় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠছেন, কোনো সংশয়, কোনো বিক্ষোভ আর নেই তাঁর : যাকে

এতদিন আমরা তাঁর দুর্বলতা ব'লে জেনেছি, এখন দেখছি তাঁর সেই চৈতন্যেই তিনি বলীয়ান; আমরা বুঝে নিলাম মহাভারতের অন্তিম মুহূর্তটিকে সহ্য করার মতো ক্ষমতা যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কারোরই ছিলো না।

এমন নয় যে অর্জুনের মনে কখনোই কোনো আলোকবিন্দু জ্ব'লে ওঠেনি। আশ্বমেধিক পর্বে, চর্বিতচর্বণ অনুগীতা শোনার পরে অর্জুন বলছেন (অ: ৫২): 'হে মধুসূদন! তুমিই এই পৃথিবী ও স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ; ··· তোমার প্রাণই সতত-গতিশীল বাতাস, তোমার প্রসাদই নিত্যশ্রী, তোমার ক্রোধই সনাতন মৃত্যু। ··· হে জনার্দন! আমার জয় তোমারই কীর্তি, তোমার বুদ্ধি ও বিক্রমেই কর্ণ দুর্যোধন ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ নিহত হয়েছিলেন।' — সালংকার কাব্যরীতিতে রচিত এই অংশটি কেমন গতানুগতিক শোনাচ্ছে, মনে হয় যেন অর্জুনের মুখে এই কৃষ্ণ-স্তবটি বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো, এটা তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ নয়; কিন্তু মৌষলপর্বের অষ্টম ও শেষ অধ্যায়ে ব্যর্থতার দুর্বিষহ ভারে অবনত এক অর্জুন ব্যাসদেবকে যে-ক'টি কথা বলেছিলেন, তাতে বোঝা গিয়েছিলো তাঁর জীবনবৃত্তকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মুখোমুখি — অন্তত সেই মুহূর্তে, ক্ষণিকের জন্য। হায় সেই 'কৃতকার্যতা', যা দুর্যোধনবধের পরে কৃষ্ণের দ্বারা ঘোষিত হয়েছিলো — কী সুতীক্ষ্ণভাবে শোচনীয় তার শেষ পরিণাম! 'দস্যুরা[১৪২] হরণ ক'রে নিলো নারীদের, আমি গাণ্ডীবে শরযোজনা করতে পারলাম না, আমার অক্ষয় তূণ নিঃশেষিত হ'লো। যে-পীতবসন দ্যুতিমান পুরুষ আমার রথের আগে ছুটে-ছুটে শত্রুসৈন্যকে দগ্ধ করতেন, আমি আর তাঁকে দেখতে পেলাম না। তিনিই বিনষ্ট করতেন তাদের, আমি শুধু (মৃতের উপরে) শরক্ষেপ করতাম। তাঁর অদর্শনে আমি এখন অবসন্ন, আমার সব দিক শূন্য হ'য়ে গেছে, আমার হৃদয়ে আর শান্তি নেই[১৪৩]।' — সেই যে একবার অর্জুন দেখেছিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ

প্রভৃতি যোদ্ধাদের কৃষ্ণের ব্যাদিত মুখে প্রবিষ্ট হ'তে (গী : ১১), অকস্মাৎ কি সে-কথা তাঁর মনে প'ড়ে গিয়েছিলো? কিন্তু তথ্য হিশেবে আমরা জানি যে কৃষ্ণ নিজের হাতে কুরুক্ষেত্রে কাউকে মারেননি, তাঁর যন্ত্র বা 'নিমিত্ত' স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন অর্জুনকে, যেন স্মিতহাস্যে ও সকৌতুকে তাঁর বয়স্যকে তুলে ধরেছিলেন অন্য সব যোদ্ধার চাইতে অনেক উঁচুতে : এত সহজ ছিলো কৃষ্ণের এই দান, এত অজস্র ও অযাচিত ও সংশয়হীন যে অর্জুন এতদিন তা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারেননি; আজ তাঁর চির-অভ্যস্ত জয় থেকে স্খলিত হওয়ামাত্র তাঁর মনে হ'লো তিনি নিজে কিছুই নন — কৃষ্ণই সব। এটাও তাঁর ক্ষণিকের অনুভূতিমাত্র, এবং এক নিষ্ফল অনুভূতি : তাঁর মনে গ'ড়ে উঠলো না যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তুলনীয় কোনো অভিনিবেশ; কৃষ্ণের অপসরণে তিনি সন্তপ্ত হলেন, কিন্তু তার আসল অর্থটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলেন না। দৃপ্তি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, নতিস্বীকারে অভ্যস্ত হননি কখনো, কোনো অর্ধকাঞ্চনময় নকুলের সংকেত তাঁর পক্ষে বোধগম্য নয় : ব্যাসদেবকে তাই স্পষ্ট ভাষায় ব'লে দিতে হ'লো যে তিনি, জগৎবিখ্যাত অর্জুন, তিনিও এখন নিঃশেষিত ও নিষ্প্রয়োজন।

অর্জুন বিষয়ে সব কথাই আগে বলা হ'য়ে গেছে। তিনি অসাধ্য সাধক, তিনি ক্ষত্রিয়ের সর্বগুণে ভূষিত, কীর্তিকিরীটধারী মনোমুগ্ধকর এক পুরুষ তিনি — তাঁর জীবনকাহিনীর সারাংশমাত্র জানলেও এই কথাগুলি মেনে নিতে কারো বাধবে না। শুধু একটি তথ্য অর্ধাচ্ছাদিত ছিলো এতদিন, তাঁরই শরজালের নিবিড়তায় আচ্ছন্ন ছিলো বলা যায়; আমরা তা ঢাকতে কখনো দেখতে পেয়ে থাকলেও তা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পাইনি[১৪৪] : সেটি এই যে তিনি কৃষ্ণের এক ক্রীড়নকমাত্র, কৃষ্ণের আত্মপ্রকাশের একটি উপলক্ষ শুধু; — তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির একটিও উপার্জিত নয়,

উপহারপ্রাপ্ত; তাঁর মুকুটের উজ্জ্বলতম সব রত্নই কৃষ্ণের দ্বারা সন্নিবিষ্ট হয়েছিলো। এই কথাটা তাত্ত্বিক দিক থেকে সমস্ত মানুষ বিষয়েই প্রয়োজ্য হ'তে পারে — অন্তত গীতায় তা-ই বলা হয়েছে[১৪৫]: কিন্তু মহাভারতে আর-কোনো চরিত্র নেই যাকে নিয়ে কৃষ্ণ (বা কৃষ্ণ-নামাঙ্কিত ঈশ্বর) এমন ধারাবাহিক একটি খেলা খেলেছেন; ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভীম দুর্যোধনেরা তাঁদের সব ভালো-মন্দ নিয়ে তাঁদেরই স্বপ্রকাশ ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টিকে আরো একটু অনুধাবন করলে আমরা এই অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াই যে বীর অর্জুনই সবচেয়ে কম স্বাবলম্বী এবং সবচেয়ে বেশি পরমুখাপেক্ষী; তাঁর তুলনায় 'ভীরু দুর্বল' যুধিষ্ঠিরকেই স্বনির্ভর ব'লে আমাদের মনে হচ্ছে এখন — কেননা মহাপ্রস্থানিক পর্বে, ভীষ্ম বিদুর কৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত, চঞ্চলবসনা হিতৈষিণী পাঞ্চালীও নির্বাক, তখন যুধিষ্ঠির একাই তাঁর সংকটের সমাধান করতে পারলেন, কোথাও কোনো সাহায্যকারী নেই ব'লে উদ্বিগ্ন হলেন না। কিন্তু — এই কথাটা এতক্ষণে বলার সময় হ'লো — এ-রকম কোনো বিশুদ্ধ সক্রিয় কর্ম অর্জুনের জীবনে একটিও নেই: সবই তাঁর জন্য ক'রে দেওয়া হয়েছিলো, তাঁর বিঘ্নহীন পথ বহু যত্নে রচনা ক'রে দিয়েছিলেন অন্যেরা, তিনি শুধু পথের বাঁকে-বাঁকে জয়মাল্যগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্বে কৃষ্ণের একটি উক্তি সংক্ষেপিত আকারে উদ্ধৃত করেছিলাম[১৪৬], এবারে সম্পূর্ণ কথাটা পাঠকদের গোচরে আনতে চাই। কর্ণবধ বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন (দ্রোণ: ১৮১): 'আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য জরাসন্ধ ও মহাত্মা শিশুপাল, মহাবাহু নিষাদ একলব্য, এবং হিড়িম্ব কির্মীর বক অলায়ুধ, ও উগ্রকর্মা ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসদের[১৪৭] নানা উপায়ে বধ করেছি।' বাক্যটির মধ্যে অনেক কৌতুক বিচ্ছুরিত হচ্ছে; প্রথমত, উক্ত

ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষ্ণ স্বহস্তে নিধন করেছিলেন শুধু শিশুপালকে; হিড়িম্ব কির্মীর বক অলায়ুধের মৃত্যুর সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিতও ছিলেন না, এবং একলব্যের মৃত্যুপ্রতিম অঙ্গুষ্ঠ-কর্তনের সময়ে তিনি মহাভারতীয় কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ পর্যন্ত করেননি। যে-সব কর্ম সাধন করলেন অন্যেরা, সেগুলি তিনি তাঁরই স্বকৃত ব'লে ঘোষণা করলেন — যেন দ্রোণ ভীষ্ম অর্জুনেরা তাঁরই উদ্ভাবিত 'উপায়' ছাড়া আর-কিছু নন। আর তারপর: বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জরাসন্ধ ও শিশুপাল, নিষাদরাজপুত একলব্য — যাঁদের বিষয়ে কৃষ্ণকে মনে হয় সশ্রদ্ধ — তাঁদের সঙ্গে রাক্ষসপুত্র ঘটোৎকচ ও নগণ্য বক কির্মীর ইত্যাদি সকলকেই যে একই নিশ্বাসে যুক্ত করা হ'লো এর এক মাত্র অর্থ আমরা এই করতে পারি যে পাণ্ডবদের যে-কোনো শত্রু এবং অর্জুনের যে-কোনো সম্ভবপর প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণের মতে বধযোগ্য; তাই তিনি, কৃষ্ণ-অর্জুনের হিতসাধনার্থে এই হত্যাকাণ্ডগুলিকে ঘটিয়ে তুলেছিলেন। যে কোনো উপায়ে, যে-কোনো অন্যায় ও অবিচার দ্বারা অর্জুনকে বড়ো করে তুলতে হবে, এ-রকম একটি পরিকল্পনা ত্রিলোকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে ব'লে মনে হয়; কেননা শুধু কৃষ্ণ নন, পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ, পাতালবাসিনী নাগরাজকন্যা উলূপী, গন্ধর্ব অঙ্গারপর্ণ ও চিত্রসেন, এবং স্বর্গের প্রধানতম দেবতারা — সকলেই বিশেষভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে অর্জুনের পক্ষপাতী। অর্জুনের জয়যাত্রার পথে প্রথম বলি একলব্য (আদি : ১৩২): সেই শ্যামলকান্তি নিষ্ঠাবান নিষাদ-বালক, আচার্যহীন মৌলিক প্রতিভায় ধনুর্বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন ছাড়া অন্য কোনো অপরাধ যে করেনি, এবং সেই অপরাধেই দ্রোণ যাকে ক্ষত্রিয়োচিত হৃদয়হীনতায় বিনষ্ট করলেন কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত করুণার সঙ্গে শাপমুক্তির কোনো উপায় ব'লে দিলেন না। সেই অরণ্যে প'ড়ে রইলো একলব্য, লোষ্ট্রের মতো জড়ীভূত ও প্রতিবাদহীন, ধীরে-ধীরে

পৃথিবীর ধুলোয় মিশে গেলো ; আমরা দ্বিতীয়বার তার বিষয়ে কিছু শুনলাম না। এবং আছেন অন্য একজন, একলব্যের চেয়ে অনেক বড়ো, যে-কোনো মুহূর্তে অর্জুনকে অতিক্রম করার যোগ্যতা নিয়ে যিনি জন্মেছিলেন — এবং যাঁকে তাঁর গর্ভধারিণী নিজের হাতে ঠেলে দিয়েছিলেন অপমান ও অবজ্ঞা ও পরাজয়ের পথে : কুন্তী — কুন্তী নিজে চক্রান্তকারীদের একজন, অর্জুনকে জিতিয়ে দেবার জন্য তিনিও তাঁর প্রথম-জাত মহৎ পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি সূতপুত্র, তিনি অনভিজাত — এই অপবাদে অস্ত্রপরীক্ষার সভামণ্ডপ থেকে বিতাড়িত হলেন কর্ণ (আদি : ১৩৬-১৩৭); পাঞ্চালনগরে স্বয়ংবর-সভায় দ্রৌপদী তাঁকে নিজের মুখে প্রত্যাখ্যান করলেন[১৪৮] (আদি : ১৭৮); — তবু কুন্তী রইলেন নীরব ; নিজে কলঙ্ক থেকে গা বাঁচিয়ে পুত্রের মাথায় ঢেলে দিলেন গ্লানি লজ্জা অবমাননার পুঞ্জ। অর্জুনের সঙ্গে ঋজু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একবারও নামতে দেয়া হ'লো না কর্ণকে ; কর্ণের উপর অর্জুনের জয় নিশ্চিত ক'রে তোলার জন্য প্রাণ নিতে হ'লো সাক্ষাৎ বৃকোদরতনয় পাণ্ডবসহায় ঘটোৎকচের — কেননা সকলেরই মনের তলায় এই কথাটা লুকিয়ে আছে যে কর্ণের তুলনায় অর্জুন দুর্বলতর প্রতিপক্ষ ; এ-দু'জনের মধ্যে সরল যুদ্ধ ঘটলে অর্জুন রক্ষা পাবেন না। দেবতারা কত না অস্ত্র দান করলেন অর্জুনকে, এদিকে এক ছদ্মবেশী প্রতারক দেবতা হরণ ক'রে নিলেন কর্ণের সহজাত পিতৃদত্ত বর্ম ও যুগল কুণ্ডল — বিনিময়ে দক্ষিণ হস্তে যা দান করলেন তাও ফিরিয়ে নিলেন বাম হস্তে। উর্বশী-দত্ত অভিশাপ দ্বারাও উপকৃত হলেন অর্জুন — অজ্ঞাতবাসের বছরটিতে সেই নপুংসকত্বই তাঁর প্রচ্ছদের কাজ করলো ; কিন্তু কর্ণের জীবনে পরশুরামের অভিশাপ হ'লো মারাত্মকভাবে ফলপ্রসূ[১৪৯]। — কিন্তু কেন, কেন অর্জুনের প্রতি ত্রিলোকবাসীর এই পক্ষপাত ? তাঁর মধ্যে কোনো বিশেষ নৈতিক অথবা হার্দ্য গুণ কখনো লক্ষিত হয়েছে কি ? কিছু মাত্র নয় — বরং

নারীত্বের মদিরায় ম'জে অতি সহজে তাঁর ব্রহ্মচর্য-পণ ভেঙেছিলেন তিনি, একলব্যের অঙ্গুষ্ঠকর্তনে বিবেকবোধহীন বালকের মতো হেসেছিলেন। দ্রোণ কথা দিয়েছিলেন অর্জুনের তুল্য কোনো যোদ্ধা থাকবে না — তার কি কোনো বিশেষ কারণ ছিলো? কিছুই না — একমাত্র কারণ : দ্রোণ তাঁর সব শিষ্যের চেয়ে অর্জুনকে বেশি ভালোবাসতেন। যেমন দ্রোণ, ভীষ্মও তেমনি অকারণে অর্জুনের অনুরাগী : শরশয্যায় শুয়ে তিনি যে পানীয় জল প্রার্থনা করলেন (ভীষ্ম : ১২৩), সেটাও অর্জুনের টুপিতে একটা বাড়তি পালক গুঁজে দেবারই কৌশলমাত্র : সেই উপলক্ষে কুরুপিতামহ আরো একবার অর্জুনের প্রশংসা ও দুর্যোধনের নিন্দা করার সুযোগ পেলেন। ভীষ্ম কেন অন্তিম শয়নেও অর্জুনের ডঙ্কায় নিনাদ না-তুলে পারলেন না, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই সত্যি বলতে ; এই প্রশ্ন তোলার অধিকারও বোধহয় নেই আমাদের। আমাদের মেনে নিতে হবে অর্জুন বিশ্বপ্রকৃতির আদুরে ছেলে, স্বভাবতই দেবগণের প্রিয়পাত্র ; তিনি সেই অতি বিরল মানুষদের একজন, যাঁকে ভাগ্যদেবীরা হাজার হাত উজোড় ক'রে দান করেন যা-কিছু মানুষের কাম্য হ'তে পারে। যেমন গ্যেটে সব-কিছু প্রাপ্ত হয়েছিলেন — শুধু প্রতিভা নয়, সেই সঙ্গে আরো অনেক-কিছু যা কবিদের ভাগ্যে সাধারণত জোটে না : স্বাস্থ্য, আয়ু, যশ, কান্তি ও এমনকি বিত্তের প্রাচুর্য — পেয়েছিলেন সব দীনতা ও মালিন্যের উর্ধ্বে রাজার মতো জীবন, আর বহু নারী যাদের অন্তঃসার নিংড়ে নিয়ে তাঁর প্রেরণার অনলকে তিনি দীপ্ত রেখেছিলেন : যেমন তাঁর সম্ভবপর সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রকৃতি দেবী অপসৃত করেছিলেন একে-একে — শিলার-এর অকালমৃত্যু ঘটিয়ে, হ্যেল্ডার্লিনকে যৌবনেই উন্মাদরোগে বন্দী ক'রে দিয়ে, হাইনেকে এক অকথ্য পীড়ায় শৃঙ্খলিত ক'রে — যাতে গ্যেটে হ'তে পারেন তাঁর চেয়ে ভালো কবিদের উপর বিজয়ী — তেমনি একটি আশ্চর্য রূপকথা অর্জুনের

জীবনেও চিত্রিত হ'য়ে আছে। অথবা, আরো সংগতভাবে ও সার্থকভাবে এ-কথাও বলা যায় যে অর্জুন আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের ফাউস্ট — দুঃখের বিষয় এক অচেতন ফাউস্ট : তিনি জ্ঞানত বিশ্বজয়ী হ'তে চাননি, বিজয়ী ভূমিকা আরোপিত হয়েছিলো তাঁর উপর — এবং তাঁর জীবনে যিনি মেফিস্টোফেলেস তিনিই গ্রীকদের ভাষায় তাঁর 'দাইমোন' বা অন্তঃপ্রতিভা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জীবন-দেবতা, এবং হিন্দুর ভাষায় সেই হৃদিস্থিত হৃষীকেশ, যাঁব হাত দিয়ে সব দেবতার সমস্ত দান অর্জুনের কাছে পৌঁচেছিলো। গ্যেটে তাঁর ফাউস্টের পরিত্রাণ ঘটিয়ে মানবাত্মাকে পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে মহিমান্বিত কবেছিলেন, কিছুটা অযৌক্তিকভাবে ঈশ্বরকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন শয়তানের উপর : কিন্তু হিন্দু দর্শনে শয়তানের যেহেতু স্থান নেই, তাই মহাভারতেব ঈশ্বর-কৃষ্ণকেই মেফিস্টোর ভূমিকা নিতে হ'লো, হ'তে হ'লো নিজেই নিজের বিপরীত, একাধারে অর্জুন-ফাউস্টের বিজয়সাধক ও সংহারকর্তা। টোমাস মান্-এর একটি উপন্যাস[১৫০] থেকে ইঙ্গিত নিয়ে, আমি ফাউস্ট-কাহিনীর এই অর্থ করি যে অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, মানাবক সীমান্তলঙ্ঘী অভীপ্সার জন্য কঠিন মূল্য না-দিয়ে কোনো উপায় নেই — আর অর্জুনের জীবন-চরিতের মধ্য দিয়েও এই কথাটা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে। আমরা দেখে এসেছি কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের প্রতিটি যুদ্ধের সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণ : কোন সময়ে কাকে আক্রমণ বা রক্ষা করতে হবে, কখন কোন অস্ত্রের ব্যবহার সমীচীন, কখন প্রতিদ্বন্দ্বীকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে স'রে পড়া ভালো, কী-উপায়ে মহাযোদ্ধারা বধ্য হ'তে পারেন — এই সব, প্রতিটি অনুপুঙ্খ, কৃষ্ণ ব'লে দিয়েছেন, অর্জুন শুধু আজ্ঞাপালন করেছেন ভৃত্যের মতো। কৃষ্ণ সারথি — ব্যাপকতম, সম্পূর্ণতম অর্থে তা-ই ; তিনিই পরিচালক ও অধিনায়ক — ধৃষ্টদ্যুম্ন নামত মাত্র পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতি — পাণ্ডবের যুদ্ধ

সাধারণভাবে কৃষ্ণেরই যুদ্ধ : কিন্তু কৃষ্ণ বেছে নিয়েছিলেন বিশেষ-ভাবে অর্জুনকে যুদ্ধে বিশ্রামে কর্মে ও প্রমোদে তাঁর নিত্যসঙ্গী — যদিও সেই সম্বন্ধটিকে যথোচিত মর্যাদা দিতে পারেননি অর্জুন [১৫১]। কয়েকদিন আগে, এক অর্বুদ নারায়ণী সেনার বদলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সমর-পরাঙ্মুখ একক কৃষ্ণকে, এটাই অর্জুনের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ সন্দেহ নেই ; কিন্তু এ-ব্যাপারেও তিনি যে বৃত, বরণকারী নন, এই সহজ কথাটা তাঁর বোধগম্য হয়নি : রবীন্দ্রনাথের বালিকা-বধূর মতোই বুদ্ধিহীন, তিনি যেন ধ'রে নিয়েছিলেন এই মধুর খেলাই চলবে চিরকাল। আর তাই, যখন দাম চুকিয়ে দেবার সময় হ'লো, যখন অর্জুনের মেফিস্টোফেলেস তাঁকে পতনের মুখে নিক্ষেপ ক'রে চ'লে গেলেন কিন্তু অন্য কোনো ঈশ্বর স্বর্গের দ্বার খুলে দিলেন না তাঁর জন্য, তখনও অর্জুন বুঝলেন না যে এই দারিদ্র্য তাঁর ঐশ্বর্যের মধ্যেই নিহিত ছিলো, এই নিঃস্বতা ঘটিয়ে কৃষ্ণ তাঁকে শেষ শিক্ষা দিয়ে গেলেন। অভিনয়ের শেষে অভিনেতার মতো অর্জুন এখন নগ্নীকৃত হচ্ছেন — নেপথ্যে নয়, আমাদেরই চোখের সামনে ; খুলে নেয়া হচ্ছে তাঁর উজ্জ্বল বেশবাস ও শিরস্ত্রাণ ও রত্নাভরণ, রূপসজ্জার সব মোহন বর্ণ ধৌত হ'য়ে গিয়ে ফুটে উঠেছে মরণশীলতায় রেখাঙ্কিত এক মুখমণ্ডল। কিন্তু তাঁকে নিয়ে 'চিরসারথি ভাগ্যবিধাতা'র এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ [১৫২] অনেক আগেই শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো, শল্যপর্বের সমাপ্তিকালেই আমরা তার প্রথম লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলাম। সেই সূত্রটির সন্ধানের জন্য আমাদের পূর্বপরিচিত অন্য এক দেবতার কাছে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।

১৩৮। পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সময় কৃষ্ণ তাঁকে শুধু এই ক-টি কথা বলেছিলেন (মৌষল : ৪) : 'যতক্ষণ অর্জুন এসে না-পৌঁছন আপনি

এখানে পুরস্ত্রীদের রক্ষা করুন; বলরাম বনের মধ্যে আমার প্রতীক্ষায় আছেন, আমি তাঁর কাছে যাই। বহু কুরুবীরের নিধনকাণ্ড আমি দেখেছি, আজ যদুকুলের বিনষ্টিও দেখলাম। এখন আমি বলরামের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে তপস্যা করবো।' অর্জুনের প্রতি বসুদেবের ভাষণটিতেও (মৌষল : ৬) কোনো বিবরণ প্রকাশ পেলো না; কৃষ্ণ-বলরামের মৃত্যুর কোনো উল্লেখ নেই তাতে, কৃষ্ণ তাঁর স্বকুলের ধ্বংস উপেক্ষা করলেন ব'লেই তাঁর শোচনা। 'তিনি (কৃষ্ণ) আমাকে বালকদের সঙ্গে এখানে রেখে যে কোথায় গেলেন তাও আমি জানি না —' বসুদেবের এই উক্তিটি লক্ষণীয়।

পরবর্তী অংশে বসুদেব, বলরাম ও কৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন ক'রে অর্জুন সপ্তম দিনে নারীবৃন্দ-সমেত দ্বারকা ত্যাগ করলেন, কিন্তু পুঁথির মধ্যে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে ইতিমধ্যে সব ঘটনা তিনি জানতে পেরেছিলেন।

১৩৯। 'হে মহামতি [অর্জুন], কাল সর্বপ্রাণীকুল বিনষ্ট করে, আমি কালবন্ধন চিন্তা করছি, তোমার পক্ষেও তা দর্শনযোগ্য।' — শ্লোকটির নিকটতম আক্ষরিক অনুবাদ এই রকম দাঁড়াবে। 'দেহত্যাগ', 'মৃত্যু' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায় নীলকণ্ঠের টীকায়, মূল লেখনে নয়। এখানে, এবং অন্য অনেক স্থলেও, কালীপ্রসন্নর অনুবাদ ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে।

লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠিরের নির্দেশটি শুধু অর্জুনের উদ্দেশেই উক্ত হ'লো, একবচনে — দুই বিপরীতমতি প্রতিভূ-ভ্রাতা হঠাৎ যেন একসূত্রে আবদ্ধ হলেন। এও বিস্ময়কর যে অর্জুন এর উত্তরে শুধু 'কাল কাল' ব'লে উঠলেন; আর অন্য ভ্রাতারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন এই অস্পষ্ট-ঘোষিত প্রস্তাবে — তিনটিমাত্র শ্লোকের মধ্যে এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত উত্থাপিত ও গৃহীত। যেমন অনেক সময় মহাভারতের অতিবিস্তারে আমরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, তেমনি — কোনো-কোনো চরম মুহূর্তে — তার সংকেতভাষণও আমাদের নিশ্বাস কেড়ে নেয়।

১৪০। মহাভারতের শেষ তিনটি সর্গ গ্রন্থের মধ্যে ক্ষুদ্রতম : শ্লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২২৭, ১১০ ও ৩০৩।

১৪১। পরি : ১৮ ('নীলচক্ষু নকুল') দ্র।

১৪২। মূল সংস্কৃতে এদের কখনো 'দস্যু' কখনো 'আভীর' বলা হয়েছে। *'আভীর' শব্দের প্রচলিত অর্থ গোয়ালা, হরিচরণ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়েছেন 'ভীতি-উৎপাদনকারী'।* এরা বৈদেশিক জাতি ব'লে অনুমিত, এদের আদি-

বাসস্থান পঞ্চনদভূমি — সেখানেই যদুরমণীরা অপহৃত হন। আশ্ব : ২৯-এ কথিত আছে, পরশুরামের ভয়ে দ্রাবিড় আভীর পুণ্ড্র ও শবরজাতিরা ক্ষাত্রধর্ম পরিহার ক'রে শূদ্রত্বে অধঃপতিত হয়। গোপালক জাতির পুরুষগণ আজ পর্যন্ত যষ্টিযুদ্ধে দুর্ধর্ষ ব'লে কথিত — মৌষলপর্বেও যষ্টিপ্রহারের উল্লেখ আছে।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়টি নৃতত্ত্বের এক আকর-গ্রন্থ, ভারতের এমন কোনো সংকর- বা উপজাতি নেই যার সংজ্ঞার্থ সেখানে না-পাওয়া যায়। সেখানে দেখি, অম্বষ্ঠকন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণসন্তানের নাম আভীর, আর অম্বষ্ঠ বলে তাদের যারা ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে জন্মেছেন (শ্লোক ১৫ ও ৮)। অম্বষ্ঠজাতির বৃত্তি চিকিৎসা (শ্লোক ৪৭), আধুনিক বৈদ্যজাতির এঁরাই মনে হয় পূর্বপুরুষ। আভীরদের বৃত্তি বিষয়ে মনু কিছু বলেননি, কিন্তু তাঁর মতেও দ্রাবিড়, ঔড্র, পৌণ্ড্রক ইত্যাদি অনেকগুলি জাতি ক্রিয়া-লোপের ফলে ক্ষত্রিয়াংশে জ'ন্মেও শূদ্রত্ব লাভ করে, এবং সেই একই কারণে সদ্বংশজাত লোকেরাও 'দস্যু' ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকেন — তারা আর্যভাষী বা ম্লেচ্ছভাষী যা-ই হোন না (শ্লোক ৪২-৪৫)।

১৪৩। ভাগবতপুরাণে এই স্বীকারোক্তিটি বিস্ফারিত আকারে পাওয়া যায়; দ্বারকা থেকে হস্তিনায় ফিরে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলছেন (১ : ১৫) :

'মহারাজ, বন্ধুরূপী হরি আমাকে বঞ্চনা করেছেন। তিনি হরণ করেছেন আমার সেই তেজ, যা দেবগণেরও বিস্ময় জাগাতো। ... তাঁরই বলে আমি জয় করেছিলাম স্বয়ংবরসভায় দ্রৌপদীকে, দেবগণকে পরাভূত ক'রে খাণ্ডববন দগ্ধ করেছিলাম, ... তাঁরই কারণে মহেশ্বর আমাকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন, তাঁরই প্রভাবে আমি সশরীরে স্বর্গধামে গিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে অর্ধাসনে বসেছিলাম' — ইত্যাদি, ইত্যাদি। — কিন্তু ভাগবতের পুঁথির মধ্যে উক্ত ঘটনাসমূহের কোনো বিবৃতি নেই ব'লে কথাগুলো মর্মস্পর্শী হ'তে পারেনি; তাছাড়া, যে-সব ব্যাপারে কৃষ্ণের কোনো আখ্যানগত ভূমিকা ছিলো না, তাও কৃষ্ণ-কৃত ব'লে ধ'রে নিলে অর্জুনের বাস্তবতাকেই উড়িয়ে-দেয়া হয়। 'তিনিই সব —' এই কথাটা মহাভারতে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে ব'লেই মৌষল-পর্বের অর্জুন এমন বিশ্বাস্যভাবে শোচনীয় ও শোকার্ত।

১৪৪। কিন্তু কৌরবপক্ষের লোকেরা যে এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন,

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়ের একটি উক্তি থেকে তা বোঝা যায় (দ্রোণ : ১৮৩) : —'অর্জুন কৃষ্ণ-কর্তৃক রক্ষিত হ'য়েই সম্মুখীন শত্রুগণকে পরাজিত ক'রে থাকেন। রাজা দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও আমি — আমরা প্রতিদিনই সূতপুত্রকে বলতাম : "হে কর্ণ, তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ ক'রে ধনঞ্জয়কে সংহার করো। অথবা অর্জুনকে ছেড়ে বিনাশ করো কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মূলস্বরূপ এবং পাঞ্চালেরা পুত্রস্বরূপ। কৃষ্ণই পাণ্ডবদের আশ্রয়, কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই নাথ এবং পরমগতি।" '

যুধিষ্ঠিরও যুদ্ধের পরে বুঝেছিলেন যে অর্জুনের শৌর্য আসলে কৃষ্ণ-নির্ভর। তাঁর একটি উক্তি এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য (শল্য : ৬৩) : 'হে জনার্দন, মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ যে সব ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন তা তুমি ছাড়া আর কে সহ্য করতে পারতো। তোমারই জন্য সংশপ্তকগণ পরাস্ত হয়েছে, এবং অর্জুন অপ্রতিহতভাবে যুদ্ধ করতে পেরেছেন।'

১৪৫। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥

(গী : ১৮ : ৬১)

—'হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হ'য়ে যন্ত্রারূঢ় [পুতুলের মতো] সর্বজীবকে মায়ার দ্বারা চালনা করেন।'

কথাটা আমরা মার্কণ্ডেয় মুনির মুখে আগেও শুনেছিলাম (বন : ১৮৯), তিনি কৃষ্ণকে বলেছিলেন 'ক্রীড়াপরায়ণ'। বন : ১২-তে দ্রৌপদীও বললেন যে বালকের পক্ষে যেমন খেলার পুতুল, তেমনি কৃষ্ণের পক্ষে ব্রহ্মাদি দেবগণ। মার্কণ্ডেয় মুনির উক্তির পিছনে ছিলো এক বালকের উদরে বিশ্বরূপদর্শনের অভিজ্ঞতা ; কিন্তু দ্রৌপদীর সে-রকম কোনো দর্শন ঘটেনি, তাই তাঁর মুখে কথাটা নেহাৎ স্তাবকতার মতো শোনালো।

১৪৬। টী ১২২, চতুর্থ অনুচ্ছেদ দ্র।

১৪৭। 'রাক্ষস' বলতে আমরা সাধারণত কোনো বিকটদর্শন নরমাংসভুক প্রাণীকে বুঝি — এবং মহাভারত-রামায়ণের অনেক বর্ণনাও তদনুরূপ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তারাই রাক্ষস যাদের দৃষ্টি থেকে যজ্ঞের হবি রক্ষণীয় ; ঋগ্বেদ ৭ : ১০৪ ও ১০ : ৮৭ প'ড়ে মনে হয় অরণ্যবাসী অগ্নিপূজক আদিম আর্যেরা নিশাচর হিংস্র জন্তুকেও রাক্ষস বলতেন।

কিন্তু পুরাণসাহিত্যে 'রাক্ষসে'র অর্থ আরো ব্যাপক। একদিকে তারা যক্ষ-কিন্নরাদি প্রীতিকর প্রাণীদের সগোত্র, মানুষের ঊর্ধ্বে ও দেবতার নিম্নে তাদের স্থান; অন্যদিকে তারা বিশেষভাবে ভয়াবহ ও ঘৃণাভাজন। কৃষ্ণের ভাষায় তামসিক প্রকৃতির মনুষ্যমাত্রেই 'রাক্ষস' (গীতা : ৯ : ১২); এবং যারা অনার্য বা আধুনিক ভাষায় আদিবাসী, অথবা আর্যবংশীয় হ'য়েও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অবিশ্বাসী, তারাও আমাদের এপিক দুটিতে 'রাক্ষস' ব'লে অভিহিত। এই অর্থেই রাবণ ও চার্বাক মুনিকে রাক্ষস বলা হয়েছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য শুধু তাঁরাই নন, রামানুচর বানর ও মহাভারতোক্ত নাগেরাও যে অনার্য বা আর্যবিধিচ্যুত মনুষ্যকুলেরই নামান্তর, তা প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা ব'লে না-দিলেও আমরা অনুমান করতে পারতাম — যদিও কাব্যপ্রসঙ্গে তা মেনে নিতে পারতাম না এবং এখনো পারি না।

রাক্ষসদের একটি চরিত্রলক্ষণ হ'লো অত্যধিক বলপ্রদর্শন — আজকালকার চলতি বাংলায় যাকে বলে 'জোয়ানকি দেখানো'। এই লক্ষণটি ভীমের মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান, ভীমকে 'রক্তপ রাক্ষস' ব'লে বঙ্কিম কোনো ভুল করেননি; কিন্তু তিনি পাণ্ডুপুত্র ব'লেই কৃষ্ণের কুদৃষ্টিতে পড়লেন না।

১৪৮। ঘটনাটি তিনটি মাত্র শ্লোকে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে — অনেক কথাই প্রচ্ছন্ন, কিন্তু স্পষ্ট একটি ছবি পাওয়া যায়। শাল্ব, শল্য, পৌণ্ড্র ইত্যাদি নৃপতিরা যখন ধনুতে জ্যারোপণও করতে পারলেন না, তখন —

সর্বান্ নৃপাংস্তান্ প্রসমীক্ষ্য কর্ণো
ধনুর্ধরাণাং প্রবরো জগাম
উদ্ধৃত্য তূর্ণং ধনুরুদ্যতং তৎ
সজ্যং চকারাশু যুযোজ বাণান্॥
দৃষ্ট্বা সূতং মেনিরে পাণ্ডুপুত্রা
ভিত্ত্বা নীতং লক্ষ্যবরং ধরায়াং।
ধনুর্ধরা রাগকৃতপ্রতিজ্ঞ-
মত্যগ্নিসোমার্কমথার্কপুত্রম্॥
দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈ-
র্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতং।

সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্যং
তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ ॥
(আদি : ১৮৬ : ২১-২৩)

'— নৃপগণকে ব্যর্থ দেখে মহাধনুর্ধর কর্ণ অগ্রসর হলেন; ধনু উত্তোলন ক'রে অচিরাৎ যোজনা করলেন বাণ;

'অনুরাগবশত কৃতপ্রতিজ্ঞ, অগ্নি সোম ও সূর্য-সদৃশ সূর্যপুত্র সূতকে শরযোজনা করতে দেখে পাণ্ডবেরা ভাবলেন ইনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যটিকে ভূপাতিত করবেন।

'[কিন্তু] দ্রৌপদী তাঁকে দেখে উচ্চৈস্বরে ব'লে উঠলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করবো না।" আর কর্ণ, সরোষে [ঈষৎ] হাস্য ক'রে, সূর্যের দিকে [একবার] তাকিয়ে স্পন্দিত ধনু পরিত্যাগ করলেন।'

১৪৯। কবচ-কুণ্ডলের বিনিময়ে ইন্দ্র কর্ণকে শক্তি অস্ত্র দিয়েছিলেন এই শর্তে যে কর্ণের করচ্যুত হ'য়ে তা একটিমাত্র শত্রুকে বধ ক'রে আবার তাঁরই (ইন্দ্রের) কাছে ফিরে আসবে (বন : ৩০৯)। পাঠক হয়তো ভুলে যাননি যে এই দিব্যাস্ত্রেই অযোগ্য ঘটোৎকচ নিহত হয়েছিলো।

কর্ণের অভিশাপ-বৃত্তান্ত শান্তি : ২-৫এ বিবৃত আছে।

১৫০। আমি মান্-এর যে-উপন্যাসটির কথা ভাবছি সেটি অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত 'ডক্টর ফাউস্টুস'। উপন্যাসের নায়ক লেভেরকুহ্ন এক সুরকার; তিনি বোদলেয়ার ও নীটশের মতো প্রথম যৌবনে উপদংশ রোগে আক্রান্ত হন (সেটাই তাঁর 'শয়তান'); কুড়ি বছর ধ'রে অলোকসামান্য সৃষ্টিপ্রতিভার পরিচয় দেবার পর সেই গুপ্ত ব্যাধির বিষক্রিয়ায় জড়বুদ্ধি ছন্নমস্তিষ্কে পরিণত হ'য়ে আরো দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। অন্য এক স্তরে, মান-এর ফাউস্ট তাঁর জন্মভূমি জর্মানি; সারা উনিশ শতক ধ'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলার সকল ক্ষেত্রে জর্মানিতে যে-সৃষ্টিশীলতার বিস্ফোরণ ঘটেছিলো, হিটলার ও নাৎসিবাদের ভয়াবহ মুদ্রা গুনে-গুনে বিশ শতকে তারই মূল্য তাকে দিতে হ'লো।

১৫১। বিশ্বরূপদর্শনের পরে অর্জুন স্বেদাক্ত দেহে বাষ্পাকুল স্বরে ব'লে উঠেছিলেন :

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥
(গী : ১১ : ৪১-৪২)

—'আপনার মহিমা না-জেনে, ভ্রান্তি অথবা প্রণয়বশত, আমি আপনাকে বন্ধু ব'লে ভেবেছি, সম্বোধন করেছি দুর্বিনীতভাবে কৃষ্ণ, যাদব, সখা ব'লে ;

'অসম্মান করেছি আপনাকে, নিভৃতে বা লোকসমক্ষে, আসন বিহার শয্যা ও ভোজনের সময় — হে অপ্রমেয় অচ্যুত, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করুন।'

কিন্তু এই উপলব্ধি মুহূর্তকাল পরে মিলিয়ে গিয়েছিলো — তা-না-হ'লে অর্জুনের জীবন অচল হ'য়ে যেতো, মহাভারতের কাহিনী আর এগোতে পারতো না। অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধবিমুখতা যেমন অস্বভাবী, ঈশ্বরচেতনাও তেমনি অসহনীয়।

১৫২। অর্জুন দ্বারকায় এসে যদুকুলের রমণী ও শিশুদের উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবেন (মৌষল : ৬), কৃষ্ণের এই শেষ নির্দেশটিতে কৃষ্ণের বিদ্রূপ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, কেননা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুনের ক্ষমতাও লুপ্ত হবে।

২২ : শেষ যাত্রা

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে সূর্য অস্ত গেলো। পাণ্ডবেরা সবান্ধবে শিবিরের দিকে ফিরে চললেন — এদিকে, তাঁর জানু বিচূর্ণিত, তাঁর সর্বাঙ্গ রক্তক্ষরণে গলমান, দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে মৃত্যুর অপেক্ষায় একা প'ড়ে রইলেন দুর্যোধন। পরাস্ত ও পদাহত শত্রুর দিকে দৃকপাত করলেন না পাণ্ডবেরা; তাঁদের জয়ের আস্বাদ তীব্রতরভাবে উপভোগ করার জন্য সোজা চ'লে এলেন কৌরব-শিবিরে — 'জনশূন্য রঙ্গভূমি'র মতো বিষাদলিপ্ত সেই স্থান, যেখানে স্ত্রী, বৃদ্ধ ও ক্লীবগণ ছাড়া আর-কেউ তখন ছিলেন না। ব্যাসদেব উল্লেখ করতে ভোলেননি যে এই জয়িষ্ণু সংঘের অন্তর্ভূত ছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দৌপদীর পঞ্চপুত্র — যাঁদের মধ্যে একজনও আগামী কালের অরুণালোক চোখে দেখবেন না, দুর্যোধনেরও আগে যাঁদের দেহের সঙ্গে প্রাণের বিচ্ছেদ ঘ'টে যাবে। কিন্তু এ-মুহূর্তে সেই পরিণাম সকলেরই অজ্ঞাত, এখনও সোল্লাসে শঙ্খনাদ করার সময় আছে তাঁদের : তবু অকস্মাৎ, এই আনন্দধ্বনি থেমে যাবার আগেই, এক অদ্ভুত দুর্লক্ষণ দেখা দিলো। প্রথমে অর্জুন ও তারপর কৃষ্ণ অবতরণ করামাত্র অর্জুনের রথ থেকে তাঁর কপি-চিহ্নিত ধ্বজা অন্তর্হিত হ'লো, তারপর এক রহস্যময় আগুনে মুহূর্তে ভস্মীভূত হ'লো রথ অশ্ব রশ্মি যুগকাষ্ঠ ইত্যাদি সমগ্র উপকরণ (শল্য : ৬৩)। কৃষ্ণ জবাবদিহি দিলেন, 'এই রথে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে পূর্বেই অগ্নি-সংযোগ হয়েছিলো, কেবল আমি অধিষ্ঠিত ছিলাম ব'লেই কাল পর্যন্ত দগ্ধ হয়নি।' স্পষ্টত কথাটা একটি ব্যাজোক্তি ছাড়া কিছু নয়; কেননা কৃষ্ণ অষ্টপ্রহর রথে ব'সে থাকতেন না, পূর্বদিনও তা থেকে নেমেছিলেন ব'লে ধ'রে নেওয়া যায় — কেন ঠিক এই মুহূর্তেই

ঘটলো এই অগ্নিকাণ্ড — বিনা ভূমিকায়, যেন গোপন কোনো ইঙ্গিত জানিয়ে? জয়স্ফীত অর্জুন এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেননি, কিন্তু আমাদের মনে তা অনিবার্য, এবং এর উত্তরও আমাদের পক্ষে অনুমেয়। ভগদত্ত ও কর্ণ যে-সব ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়েছিলেন সেজন্য নয় — ঐ রথে প্রথম থেকেই ছিলো দাহ্য উপাদান; কেননা রণাগ্নিবিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়েই সেটি নির্মিত হয়, এবং অর্জুনকে সেটি সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন খাণ্ডবদাহনের অগ্নি।

খাণ্ডবদাহন! যে-ঘটনা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি, তারই এক অশুভ প্রতিধ্বনি গুরুগুরু মন্দ্রে বেজে উঠলো আমাদের মনের মধ্যে। আমরা ভেবেছিলাম সেটি শুধু একটি বিজয়-অভিযান, কিন্তু এখন দেখছি তারও আছে প্রতিফল, তার প্রবর্তক-দেবতাটি আমাদের সেই স্রষ্টা-বিধাতার মতোই দত্তাপহারক, যিনি কালক্রমে আমাদের যৌবন স্বাস্থ্য ইন্দ্রিয়শক্তি সবই ফিরিয়ে নেন। তিনি, অগ্নি, ঋগ্বেদের সময় থেকে ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজে অর্চিত — কত না রূপে, কত না ভিন্ন-ভিন্ন নামে![১৫৩] — মহাভারতের একটি 'চরিত্র'রূপে তাঁকে আমাদের গণ্য কবতে হবে। তাঁর বিষয়ে বহু পার্শ্ব-কাহিনী গ্রথিত আছে মহাভারতে: কেমন ক'রে ভৃগুর শাপে তিনি সর্বভুক ও ব্রহ্মার বরে পাবক অর্থাৎ পবিত্রতাসাধক হয়েছিলেন (আদি: ৭), কেনই বা তাঁকে এককালে মাহিষ্মতীবাসী পরদার-প্রেমিক দেবতা বলা হ'তো (সভা: ৩০), আর কেমন ক'রেই বা স্বর্গভ্রষ্ট পলাতক ইন্দ্রকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন (উদ্যোগ: ১৫) — এমনি অনেক কৌতূহলজনক বৃত্তান্ত; কিন্তু আমাদের পক্ষে যা সবচেয়ে অনুধাবনযোগ্য তা কুরুপাণ্ডবের ইতিহাসে তাঁর প্রচ্ছন্ন অংশগ্রহণ। দুর্যোধনের ঈর্ষার অনল মূর্ত হ'লো জতুগৃহদাহে, ক্রোধে প্রজ্বলিত হলেন দ্যূতসভায় বৃকোদর, শৌর্যের অবরুদ্ধ তেজ প্রচণ্ড-ভাবে বিচ্ছুরিত হ'লো কুরুক্ষেত্রে — তারপর চিতাগ্নি, শোকাগ্নি,

অনুশোচনার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস : আদিম দাহিকা শক্তির চিত্রকল্পটি স্তরে-স্তরে ব্যবহৃত হয়েছে মহাভারতে — বহু ভিন্নভাবে, বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে। আমরা দেখেছিলাম অগ্নিকে মূর্তিমান বুভুক্ষারূপে আবির্ভূত — বিরাট সেই ক্ষুধা, শুধুমাত্র পশুমেদভোজনে যা তৃপ্ত হ'লো না, ছড়িয়ে পড়লো ক্ষত্রিয়ের সেই জয়লিপ্সা হ'য়ে — যার তাড়নায় যুগে-যুগে রণদীর্ণ হয়েছে পৃথিবী, এবং আদিপর্বের শেষ অংশে অর্জুন-কৃষ্ণ যার রক্তিম আভায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁদের প্রথম মিত্র অগ্নিদেব, কিন্তু সেই সামরিক মৈত্রী যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্র ছিন্ন হ'য়ে গেলো, আরম্ভ হ'লো প্রকৃতির প্রতিশোধ — খাণ্ডবভুক অগ্নি এবার তাঁরই দত্ত দিব্যরথটিকে দগ্ধ ক'রে দিলেন। আমরা বুঝে নিলাম যে অর্জুন আসলে কিছুই উপহার পাননি — পেয়েছিলেন ঋণস্বরূপ সব যুদ্ধোপকরণ, একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময়ে সেগুলি প্রত্যাহৃত হচ্ছে। কৃষ্ণ তা নিবারণ করলেন না, কেননা অর্জুনের এই দরিদ্রীকরণ তাঁরও অভিপ্রেত, একদা-বদান্য দেবগণও তা-ই অভিসন্ধি করেছেন। কিন্তু এই প্রায়-স্বচ্ছ রহস্যটুকু অর্জুনের কাছে আচ্ছাদিত রইলো — একেবারে সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

হয়তো আমরা ভুল করবো না, যদি পরবর্তী ঘটনাগুলিকে পৃথিবীর প্রথম ফাউস্ট-কাহিনীর উপসংহার ব'লে অভিহিত করি. যিনি সকলের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়েছিলেন, সেই অর্জুনের পতন সাধনে বিশ্বপ্রকৃতি এখন বদ্ধপরিকর। সৌপ্তিকপর্বে আমাদের মনে হয়েছিলো অগ্নি কৌরবদের সপক্ষে চ'লে এসেছেন — অশ্বত্থামা অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার সংকল্প করামাত্র পাণ্ডব-পাঞ্চালের দ্বাররক্ষক রুদ্রদেবতা প্রসন্ন হলেন, দ্রোণপুত্রের পরিকল্পিত প্রতিহিংসা অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো। কৃষ্ণ সজ্ঞানে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটতে দিলেন : আর পাণ্ডবেরা, যাঁরা কিছুক্ষণ আগেই গুপ্তচরের সাহায্যে দুর্যোধনের গোপন

অবস্থান আবিষ্কার করেছিলেন (শল্য : ৩১), তাঁরা এ-বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারলেন না — আশ্চর্যের বিষয়, কৃষ্ণও সতর্ক ক'রে দিলেন না তাঁদের ; তাঁর প্রিয় সখী দ্রৌপদীর ভ্রাতা ও পুত্রদের বিনাশে তিনিও এখন সম্মত। — কিন্তু না, আশ্চর্য কিছু নয়, সবই যথোচিত ও পরিকল্পিত ; অর্জুনের জয় কানায়-কানায় উপচে পড়েছিলো — এখন পাত্র ভেঙে ফেলার সময়। আশ্বমেধিক পর্বে — আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছিলাম — অর্জুনপতনের প্রাথমিক স্তর বর্ণিত হয়েছে ; তাঁর অবস্থা এখন এমন কোনো রোগীর মতো, যার দেহ এক মারাত্মক বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত, অথচ যার জীবনযাপন আপাতত এখনো স্বাভাবিক, মাঝে-মাঝে ক্লান্তির চাপে নুয়ে পড়লেও যে 'কিছু নয়' ব'লে ভোলায় নিজেকে, জীবনীশক্তির বিবর্ধমান অবক্ষয় অনুভব ক'রেও কিছুতেই তা মানতে চায় না। তাঁর চিরন্তন ক্ষাত্রজীবিকায় অর্জুনের আস্থা এখন টলমল [১৫৪], শুধু অভ্যাসের বশে এই সংস্কারটিকে তিনি আঁকড়ে আছেন যে তিনি গাণ্ডীবধন্বা অপরাজেয় অর্জুন। ভীষ্মবধের পাপক্ষালনের জন্য পুত্রের হাতে তাঁর 'মৃত্যু' হলো ; ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী দাবানলে প্রাণত্যাগ করলেন (আশ্রম : ৩৭) — এই ঘটনা দুটিকে অর্জুন উপেক্ষা ক'রে গেলেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি যুধিষ্ঠিরকে ভাবিয়ে তুলেছিলো। সেই খাণ্ডবদাহনের অগ্নি — একদা যিনি অর্জুনের সাহায্যে পুনর্জীবিত হয়েছিলেন, তিনিই এখন দগ্ধ করলেন অর্জুনজননীকে, এই সম্বন্ধটুকু ধরতে পেরেছিলেন যুধিষ্ঠির (আশ্রম : ৩৮) ; কিন্তু তবু, হার্দ্য দৌর্বল্যবশত, তিনি ভুল ক'রে অগ্নিকে বলেছিলেন 'অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন'। ভুল ক'রে — কেননা অগ্নির দিক থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতার প্রশ্ন ওঠে না : অর্জুনই অধমর্ণ ও সব কৃতজ্ঞতার ভারবাহী ; মানুষের প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি ঋণ তিনি পেয়েছিলেন, এখন পরিশোধের সময় আপত্তি করলে কেউ শুনবে না।

— সেচ্ছায় না-দিলে ঋণদাতারা নিষ্ঠুর হাতে ছিনিয়ে নেবেন। এই সত্যটি বুঝে নিতে যুধিষ্ঠিরের বেশি দেরি হয়নি, কিন্তু অর্জুনের বোধশক্তি বড়ো দুর্বল, মৌষলপর্বের ব্যর্থতার পরেও তাঁর মনে এই চিন্তাটি জাগলো না যে গাণ্ডীবধারণের অধিকারী তিনি আর নন: তাঁর প্রতিভা বহুকাল তাঁর সেবা করার পর এখন তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে, তাঁর পক্ষে অস্ত্রধারণ এখন অসংগত। 'তোমার অস্ত্রসমূহের কাজ ফুরিয়েছে, যেখান থেকে তারা এসেছিলো সেখানেই ফিরে গেছে তারা। তোমরা কৃতকার্য হয়েছো[১৫৫], এখন ইহলোক থেকে বিদায় নিলেই তোমাদের মঙ্গল' (মৌষল: ৮) — ব্যাসদেবের এই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাও অর্জুন শুধু কান দিয়ে শুনলেন, তাঁর মনোভাবে কোনো পরিবর্তন হ'লো না। যে-গাণ্ডীব আর কখনোই তাঁর কাজে লাগবে না, যে তূণীরদ্বয় চিরকালের মতো নিঃশেষিত, তাদের প্রতি তিনি মূঢ়ের মতো আসক্ত হ'য়ে রইলেন; 'রত্নলোভাৎ' — কালীপ্রসন্নর ভাষায় 'রত্নলোভনিবন্ধন' — বহন ক'রে বেড়ালেন ঐ অর্থহীন জয়চিহ্নগুলিকে: কোনো সিংহাসনচ্যুত রাজা যেমন তাঁর পূর্বতন উপাধিসমূহের মায়া কাটাতে পারেন না, তেমনি শোচনীয় ও করুণাযোগ্যভাবে। তাই, এই শেষ মুহূর্তেও, তাঁর সঙ্গে আরো একবার রূঢ় ব্যবহারের প্রয়োজন ঘটলো। মহাপ্রস্থানের পথে ঘুরে-ঘুরে পাণ্ডবেরা যখন লোহিতসাগরের[১৫৬] কূলে উপনীত, তখন অকস্মাৎ অর্জুনের সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁর প্রাক্তন মিত্র হুতাশন — ব্যাসদেবের চেয়েও ঋজু ও অব্যর্থ ভাষায় তাঁকে আদেশ করলেন গাণ্ডীব-তূণ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করতে (মহা: ১)। 'আমি তোমার জন্য বরুণের ভাণ্ডার থেকে ঐ ধনু-তূণীর সংগ্রহ করেছিলাম, এখন তুমি বরুণকে তা প্রত্যর্পণ করো; কৃষ্ণও তাঁর সুদর্শন চক্র ত্যাগ করেছেন'[১৫৭]। দু-একটি কথা অগ্নিদেব বলেননি, আমরা তা যোগ করতে পারি: খাণ্ডবদাহনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী-মিত্র

বরুণদেবতাই কৃষ্ণের দ্বারকাপুরীকে গ্রাস করেছিলেন, বলরামের প্রাণস্বরূপ সর্প সমুদ্রের জলেই মিলিয়ে গিয়েছিলো [১৫৮]। আমাদের পূর্বশ্রুত সেই আগুন-জলের গল্প সমাপ্ত হ'লো এতদিনে, অতি সুন্দর একটি পূর্ণবৃত্ত রচনা ক'রে। অবনতির এই শেষ প্রান্তে এসে অর্জুন অগ্নির আদেশ অমান্য করতে পারলেন না: আর তাঁর অস্ত্রমোচনের কিছুক্ষণ পরেই যখন শারীরিক অর্থে তাঁর পতন হ'লো (মহা : ২), তখন আমরা নিশ্চিন্ত হলাম ও স্বস্তিবোধ করলাম — কেননা এক জীবন্মৃত অর্জুনের চেয়ে মৃত অর্জুন আমাদের পক্ষে অনেক বেশি শ্লাঘনীয়।

মহাপ্রস্থানের পরিকল্পনা যুধিষ্ঠিরের, ঘটনাটির অনুষ্ঠাতাও তিনি। তিনিই প্রথম রাজবেশ ছেড়ে পরিধান করলেন বল্কল, তাঁব অনুসরণে দ্রৌপদী ও চার ভ্রাতাও তা-ই করলেন। গৃহত্যাগের পূর্বক্ষণে 'সলিলে অনল' নিক্ষেপ করলেন তাঁরা — অর্থাৎ নির্বাপিত করলেন অতি পবিত্র অগ্নিহোত্র; যুধিষ্ঠির বিসর্জন দিলেন তাঁর চিরাচরিত গার্হস্থ্যাশ্রম। অথচ তাঁর এই ঘর-ভাঙা অবস্থাকে আমরা মনুসংহিতার অর্থে সন্ন্যাস বা এমনকি বানপ্রস্থ বলতে পারি না, কেননা তিনি সপরিবারে চলেছেন: যে-ভিক্ষাজীবী নিঃসঙ্গ পরিব্রজ্যা যুদ্ধের পরে তাঁর কাম্য হ'য়ে উঠেছিলো (শান্তি : ৯), এই মহাপ্রস্থানে তারও কোনো লক্ষণ নেই। পশ্চিম থেকে পূর্বে ও পূর্ব থেকে দক্ষিণে ভ্রমণ ক'রে পুনরায় পশ্চিম তটরেখা অনুসরণ ক'রে — যে-ভাবে তিনি ভারতবর্ষের সমগ্র উপকূল প্রদক্ষিণ করলেন, তাতে মনে হয় মাতৃভূমিকে শেষ নমস্কার জানিয়ে তিনি কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলেছেন — যদিও সেটি কোন স্থান তা আমরা এখনো জানি না, তাঁর সঙ্গীরাও কেউ একবার জিজ্ঞাসা করলেন না: 'আমরা কোথায় চলেছি?' মৌষলপর্বের ঘটনার মতো, এই সুদীর্ঘ পরিভ্রমণটিও অসাধারণ অল্প কথায় বিবৃত হয়েছে — মনে হয় তাঁরা

ছয়জনই নিঃশব্দ ছিলেন সারাটা পথ, কেননা বলার সব কথা ফুরিয়ে গেছে, কোনো বাদানুবাদের অবকাশ আর নেই, এক কর্মভারমুক্ত বচনহীনতার মধ্য দিয়ে তাঁরা এখন দুর্গম পথে অভিযাত্রী। জলমগ্ন দ্বারকাপুরী দর্শন ক'রে উত্তর দিকে চলেছেন তাঁরা, হিমালয়ে তাঁদের ঊর্ধ্বারোহণ আরম্ভ হ'লো, সামনে সুমেরুপর্বত দেখা যাচ্ছে[১৯] — এমন সময় দ্রৌপদী ক্লান্ত হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, এবং স্বল্পকালমাত্র ব্যবধান দিয়ে-দিয়ে, সেই একই অবসাদে আচ্ছন্ন হলেন চার পাণ্ডবভ্রাতা — এই সেদিনও যাঁদের শৌর্যের খ্যাতি নিখিলভারতে প্রতিধ্বনিত ছিলো। নামত তাঁরা এখন ভারতবিজয়ী, কিন্তু আমরা দেখছি তাঁরা কর্ণ অথবা দুর্যোধনের চেয়েও গূঢ়তর অর্থে পরাজিত : তাঁদের যাত্রাপথে অর্ঘ্য নিয়ে কেউ এগিয়ে এলো না ; যাঁদের কাছে অভ্যর্থনা আশা করা যেতো, সেই রাজন্যদের পাণ্ডবেরাই জয়ের নেশায় ধ্বংস করেছেন। অন্য এক স্তরেও পরাস্ত হ'তে হ'লো তাঁদের : মেনে নিতে হ'লো, শত্রুপক্ষীয় বীরবৃন্দের তুলনায়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক অবসান — যুধিষ্ঠির ছাড়া অন্য সকলকেই। ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ — প্রতিটি মৃত্যু এক গম্ভীর সুরে ঝংকৃত হয়েছে আমাদের হৃদয়ে ; আর কর্ণ, অর্জুনের চিরকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁরই মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে কুরুক্ষেত্রের সব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে : সেই ঘটনায় দেবতারা পর্যন্ত অংশ নিয়েছেন (কর্ণ : ৮৭-৯২)। এমনকি দুর্যোধন — সর্বস্বীকৃতভাবে পাপিষ্ঠ সেই দুর্যোধন — তাঁর মৃত্যুকালেও পৃথিবী কেঁপে উঠেছিলো, মলিন হ'য়ে গিয়েছিলো দিঙমণ্ডল, তাঁর জন্য অশ্রুপাত করার মতো কতিপয় ব্যক্তি ও উপস্থিত ছিলেন ঘটনাস্থলে (শল্য : ৬৫)। কিন্তু ধর্মচারিণী যাজ্ঞসেনী ও পুণ্যাত্মা পাণ্ডবদের মৃত্যু হ'লো নিতান্তই নগণ্যভাবে — অস্ত্রাঘাতে নয়, যে-কোনো বলহীনের মতো মূর্ছাগ্রস্ত অবস্থায়, যে-কোনো রুগ্নের মতো অকস্মাৎ পথপ্রান্তে

পʼড়ে গিয়ে ; — তাঁদের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ হʼলো না প্রকৃতি, বিশ্বজগতে বা মানুষের মনে ক্ষীণতম রেখাপাত হʼলো না। আর যুধিষ্ঠির, আমাদের চিরপরিচিত বেদনাপ্রবণ যুধিষ্ঠির — তিনি এখন নিঃশোক ও নির্লিপ্ত, প্রায় বলা যায় অনুভূতিহীন। যাঁরা ছিলেন তাঁর সারা জীবনের সঙ্গী : গৃহে অথবা অরণ্যে, বিপদে অথবা সম্পদে যাঁদের তিনি মুহূর্তের জন্য পরিত্যাগ করেননি, এবং যাঁদের কথা ভেবে তিনি হিংসার পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন — সেই পত্নী ও ভ্রাতাদের বিচ্ছেদ অতি শান্তভাবে গ্রহণ করলেন তিনি ; একবার পিছন ফিরে তাকালেন না ; এগিয়ে চললেন তাঁর রিক্ততার ঐশ্বর্য নিয়ে, তাঁর সব দুঃখের তাপে, ভ্রান্তির চাপে গʼড়ে-ওঠা প্রমিতির উপর নির্ভর কʼরে, তাঁর অতীতের সব অভিজ্ঞান ছাড়িয়ে সংসারসীমার পরপ্রান্তে, নির্মোহ এবং সত্বর পদক্ষেপে — একা, কিন্তু একেবারে নিঃসঙ্গ নন, সেই কুকুরটি তাঁর পিছন-পিছন চললো।

যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান ভাগবতপুরাণেও সংক্ষেপে বর্ণিত আছে (১ : ১৫), কিন্তু সেখানে কুকুরটির কোনো উল্লেখ নেই। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে (অ : ১৩-১৫) বিবৃত যুধিষ্ঠিরপ্রতিম পুণ্যাত্মা রাজা বিপশ্চিৎ-এর[১৬০] কাহিনীতে এই পশুটির কোনো প্রতিরূপ পাই না ; আর বঙ্গীয় কবি কাশীরাম দাস ঘটনাটিকে প্রায় একটি প্রহসনে পরিণত করেছেন। কিন্তু আমি এই আশা ছাড়তে পারি না যে কোনো সময়ে কোনো-এক কবি, কোনো আধুনিক মহানগরীর কলরোলের মধ্যে বʼসে কোনো ভারতীয় বা য়োরোপীয় ভাষায় একটি মর্মোদ্ধারী কথিকা রচনা করবেন যার নায়ক এই নামগোত্রহীন জন্তু, যে হস্তিনা থেকেই যাত্রী ছ-জনকে অনুসরণ করেছিলো — সম্পূর্ণ অনাহূত এবং অলক্ষিত ভাবে, আর সেইজন্যই যে কবিকল্পনার পক্ষে উত্তেজক। অনেক প্রশ্ন, যার উল্লেখ পুরাণ-কবির পক্ষে বাহুল্য ছিলো, আমার বিশ্বাস আমাদের আধুনিক কবি তা এড়াতে পারবেন না : — কেমন ছিলো

সেই কুকুর, তার সারমেয়-স্বভাবে কতদূর পর্যন্ত নিষ্ঠাবান, ঐ সুদীর্ঘ পথ পেরোবার মতো শক্তি সে পেয়েছিলো কোথায়? পাণ্ডবেরা না-হয় যোগাবিষ্ট হ'য়ে উপবাসী থাকতে পেরেছিলেন, কিন্তু পথে-পথে কুকুরটিব কিছু খাদ্য জুটেছিলো কি? সে কি ধীরভাবে দ্রৌপদীর পশ্চাতে থেকে শ্রেণীবদ্ধভাবে চলেছিলো, না কি মাঝে-মাঝে, কোনো গন্ধে অথবা বাতাসের ছোঁওয়ায় চঞ্চল হ'য়ে, এগিয়ে গিয়েছিলো সকলের আগে, লাফিয়ে উঠে অকারণ হর্ষধ্বনি করেছিলো, অথবা স্বনির্বাচিত উদাসীন প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করেছিলো স্নেহের কোনো নিদর্শন? অথবা, কোনো বৃক্ষগাত্রে মূত্রত্যাগ করার জন্য সে কি পেছিয়ে পড়েনি মাঝে-মাঝে, কোনো শশক অথবা মার্জারশিশুকে নিধন করেনি আমিষের লোভে, কোনো যুবতী কুক্কুরীর সঙ্গভোগে মেতে প্রায় হারিয়ে ফ্যালেনি সহযাত্রীদের? সে কি বিচলিত হয়নি ছয়ের মধ্যে পাঁচজনকে মৃতবৎ প'ড়ে যেতে দেখে, কোনো অস্ফুট বা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ কি তার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছিলো? এই সব অনুপুঙ্খ যোগ ক'রে কুকুরটিকে আরো জীবন্ত ক'রে তুলবেন আধুনিক কবি, হয়তো এ-কথা বলতেও দ্বিধা করবেন না যে সে পথশ্রমে বিবশ হ'য়ে পড়তো মাঝে-মাঝে, জঠর-জ্বালা সইতে না-পেরে পশুবিষ্ঠা ভোজন করতো। কিন্তু তবু — সব ক্লান্তি ও অনশন-ক্লেশ সত্ত্বেও কেন সে কখনো পথচ্যুত হয়নি, পাঁচজনের মৃত্যুর পরেও কেন ভীত হয়নি নিজের জন্য, আমার কল্পিত কথিকায় এই প্রশ্নেরও সাংকেতিক কোনো উত্তর থাকবে ধ'রে নেয়া যায়। সে কি এইজন্য যে অন্যমনস্কভাবে বা পশুসুলভ অদূরদর্শিতায় সে এতদূর চ'লে এসেছে যে এখন আর ফেরার কোনো উপায় নেই, না কোনো রহস্যময় কারণে যুধিষ্ঠির তাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছেন?

এক অদ্ভুত ছবি ফুটে ওঠে আমাদের মনে: চারদিকে পর্বত,

• দিনের রৌদ্রে স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল ও তারার আলোয় শুভ্র-নীলাভ তুষারপুঞ্জ — তারই মধ্য দিয়ে, অতি সংকীর্ণ জনহীন একটি পথ বেয়ে-বেয়ে চলেছেন এক কুকুর-সঙ্গী মানুষ, চলেছেন দিনে-রাত্রে সমতালে, কোন লক্ষ্যের দিকে তা এখনো প্রকাশিত হ'লো না। শান্ত ও নিঃশব্দ ও তন্ময় এক যুধিষ্ঠির, আর তার সঙ্গী — ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের আদৃত কোনো তুরঙ্গভাণ্ড নয়, নয় দেববাহন বৃষ অথবা মরাল, সুদর্শন ও পূতভোজ্য কোনো অষ্টশৃঙ্গধারী হরিণও নয়, কিন্তু যে-জন্তু আর্যবিধিমতে সবচেয়ে ঘৃণ্য, যার দৃষ্টিপাত-মাত্রে যজ্ঞের হবি অপবিত্র হ'য়ে যায়, পৃথিবীতে যার জীবন কাটে হীনতম চণ্ডালের সংসর্গে — সেই কুকুর। যুধিষ্ঠিরের শেষ যাত্রার শেষ পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে যে এই অশুচি জীব ছাড়া আর-কেউ রইলো না, এই ঘটনাটিতেই তাঁর বিজয়পতাকা উত্তোলিত হ'লো — জন্তুটির দেবত্বপ্রাপ্তি নতুন কোনো বিস্ময় জাগাতে পারলো না।

পুরাণ-কবিরা আশ্চর্য : যেমন একদিকে তাঁরা অনেক কৌতূহলের বিষয় অনুক্ত রেখে যান (সম্ভবত ভবিষ্যতের প্রতি করুণা ক'রে যাতে অর্বাচীন ক্ষুদ্র কবিরা সেই ফাঁকগুলো ভরিয়ে-ভরিয়ে কোনোমতে তাঁদের বাণিজ্য চালাতে পারেন), তেমনি অন্য দিকে অনেক অনাবশ্যক তথ্যের আঘাতে তাঁদেরই সৃষ্ট রহস্যজাল তাঁরা ছিন্ন না-ক'রে পারেন না। সাবিত্রী-কথা সত্যবানের পুনরুজ্জীবনেই সমাপ্ত হ'লো না — লৌকিক উপকথার ধরনে অন্ধ দ্যুমৎসেন ফিরে পেলেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ও হৃত রাজ্য ; এবং যথাসময়ে — শুধু সাবিত্রীর নয়, তাঁর পিতার পর্যন্ত শতসংখ্যক পুত্রের জন্ম হ'লো। ভালো — কিন্তু বড্ড বেশি ভালো, বালকবালিকা ও জনসাধারণের পক্ষে সন্তোষজনক, কিন্তু ভাবুকের মন এই সাংসারিক সুখে সুখী হ'তে পারে না ; তাঁর কাছে সাবিত্রীর মৃতসঞ্জীবনী প্রেমের উপরে আর-কিছু নেই। তেমনি, যুধিষ্ঠিরের ঊর্ধ্বারোহণের বৃত্তান্তটিকেও এক গতানুগতিক সুখের

সমাপ্তি পর্যন্ত টেনে নেওয়া হ'লো — তাঁকে আমরা শেষ দেখলাম সমুদয় পাণ্ডব যাদব পাঞ্চালের সঙ্গে 'অনুপম স্বর্গসুখে'[১৬১] প্রতিষ্ঠিত। অন্যদের পক্ষে — ধরা যাক ভীষ্ম দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন বা অভিমন্যুর পক্ষে — স্বর্গসুখভোগ বিশ্বাস্য হ'তে পারে, কিন্তু যুধিষ্ঠির বিষয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে : সত্যি কি তিনি স্বর্গলাভের যোগ্য, অথবা স্বর্গ তাঁর যোগ্য বাসস্থান ?

যুধিষ্ঠির কোনো মহাপুরুষ নন, আমাদের অনেক ভাগ্যে তিনি মানুষ, শুধুমাত্র মানুষ — ইতিপূর্বে এ-রকম একটি কথা আমি বলেছিলাম[১৬২]। সেই সঙ্গে এ-কথাটিও এখন যোগ করা দরকার যে তিনি কোনো দেবতার দ্বারা বিশ্রুতভাবে বরপ্রাপ্ত বা অভিশপ্ত হননি (যেমন হয়েছিলেন অর্জুন ও কর্ণ) ; তাঁর সব বর এবং অভিশাপ তাঁর নিজেরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিলো — সেগুলিকে তিনি কেমন ক'রে স্বীয় চেষ্টায় সমন্বিত ও বিকশিত ক'রে তুলেছিলেন, হ'য়ে উঠেছিলেন সর্বলক্ষণসম্পন্ন এক মর্ত্য মানুষ, তারই ইতিহাসের নাম মহাভারত। আমরা যদি ক্ষণকাল অপেক্ষা করি এখানে, তাঁর মহাপ্রস্থানের এই তুঙ্গ শিখরে, যেখানে তিনি তাঁর মনুষ্যধর্ম নিয়ে দেবরাজের দেবত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, যেখানে তিনি ইন্দ্রের প্ররোচনায় বধির, একটি কুকুরের জন্য স্বর্গবর্জনে বদ্ধপরিকর ; যদি স্মরণে আনি অতীতের সব ঘটনাবিন্যাস — তাহ'লে আমাদের মনে হবে এই মহান ও মানবিক কাব্য যুধিষ্ঠিরেরই জীবনচরিত ; তিনিই ধারণ ক'রে আছেন সব পল্লবীকরণ ও পার্শ্বকথন, মিলিয়ে দিচ্ছেন সব অসংগতি ; তাঁরই চরিত্রবিভায় বীরশূন্য রণদীর্ণ পৃথিবী অকস্মাৎ স্বর্গের চেয়েও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশটুকু ব্যাসদেব যে-ভাবে ইচ্ছে বলুন, হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী তাঁর পৌত্রকে টেনে নিয়ে যান স্বর্লোকে ; — কিন্তু আমরা এই সুন্দর মুহূর্তটিতেই তাঁর কাছে বিদায় নিতে চাই ; যখন, তাঁর নিজস্ব সত্যপালনে

• নিষ্কম্প্র, তিনি স্বর্গদ্বার থেকে ফিরে যাবার জন্য প্রায় পা বাড়িয়েছেন — কোনো পার্থিব অপরাহ্ণের ক্ষণসুন্দর আলোর দিকে হয়তো — আর যখন পর্যন্ত পশুত্বের আচ্ছাদন সরিয়ে তাঁর পরীক্ষকপিতা আরো একবার আবির্ভূত হননি।

পরীক্ষা? আবার? — কিন্তু আমরা যেন নিশ্চিত হ'তে পারি না এখানে কে পরীক্ষক আর কেই বা পরীক্ষার্থী। আমরা লক্ষ করি যে এই শেষ যাত্রায় যুধিষ্ঠিরই পরিচালক, কুকুরটি তাঁর অনুসরণকারী মাত্র: লক্ষ করি যুধিষ্ঠির তাকে শরণার্থী ও ভক্ত ব'লে অভিহিত করেছেন; — প্রথম দফায় ভয় দেখিয়ে, দ্বিতীয় দফায় বিদ্রূপ ক'রে, ধর্ম এবার ক্ষুদ্র ও বিনীত হ'য়ে পুত্রের কাছে দেখা দিয়েছেন। স্পষ্টত, যুধিষ্ঠিরকে 'পরীক্ষা' করার কোনো অবকাশ এখন নেই আর: এ-ই যথেষ্ট যে বৈশ্বিক পতনশীলতার মধ্যে একা তিনি উর্ধ্বারোহী, সর্বজনীন এক ধ্বংসোন্মুখ জগতের মধ্যে একা তিনি অবিকলভাবে স্বস্থ; যথেষ্ট, তিনি যে বেছে নেননি, মোক্ষের লোভে কোনো শাস্ত্রসম্মত সাধনপদ্ধতি এবং প্রধানতম মুনিদের সঙ্গে পরিচিত হ'য়েও কোনো গুরুর পায়ে আশ্রয় নেননি — থেকে গিয়েছেন শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠীহীন ও নিঃসঙ্গ; যথেষ্ট, যে মহাভারতের সবচেয়ে উপদিষ্ট এই মানুষটি উপদেষ্টা বিনাই তাঁর পথের সন্ধান পেয়েছিলেন — নির্ভুলভাবে ও স্বাধীনভাবে — নিজের প্রেরণার বেগেই গতিশীল। এবং তিনি যে পাঞ্চালী ও চার ভাইয়ের মৃত্যুতে অবিচল থেকে এক অপরিচিত বা সদ্যপরিচিত জন্তুর টানে ধরা প'ড়ে গেলেন — তাঁর সম্প্রতি-লব্ধ অনাসক্তির মধ্য থেকে অকস্মাৎ এই মানবিক দয়ার উৎসরণেই তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ প্রকাশিত হ'লো — জন্তুটি দেবতার রূপে দেখা না-দিলেও সেই পরিচয় লুকোনো থাকতো না। পুঁথিগত তথ্য হিশেবে আমরা জেনে নিলাম তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন; কিন্তু আমাদের মনে এই বিশ্বাসটি অনপনেয় হ'য়ে রইলো যে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের

নিত্যবাসভূমি ত্রিদিবের কোনো প্রয়োজন নেই তাঁকে দিয়ে — কিন্তু প্রয়োজন আছে আমাদের, আমরা যারা মর্ত্যভূমির মরণশীল মানুষ। সব যুদ্ধ থেমে যাবার পর এবং সব আশ্রয় ভেঙে যাবার পর আমাদের জীবনে যা অবশিষ্ট থাকে, যা কেউ দান করেনি আমাদের কিন্তু আমরা নিঃসঙ্গভাবে নিভৃত চিত্তে উপার্জন করেছি — কোনো জ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মিরেখা, অতি ধীরে গ'ড়ে-ওঠা কোনো উপলব্ধির হীরকবিন্দু, বেদনার অন্তর্নিহিত কোনো আনন্দবোধ, অবলুপ্ত প্রেম থেকে নিংড়ে-তোলা কোনো সৌন্দর্যের আভাস হয়তো — ভিন্ন-ভিন্ন মানুষের জীবনে ভিন্ন-রূপ নিয়ে তা দেখা দেয় — আমাদের সেই শেষ সম্পদের প্রতীকরূপে, কোনো দুর্লভ অথচ প্রাপণীয় সার্থকতার প্রতিভূরূপে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চিরকালের মতো বাসা বাঁধলেন যুধিষ্ঠির — ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন তাঁকে তুলে নিয়ে ইন্দ্রের রথ আমাদের পক্ষে অগম্য ধামে মিলিয়ে গেলো।

১৫৩। অগ্নি জীবনধারণের উপায় ব'লে, অথবা চির-অতৃপ্ত ব'লে তিনি অনল (অন্ + অল, যাঁর পক্ষে খাদ্য কখনো যথেষ্ট হয় না); তিনি হব্যভোজী, তাই হুতাশন, হব্যবাহক, তাই বহ্নি; বিশ্বব্যাপী, তাই বৈশ্বানর; আলোকঋদ্ধ ব'লে তাঁর নাম বিভাবসু, শমীকাষ্ঠের মাতৃগর্ভে বিকশমান তিনি মাতারিশ্বা। তিনি দেবগণের জিহ্বা ও মঙ্গলকর্মের সাক্ষী; এবং তিনিই সেই ভীষণ বাড়বাগ্নি, যা জগতের ধ্বংসের জন্য আদিমতম সিন্ধুসলিলে লুকিয়ে থাকে। আবার তাঁর বরদরূপে তিনি গৃহপতি, তাঁকে অনির্বাণ রাখতে না-পারলে গৃহস্থের কোনো কল্যাণ নেই।

এই ইংরেজ পণ্ডিতের মতে 'অনল' শব্দ দ্রাবিড় উৎসজাত, কিন্তু অন্য কোনো গ্রন্থে আমি এই ব্যুৎপত্তি পাইনি (*The Sanskrit Language*, T. Burrow : Faber & Faber, London, সং ১৯৬৫, পৃ ৩৭০)।

১৫৪। অর্জুনের শেষ দিগ্বিজয়কালে তিনি যখন সিন্ধুদেশে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রতনয়া জয়দ্রথপত্নী বিধবা দুঃশলার করুণ আবেদন শুনলেন

(আশ্ব : ৭৮), তখন যুধিষ্ঠিরের মতোই তিনি একবার ব'লে উঠেছিলেন 'ক্ষাত্রধর্মে ধিক! আমি ঐ ধর্মের অনুবর্তী হ'য়ে বন্ধুবান্ধবদের বিনষ্ট করলাম।' কিন্তু এই বেদনাবোধ অর্জুনের মনে স্থায়ী হ'তে পারেনি।

বভ্রুবাহনের হাতে অর্জুনের 'মৃত্যু'র কারণ তাঁর ভীষ্মবধরূপী পাপ, এই গুপ্ত কথাটি উলুপী প্রকাশ করেছিলেন (আশ্ব : ৮১)। — কিন্তু শুধু কি ভীষ্মবধ ?

১৫৫। পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে দুর্যোধন-পতনের পরে কৃষ্ণও বলেছিলেন (শল্য : ৬২) : 'আমরা কৃতকার্য হয়েছি (মূলে আছে 'কৃতকৃত্য'), সায়ংকালও উপস্থিত, চলো এবার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করি।' কৃষ্ণের মুখের 'কৃতকার্য' কথাটায় ছিলো তিক্ততা, ব্যাসের উক্তিতেও ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। পাণ্ডবদের 'কৃতকার্যতা' তাঁদের ব্যর্থতারই নামান্তর।

১৫৬। যুধিষ্ঠিরের ভ্রমণপঞ্জি থেকে মনে হয়, লোহিতসাগর সেই সমুদ্র, যাকে আজকাল আমরা বঙ্গোপসাগর ব'লে থাকি।

১৫৭। যাদবেরা যখন নানাবিধ দুর্লক্ষণ দেখছেন, সেই সময়েই কৃষ্ণের রথ ও রথাশ্বগণ সমুদ্রের উপর দিয়ে দিগন্তে অন্তর্হিত হ'লো, তাঁর সুদর্শনচক্র মিলিয়ে গেলো নভোমণ্ডলে (মৌষল : ৩)। স্মর্তব্য, এই বিখ্যাত চক্রটিও খাণ্ডবদাহনের প্রস্তুতিস্বরূপ অগ্নি-বরুণ কৃষ্ণকে দান করেছিলেন। কিন্তু এই প্রত্যাহরণে কৃষ্ণ মনঃক্ষুণ্ণ হননি — তিনি নিজেই এখন প্রত্যাহরক। অর্জুন এই ঘটনাটি জানতেন ব'লে মনে হয় না, কিন্তু অগ্নির উক্তি থেকে বোঝা যায় কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন।

১৫৮। এই মহাসর্পের সুন্দর চিত্রকল্পটি বিষ্ণুপুরাণেও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভাগবতে তার উল্লেখমাত্র নেই।

১৫৯। মহাভারতে মেরু অথবা সুমেরুর বহু প্রশস্তিসূচক উল্লেখ আছে : সেটি সপ্তর্ষিদের বাসস্থান ও বেদব্যাসের তপস্যাভূমি, সূর্যচন্দ্র সেটিকে ঘিরে-ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, গঙ্গা সেখানে রুদ্রের বীর্য নিক্ষেপ করেছিলেন — এই ধরনের অনেক প্রবচন সুমেরুর সঙ্গে জড়িত। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে মহাভারতের কবি সুমেরুকে 'স্বর্গলোক' মনে করতেন ('পৌরাণিক উপাখ্যান' : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, সং বঙ্গাব্দ ১৩৬১, পৃ ১৮) কোনো-কোনো পণ্ডিতের মতে সাইবেরিয়ার আল্টাই পর্বতমালারই মহাভারতীয় নাম 'সুমেরু'

('প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যা' : মনোনীত সেন, গ্রন্থজগৎ, সং ১৯৬০, পৃ ৫৭)। গবেষক মহলে এমন একটি মতও প্রচলিত আছে যে পাণ্ডবেরা অনার্য (টী ৮৭ দ্র) ; তাঁরা বা তাঁদের পূর্বপুরুষেরা ভারতে এসেছিলেন তিব্বত বা সাইবেরিয়া বা মঙ্গোলিয়া থেকে, যুদ্ধের পরে পাণ্ডুপুত্রেরা সেখানেই ফিরে যান — সেটাই তাঁদের 'পিতৃভূমি'। কিন্তু নিখিল ভারতের অধীশ্বর হবার পরে কোনো সুদূর বিস্মৃতপ্রায় পৈতৃক ধামে তাঁরা কেন ফিরে যাবেন, বা যেতে চাইবেন, তার কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাই না, যদি না সেই পৈতৃক ধামের অর্থ করা যায় পিতৃলোক — পরলোক। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি বলে যে মহাভারতীয় মর্মকথার পক্ষে সংসারত্যাগের অর্থই সংগত।

১৬০। এই নামটি আমি পেয়েছি হ্বিণ্টারনিৎস-এর 'ইতিহাস' গ্রন্থে (খণ্ড ১, অংশ ২, পৃ ৪৯৩, সং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩), আমার দৃষ্ট বঙ্গবাসী সং মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই নরশ্রেষ্ঠ রাজার কোনো নাম নেই।

১৬১। সংস্কৃত নাটকের শেষে যেমন পতি-পত্নী চিতাগ্নি থেকে উত্থিত হ'য়ে স্বর্গে গিয়ে আনন্দে বিহার করেন, যুধিষ্ঠিরের তথাকথিত 'স্বর্গসুখ'ও তেমনি একটি কপোলকল্পনা। প্রাচীন হিন্দুমানসের বিচ্ছেদবিমুখতার নিদর্শনরূপে যদি বা এগুলোকে মেনে নেয়া যায়, তবু এই কথাটি কিছুতেই বিশ্বাস হ'য়ে ওঠে না যে যুধিষ্ঠির, তাঁর মহাপ্রস্থানের দুস্তর পথ পেরিয়ে আসার পরেও, দুর্যোধনকে স্বর্গে দেখে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন (স্বর্গ : ১)। সত্যি বলতে, মহাভারতের কাহিনীমণ্ডল মহাপ্রস্থানিক পর্বেই শেষ হ'য়ে গেছে, স্বর্গারোহণটি একটি প্রথাসিদ্ধ স্বস্তিবচন মাত্র।

১৬২। পরি : ১৫ ('রামের উদাহরণ') দ্র।

পরিশিষ্ট : সংযোজন ও সংশোধন

১। পৃ ৩৪ . টী ৯ : প ৬

'পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরাণী সমানং বর্ণমভি শুম্ভমানা' (ঋ : ১ : ৯২ : ১০) — রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদে 'পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত, নিত্য, এবং একরূপধারিণী,' নিকটতর অনুবাদ বোধহয় 'পুনঃ পুনঃ নবজাত, নিত্য, সমরূপা, ও বর্ণের দ্বারা অলংকৃতা।' ঋ : ৩ : ৬১ : ১-এ উষাকে আবার বলা হয়েছে 'পুরাণী দেবী যুবতিঃ' — পুরাণী ও যুবতী শব্দের সংযোগে চিরন্তনতার ভাবটি স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

২। পৃ ৮৩ : প ১৩-১৪

এখানে ঘটনাপর্যায় ঠিকমতো উপস্থাপিত হয়নি। নববধূকে নিয়ে অর্জুন একাই খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরেছিলেন, অনতিপরে এসেছিলেন কৃষ্ণ ও অন্যান্য প্রধান বার্ষ্ণেয়গণ, বিবিধ মূল্যবান যৌতুক সঙ্গে নিয়ে। বহুদিন ('দিবসান্ বহূন্') কুটুম্বগৃহে আপ্যায়ন ভোগ ক'রে বলরাম-প্রমুখ যদুবংশীয়েরা দ্বারকায় ফিরে যান, শুধু কৃষ্ণ অর্জুনের টানে আরো কিছুকাল যাপন করেন পাণ্ডবভবনে। বলরামাদির প্রত্যাগমনের পরে অভিমন্যুর জন্ম, তারপর জলক্রীড়া।

৩। পৃ ৯০ : টী ৩৯ ; প ৩-৪

সংস্কৃতে 'মদ' শব্দের অর্থ যেমন গর্ব বা হর্ষ তেমনি মাদক পানীয় বা সুরাপানজনিত মত্ততাও — মদনদেবতা ও মদস্রাবী হস্তীর কারণে অন্য একটি অর্থের সঙ্গেও আমরা পরিচিত আছি। অতএব খাঁটি সংস্কৃত মতেই 'মদোৎকট' বা 'মদস্খলিত' বিশেষণে একাধিক ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে — বাংলাভাষার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

দুঃখের বিষয়, প ১৪-তে 'অত্যুৎকৃষ্ট' শব্দটি ছাপা হয়েছে 'অত্যুকৃষ্ট', কিন্তু আশা করি তাতে বরাসবের উৎকর্ষ ক'মে যায়নি।

৮। পৃ ১১৫-১৬ : টী ৬১

পুস্তকের এই অংশ ছাপা হ'য়ে যাবার পর আমি লক্ষ করলাম, শ্রীঅরবিন্দর মতেও গীতা মহাভারতেরই অন্তরঙ্গ। তাঁর মন্তব্যের কিয়দংশ এখানে অনুবাদে উদ্ধৃত করছি।

'পৃথিবীর মহৎ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে গীতার বৈশিষ্ট্য এই যে এটি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, নয় খ্রীষ্ট, মহম্মদ বা বুদ্ধের মতো কোনো মহাপুরুষের অধ্যাত্মজীবন থেকে নিঃসৃত, অথবা — বেদ বা উপনিষৎসমূহের মতো — কোনো পরম-সন্ধানী যুগেরও সৃষ্টি নয়। এটি গ্রথিত হ'য়ে আছে জাতিসমষ্টির এপিক ইতিহাসে, তার মানুষ ও যুদ্ধ ও ক্রিয়াকর্মের মধ্যে, তারই এক প্রধান নায়কের আত্মিক সংকটের মুহূর্তে এর উদ্ভব — এমন একটি মুহূর্ত, যখন তাঁর জীবনের কীর্তি-মুকুটের সম্মুখীন হ'য়ে, এক উগ্র, ভীষণ, রক্তাক্ত কর্মের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাঁকে হয় হ'তে হবে সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ, নয়তো সেই কর্মকে তার ক্ষমাহীন সমাপ্তি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। কিছু এসে যায় না, যদি আধুনিক আলোচকদের অনুমান-মতো, এটি মহাভারতের বিপুলতার মধ্যে কোনো পরবর্তী কালে যোজিত হ'য়ে থাকে। ··· এই অনুমানের বিরুদ্ধে অনেক জোরালো যুক্তি আছে ব'লে আমার মনে হয়,··· কিন্তু সেটি স্বীকার্য হ'লেও মনে রাখতে হবে যে গ্রন্থকার (গীতার প্রণেতা) তাঁর রচনাটিকে বৃহত্তর কাব্যের জালে অচ্ছেদ্যভাবে বয়ন ক'রে দিয়েছেন, স্মরণীয়ভাবে ফিরে এসেছেন মূল প্রসঙ্গে — শুধু শেষ অংশে নয়, গভীরতম তত্ত্বালোচনার মধ্যখানেও। গুরু ও শিষ্য দু-জনেই সেই মূল ঘটনার প্রতি অবিরলভাবে মনোযোগী, এ-কথা ভুলে গেলে চলবে না।' (*Essays on the Gita*, সং ১৯৭০, পর্যায় ১ : পার ২ : পৃ ৯)

৯। পৃ ১১৭ : প ১৬-১৭

আমার উল্লিখিত ঔপনিষদিক বচনে ঠিক নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা নেই, আছে বিশুদ্ধ নিষ্কামতার অনুমোদন। 'কাময়মান' কর্মের ফলে পুনর্জন্ম ঘটে, নিষ্কাম পুরুষ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন — এই পর্যন্ত বলা হয়েছে সেখানে; 'অকাময়মান' কর্মের কোনো উল্লেখ নেই। মূল চিন্তাটি যেন এই যে কামের তাড়নেই আমরা কর্ম ক'রে থাকি, অতএব কামের নিবৃত্তি হ'লে কর্মেরও অবলোপ ঘটতে

বাধ্য। কাম ও কর্মের এই সম্বন্ধটি মনু স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, তাঁর মতেও নিষ্কাম কর্ম প্রায় অসম্ভব — তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকটি এ-বিষয়ে সোচ্চার :

অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্ ॥

—'সংসারে নিষ্কাম পুরুষের কোনো কর্মই দেখা যায় না, লোকেরা যে যা করে সবই কামাত্মক।' আবার, ১৮: ৮৮-৯৩তে তিনি কর্মের মধ্যে দুটি শ্রেণীভাগ করলেন: একটিকে বললেন প্রবৃত্ত-কর্ম (ফলাকাঙ্ক্ষী যাগযজ্ঞাদি), অন্যটিকে নিবৃত্ত (নিষ্কাম জ্ঞানচর্চা) — প্রথমটি অবশ্য ঐহিক সুখলাভের উপায়, দ্বিতীয়টি মোক্ষের। কিন্তু 'নিবৃত্ত-কর্ম' শব্দবন্ধেই আছে স্ববিরোধ, আসলে সেটি কর্মবিরতিরই প্রকরণভেদ; প্রবৃত্ত-কর্মও নিষ্কাম হ'তে পারে এবং সেই পথেও মুক্তিলাভ সম্ভব, মনুসংহিতায় এ-রকম কোনো ইঙ্গিত নেই। আর ঔপনিষদিক চিন্তা কতদূর পর্যন্ত নিবৃত্তিমূলক, আমার পূর্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যকের শ্লোক দুটিতে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে (টী: ১১১ দ্র)। এই সব মহিমান্বিত উক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করালে কৃষ্ণের 'মা ফলেষু কদাচন'কে মনে হয় অধিকতর বিস্ময়কর — যেন এই একটি ঘোষণায় তিনি সমগ্র ব্রাহ্মণ্য ধ্যান-ধারণাকে রূপান্তরিত করলেন। 'মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি (গী: ২: ৪৭) — তুমি কর্মফলের হেতু হোয়ো না, কর্মত্যাগে তোমার প্রবৃত্তি না-হোক।' — এই আদেশের প্রথম অংশটি শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু দ্বিতীয়টি শুধু নতুন নয়, বৈপ্লবিক।

১০। পৃ ১৬৫ : প ১৯-২০

দীর্ঘতমা প্রসঙ্গে অন্য একটি কাহিনীও স্মর্তব্য, যা কোনো-এক সময়ে ক্ষেত্রজ পুত্রের বৈধতা বোঝাবার জন্য পাণ্ডু কুন্তীকে বলেছিলেন (আদি: ১২২)। সেখানে পাই এমন এক আদিকালের উল্লেখ, যাকে রেনেসাঁসকালীন য়োরোপে বলতো 'স্বর্ণযুগ', তাস্‌সোর 'আমিন্তা' নাটকের একটি কোরাসে যার উজ্জ্বল

আলেখ্য আছে। সেই 'সুন্দর স্বর্ণযুগে' — তাস্সোর বর্ণনার চুম্বক লিখছি —: 'প্রেমের শিশুরা খেলা করতো ধনুঃশরহীন, নদীর তটে-তটে ফুলেদের মধ্যে নির্বাধ — মিশিয়ে দিতো আলিঙ্গন ও কলকাকলি, চুম্বন ও গুঞ্জনস্বর, গোলাপগুচ্ছে গুণ্ঠন টানতো না কন্যারা, তীক্ষ্ণ নূতন আপেলের মতো স্তনমণ্ডল ঢেকে রাখতো না।' পাণ্ডুর ভাষায় ইতালীয় কবির পুষ্পলতা নেই, বরং তা মনুসংহিতার ধরনে ঋজু: তাঁর উল্লিখিত পুরাকালে সর্বনারী ছিলো সর্বগম্যা ও স্বৈরিণী ('অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে। কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাঃ চারুহাসিনি॥'), এবং সেটাই ছিলো কামিনী-মোদক সনাতন ধর্ম (স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ')। এই প্রথার উচ্ছেদ ক'রে নারীর একভর্তৃকত্ব ও ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের বিধান প্রবর্তন করেন উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু — যাঁর দেখা আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে অনেকবার পেয়েছি, এবং কামশাস্ত্রের আদি প্রণেতারূপেও যিনি খ্যাতনামা। শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতমার মধ্যে পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা অসম্ভব, তবে দুটি উপাখ্যানই আদিম কোনো সমাজের স্মৃতি, তাতে সন্দেহ নেই। দীর্ঘতমা নিজেও 'গোধর্ম' পালন করতেন, যার অর্থ নীলকণ্ঠ দিয়েছেন 'প্রকাশমৈথুন'।

দুঃখের বিষয়, এই শ্বেতকেতু-সংবাদটি আর্যশাস্ত্র সংস্করণে বর্জিত হয়েছে।

১১। পৃ ১৯৯ : প ৭

স্মর্তব্য, দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞে এই জাবালি ছিলেন অন্যতম পুরোহিত (বাল : ১২ : ৫) — সেজন্যে পিতৃনিন্দা করতেও অযোধ্যাকাণ্ডে রামের বাধেনি। রামের তিরস্কার সুমসৃণভাবে গলাধঃকরণ ক'রে জাবালি অবশেষে বললেন তিনি প্রকৃতপক্ষে আস্তিক, কিন্তু সময় বুঝে কখনো-কখনো নাস্তিক হ'য়ে থাকেন।

দশরথের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ভোজনকারীদের মধ্যে শ্রমণেরাও ছিলেন (বাল : ১৪ : ১২); কিন্তু 'শ্রমণ' শব্দের আদি অর্থ অনুসারে এঁরা যে-কোনো মতাবলম্বী সন্ন্যাসী হ'তে পারেন, তাই এঁদের বৌদ্ধত্ব বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তাছাড়া, যথার্থ বৌদ্ধ হ'লে এঁরা যজ্ঞস্থলে ভোজনই বা করবেন কেন।

১২। পৃ ২১৯ : প ১৯-২০

স্মর্তব্য, কৃতবর্মা শুধু ভূরিশ্রবার উল্লেখ ক'রে থামেননি; ভীষ্ম-, দ্রোণ-, কর্ণ-, ও দুর্যোধন-বধকেও তীব্র ভাষায় বলেছিলেন নৃশংস, কাপুরুষোচিত — 'বীরগর্হিত বীরনিন্দিত' আচরণ। পুঁথিতে বলা আছে, কৃতবর্মার বাক্য শুনে কৃষ্ণ একবার 'সরোষ তির্যক' কটাক্ষপাত করলেন, কিন্তু তাঁর ব্যবহারে কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ পেলো না; তিনি রইলেন নিঃশব্দ ও নিষ্ক্রিয় যতক্ষণ না সেই 'নটনর্তকসংকুল মহাপান'-সভা একটি হত্যাভূমিতে পরিণত হ'লো। ট্রয়ান যুদ্ধের উত্তরকাণ্ড রচনার জন্য তিন মহৎ নাট্যকারের প্রয়োজন হয়েছিলো; কিন্তু ক্ষুদ্র একটি মৌষলপর্বেই কুরুক্ষেত্রের জের মিটে গেলো।

১৩। পৃ ২৩১-৩৮ : টী ১১১

মহাভারতে কৃষ্ণ বিষয়ে প্রথমতম উল্লেখটিতেই তাঁর কূটবুদ্ধি ও পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত আছে :

অন্নবান্ দক্ষিণাবাংশ্চ সর্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ।
যুধিষ্ঠিরেণ সম্প্রাপ্তো রাজসূয়ো মহাক্রতুঃ॥
সুনয়াদ্ বাসুদেবস্য ভীমার্জুনবলেন চ।
ঘাতয়িত্বা জরাসন্ধং চৈদ্যং চ বলগর্বিতম্॥

(আদি : ১ : ১৩০-৩১)

—'কৃষ্ণের কৌশল ও ভীম-অর্জুনের বলের দ্বারা জরাসন্ধ ও শিশুপালকে সংহার করিয়ে যুধিষ্ঠির অন্ন ও দক্ষিণাসম্পন্ন সর্বগুণান্বিত মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করলেন।' এ-কথাটা আমরা শুনলাম স্বয়ং কবির মুখ থেকে; অনতিপরবর্তী ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে কৃষ্ণের ভূমিকা আরো স্পষ্ট হ'লো। যাঁর 'সুনয়' আছে তিনিই সু-নায়ক, যোগ্য রাষ্ট্রনেতা — ভিতরকার ভাবটা দাঁড়াচ্ছে এই। সুনয় = 'wise conduct, policy' (মনিয়র-উইলিয়মস)।

১৪। পৃ ২৪৮ : প ২০-২৪

প্রজারা একবার ক্ষীণ আপত্তি জানিয়ে বলেছিলো, 'মহারাজ, এটা আপনার কর্তব্য নয়,' কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে অবিচল দেখে তারা আর উচ্চবাচ্য করেনি; শুধু পুরস্ত্রীরা রোদন করেছিলেন। গৃহত্যাগের পূর্ব মুহূর্তটিতে

যুধিষ্ঠিরের আচরণগুলিও লক্ষণীয় : কৃষ্ণ বসুদেবাদির শ্রাদ্ধক্রিয়া, প্রপৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজত্ব অর্পণ, পরীক্ষিতের গুরুর পদে কৃপাচার্যের প্রতিষ্ঠা, রাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক রূপে বৈশ্যাগর্ভজাত ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসুকে সম্মানদান — এই সব বিদায়কালীন সাংসারিক কর্তব্য তিনি সম্পন্ন করলেন তাঁর একক দায়িত্বে, এবং এমন একটি ত্বরা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে যা তাঁর চরিত্রে আগে আমরা কখনো দেখিনি। মহাপ্রস্থানিক পর্ব প্রথম অধ্যায়ের ছেচল্লিশটি শ্লোকের মধ্যেই পাণ্ডবেরা ভারত-পরিক্রম সাঙ্গ ক'রে হিমালয় পর্যন্ত উত্তীর্ণ হলেন ; দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দ্রৌপদী ও অন্যদের পতন।

নির্দেশিকা

* নির্দেশিকায় প = পরিশিষ্ট

নির্দেশিকা